মহাজীবন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কল্লোল
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬২ । অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

প্রকাশক : কুণালকান্তি ঘোষ
কল্লোল । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : তাপস সরকার

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন ।: কলিকাতা ৬

আফরোজা খাতুন
সইদুল ইসলামের জন্যে

এই লেখকের অন্যান্য বই

শাহজাদা দারাশুকো (১ম/২য়)

সিদ্ধকামিনী

ভাস্কো-দা-গামার ভাইপো

মানুষের রহস্য

তারসানাই

কামিনীকাঞ্চন

গল্প সমগ্র (১ম/২য়/৩য়)

মহাজীবন

ভোররাতে গাড়ি এসে দাঁড়াল। রজত পালিত ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে বুঝলেন, অফিসের গাড়ি। চেঁচিয়ে বললেন, চা দাও -

'হয়ে গেছে' বলতে বলতে ছায়া চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। বিস্কুট দিই?

না। বলে কাপটা হাতে নিয়ে ঠোঁট ছোঁয়াতে গেল। মাথা নিচু করে। ভারি মাথা। কাঁচা পাকা। বেশি নোয়াতে পারল না। খানিক চা চলকে মেঝেতে পড়ে গেল। হাতঘড়িতে সওয়া চারটে।

বসে খাও না। তুমি ছাড়া কি আর লোক নেই তোমাদের কাগজে?

রজত জুত করে চেয়ারে বসে এক ঢোক চা খেয়ে নিয়ে বলল, আমার চেয়ে ভাল অনেকেই আছেন। এখন-এ। কিন্তু আমাকে পাঠাচ্ছে - এটা তো ভালই।

কেন? তোমার বয়স হয়ে গেছে। এ বয়সে কি কেউ এতটা ঘোরে? বলে ঘুরে তাকাল ছায়া। সবে ষাট আন্দাজে ছায়া বেশ টরটরি আছে। মোজা সমেত স্যান্ডেলে পা গলিয়ে দিব্যি এ ঘর, ও ঘর করছে। চা, চানের গরম জল - সেই রাত সাড়ে তিনটেয় উঠে শুরু করে দিয়েছে।

খালি চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে রজত পালিত বলল, আমি সুপারঅ্যানুয়েটেড লোক। আমাকে কাজের মনে করে যদি এখন-এর জন্যে আমাকে কোথাও লিখতে পাঠায় সে তো আমার পক্ষে ভালই ছায়া। আমার কনফিডেন্স ফিরে আসে। আমি এখনও পারি। এই বিশ্বাসটা ফিরে পেলে আমি সব করতে পারি। কাজ করতে পারি - লেখা ভুলে যাইনি - এ বিশ্বাস ফিরে পাওয়া কি কম কথা?

শেষে ফের যদি অসুস্থ হও। এই ঘোরাঘুরি শরীরে সইবে?

সব সয়ে যাবে। অসুস্থ হব না ছায়া। ওষুধ তো নিয়ম করে খাচ্ছি। একদিকে আমি আনলাকি। পৃথিবীর এত লোক রোগা হচ্ছে। আমি চেষ্টা করেও হাফ কেজি কমাতে পারছি না। অথচ ওজনটা কমানো খুব দরকার। প্রেসারও তাই কমছে না।

ছায়া রজতের কাছে এগিয়ে এল। আমি বলি কি - তুমি এ সব ছেড়ে দাও। আমাদের তো বেশি কিছুর দরকার নেই। দু'জন তো লোক মোটে আমরা। ইরা এখন তার শ্বশুরবাড়ির লোক হয়ে গেছে। গরম জল দিয়ে গা স্পঞ্জ করতে করতে রজত পালিত বলল, এসব দরকারই হত না - যদি আমাদের কাগজটা না বন্ধ করে রাখত। চাকরির শেষদিকে এসে পি এফ পেলাম না - গ্র্যাচুইটি পেলাম না। এমনকি ছায়া - বত্রিশ মাস না-লিখে না-লিখে লেখাটাই ভুলতে বসেছিলাম।

লেখা তুমি কোনওদিন ভুলবে না। দৌড়ঝাঁপ করে মাঝখান থেকে কিছু না বাধিয়ে বস শেষে। ভুললে চলবে না - একটা মাইল্ড স্ট্রোক তোমার হয়ে গেছে। আমাদের দরকার তো খুব বেশি নয়। না-ই বা এত ঘুরলে। আজ কৃষ্ণনগর। কাল সিউড়ি।

কমই বা কি?- বলতে বলতে রজত পালিত তার তোয়ালেটা টাঙিয়ে দিতে দিতে বলল, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, ডাল-ভাত, ইলেকট্রিক বিল, সাবান সোডা - কোনওটা তো থেমে

নেই ছায়া। এমন সময় দরজায় খুট খুট।

রজত বলল, ড্রাইভারকে বসতে দাও।

ছায়া দরজা থেকে ফিরে এসে বলল, ড্রাইভার নয়। তোমাদের এখন-এর ফোটোগ্রাফার। পিঠে ক্যামেরার ঝোলা। কি নাম যেন -

আগে বসাও তাকে।

বসিয়েছি। বাচ্চা ছেলে।

তাই তো হবে। আমার মত বুড়ো লোক কি কাভার করতে বেরয়!

বসার ঘরে ঢুকে রজত পালিত হেসে উঠল। আরে -বিশু যে! গাড়িতে বসে ছিলে কেন? আমি ভেবেছি - হাওড়া স্টেশনে যাবার পথে তোমায় তুলে নেব।

কাল আমার নাইট ছিল রজতদা। বাড়ি ফিরেছি রাত একটায়। গাড়ি এসে হাজির রাত সাড়ে তিনটেয়।

তা এটুকু আসতে এতক্ষণ লাগল?

ভীষণ কুয়াশা হয়েছে। ড্রাইভার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এক হাত এগোয়-আর ব্রেক কষে।

তাহলে তো তাড়াতাড়ি বেরতে হয়। ট্রেন ক'টায়?

বিশু বলল, ঠিক ছ'টা দশে গাড়ি ছাড়বে। খানিকবাদে রাস্তায় বেরিয়ে মালুম হল রজত পালিতের। সাবানের ফেনার মত দলা দলা কুয়াশা ঝুলে পড়েছে রাস্তার ওপর। চেনা রুট - অচেনা লাগে। তার ভেতর আবার মাঝে মধ্যেই বিরাট বিরাট লরি একদম গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা যে লাগতে পারে - সে ব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। এভাবে এগোলে তো হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে দু'ঘণ্টা লেগে যাবে। ততক্ষণে ট্রেন ব্যান্ডেল ছাড়িয়ে যাবে।

বিশুর চেহারাটা ছোটখাটো। গালভর্তি দাড়ি। রাস্তার আলো কুয়াশা মেখে একদম ঘষা কাচ। রজত পালিত জানতে চাইল, তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?

একইরকম।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। শেষ রাত্তিরের কলকাতা। জানুয়ারির শেষের দিককার বরফঠাণ্ডা শীত। বিশু বলে উঠল, একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করার কথা ছিল। আজই সকালে। কিন্তু হল না।

ক্যাম্প? কেন?

আমাকে তো ফি মাসে দুবার করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করতে হয়। নয়ত নিয়মিত রক্ত পাব কোত্থেকে?

রক্ত?

বাঃ! আমার বউকে তো পনের দিন অন্তর ব্লাডট্রান্সফিউজ করতে হয়।

রজতের শোনা ছিল, বিশুর বউ কী একটা খুব খারাপ রোগে ভুগছে। কিন্তু সে জানতো না - তাকে পনের দিন অন্তর ব্লাড দিতে হয়।

বিশু নিজের থেকে কথা না বললে রজত তার কাছে এখন কিছু জানতে চাইবে না। ঝকঝকে নতুন ডিজেল অ্যামবাসাডর। ড্যাশবোর্ডে সবুজ রঙের কাঁটা থিরথির। বাইরে শিশিরে কুয়াশায় বাতাস বরফ - ধারালো, ফিনফিনে। পেছনের সিটে বেশ দূরে বিশু একদম অন্য গ্রহের মানুষের মতই বসে আছে। মাস গেলে একটা থোক টাকা পায় অফিস থেকে। সেই সঙ্গে ছবি পিছু কিছু টাকা। পাকা চাকরি নয়। এইরকম চাকরি। তাই দিয়েই মাসে বউকে দু'বার ব্লাডট্রান্সফিউশন।

বাড়ি ভাড়া, বাস-ট্রাম, চাল, ডাল, নুন, তেল।

তোমার ছেলেপিলে কি বিশু?

একটিও না। কোত্থেকে হবে! কী করে হবে? থ্যালাসেমিয়ায় তো বাচ্চা হতে নেই।

এখন কেমন আছেন।

একইরকম। তবে ব্লাড দেওয়ার পর দিন দুই খুব ভাল কাটে না। খুব অস্থির অস্থির করে রেণুর।

তোমাদের কি ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল?

না রজতদা। দেখেশুনেই বিয়ে হয় আমাদের।

তুলে দেওয়া কাচের ওপাশে আকাশের কিনারাটা দেখা যায়। রজত বুঝল, সেখান থেকেই ঘোলাটে দিগন্ত। গাড়ি আর এগোতে পারছে না। ঘড়িতে এখন সওয়া পাঁচটা। এখনও অনেকটা সময় আছে হাতে। কিন্তু এভাবে এগোলে -

রজত কাচের ভেতর দিয়ে দেখল - ঝুলে পড়া আকাশের শেষদিকে দু'তিনটে ফুটি ফুটি তারা। পৃথিবীর পিঠে বসে ঘুরন্ত পৃথিবীকে টের পাওয়া যায় না। মহাকাশে কত কি হয়ে যাচ্ছে। পলকে হাজার হাজার উল্কা ছুটে এসে পৃথিবীর বাতাসে পড়ে জ্বলে যাচ্ছে। আর নিচে পৃথিবীর গায়ে বড় বড় গাছের মাথা শীতে, ঠাণ্ডায়, শিশিরে ভিজতে ভিজতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ রজতদের গাড়ির পাশ দিয়ে পুলিসের একটি পাইলট জিপ এগিয়ে গেল। তার পেছনে একটি সাদা অ্যামবাসডর। তার মাথায় একটি লাল আলো ঘুরছে।

বিশু বলল, লেবার মিনিস্টারের যাবার কথা আছে আজ স্পটে। হয়ত আমাদের সঙ্গেই ট্রেন ধরবেন।

ভালই হল - বলে রজত ড্রাইভারকে বলল, সাদা গাড়িটা ফলো কর ভাই।

এবার গাড়ি টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় এসে পড়ল। কিন্তু আগের চেয়ে অনেক স্পিডে এগনো যাচ্ছে। কারণ, পাইলট জিপটা কুয়াশার পরোয়া না করেই ছুটছে।

বিশু বলল, লক্ষ্য করে দেখেছেন রজতদা - ফাঁকা জায়গায় কুয়াশা বেশি। আর বাড়িঘর যেখানে বেশি - সেখানে কুয়াশা প্রায় নেই।

ময়দান ছাড়বার সময় পেছনে ঘন কুয়াশার পর্দা ফেলে রেখে আসতে পেরে দু'জনই হাঁফ ছাড়ল। বিশু বলল, লক্ষ্য করে দেখেছেন - কলকাতার ভেতরেই ফাঁকা মাঠ পড়লে কুয়াশা যেন দেওয়ালের মত ঘন হয়ে দাঁড়ায় - আবার বাড়িঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি এখন - কোনও কুয়াশাই নেই।

রজত পালিত বলল, গঙ্গার ওপর দিয়ে হাওড়া ব্রিজ যখন পেরবো - তখন দেখবে ওখানেও কুয়াশা নেই।

তাই?

হ্যাঁ বিশু। তুমি যদি আমাদের মত ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে বিশ-ত্রিশ বছর জীবন করতে - তাহলে দেখতে - কঠিন কুয়াশা বলে জীবনের যেসব প্রবলেমকে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে - সেসব গা-সওয়া হয়ে যেত। প্রবলেমই মনে হত না।

বিশু ছোটখাটো মানুষটি। রীতিমত গম্ভীর। সে বেশ আস্তে করে বলল, প্রতিটি ফোর্টনাইটে রক্ত দিয়ে ডেথকে সরিয়ে রাখা কেমন জিনিস তা আমিই জানি রজতদা।

এই বিশু। বিশুভাই। - বলতে বলতে রজত পালিত দু'হাতে বিশুর দু'খানি কাঁধ ধরল। ছেলেটি তার চেয়ে প্রায় তিরিশ বছরের ছোট। বলা যায় ছেলের সমান। আমি তোমাকে হার্ট

করতে চাইনি।

নাহ্! বলে বিশু গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল।

বিশ্বাস কর। আমি কি তোমাকে ব্যথা দিলাম?

বিশু বাইরে ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারে তাকিয়ে একদম অন্য কথায় চলে গেল। ভাগ্যিস মিনিস্টারের গাড়ি সামনে ছিল - নইলে অ্যাতো স্পিডে এগনো যেত না। ঠিক তখনি মূর্তিমান হাসির মতই হাওড়া ব্রিজ চোখের সামনে ফুটে উঠল। বিশু দেখল, সত্যিই কোনও কুয়াশা নেই।

ন'নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সময় মতই ট্রেন ছাড়ল। কিন্তু লাইনের দু'পাশের ঘরবাড়ি তখনও কুয়াশা আর আবছায়ায় ঢাকা। জানলার পাশের সিটে বসে রজত পালিত একটি সিগারেট ধরালো। ভোরের ট্রেনে রাতের গাড়ির মতই আলো জ্বলছে। মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি।

বিশু জানতে চাইল, কখন পৌঁছবো আমরা?

ধর চার ঘন্টার জার্নি। আসানসোলে নামব এই দশটা, সওয়া দশটায়।

নেমেই একটা গাড়ি ভাড়া করে নিলে স্পটে নিশ্চয় বারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব? আরেকটু বেশি করেই ধর বিশু। সাড়ে বারোটায় গাড়ির কাছে পৌঁছে যাব আমরা। মোটে চল্লিশ কিলোমিটার। পরিষ্কার দিন এখন। ছবি তুলতে লাইটের অভাব হবে না তোমার।

ব্যাণ্ডেল পেরিয়ে বিশু বলল, থিম ছবি কী করা যায় বলুন তো।

কয়লাখনিতে আগুন। এত লোক খনির পাতালে আটকে পড়ে আছে। কেউ বেঁচে নেই নিশ্চয়। তিন-চারটে করে লাশ উঠছে। ডে অ্যান্ড নাইট রেসকিউয়ের কাজ চলছে। তোমার ছবির সাবজেক্টের অভাব হবে না কোনও।

বলেই রজত পালিত মনে মনে নিজেকে বলল, শোন রজত, এভাবে দুর্ঘটনা, সংবর্ধনা, জয়লাভ, পরাস্ত হওয়া, বন্যা, খরা, প্রধানমন্ত্রীদের ইলেকশন মিটিং, সরেজমিনে তদন্ত, পরিদর্শন - কত কি-ই না তুমি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ধরে কাভার করে আসছ। ট্রেনে, প্লেনে, ভাড়া করা গাড়িতে, লঞ্চে করে, পায়ে হেঁটে। তোমার কি মনে হয় না - সেই একটা গাড়ি করেই - সে ট্রেনই হোক আর প্লেনই হোক - তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ? সেই একই অ্যাসাইনমেন্টে? সেই একই কাভারেজে? মানুষের কথা। জীবনের কথা। তুমি আগে জেনে নিচ্ছ। তারপর সবাইকে জানাতে চাইছ।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা মোটাগলা ভেসে এল। স্যার! পেচ্ছাপ করে আসি।

তার চেয়েও কড়া গলা প্রায় ধমকে বলল, যাও -

কি করে যাই স্যার? সঙ্গে যে আরেকজন-

রজত আর বিশু একসঙ্গে পেছনে ফিরে তাকাল। মেমারির ওপর দিয়ে ট্রেন হু হু করে এগিয়ে চলেছে। একজন পুলিস অফিসার। সঙ্গে তিন-চারজন সেপাই। সবার হাতেই রাইফেল। দু'টি লোককে একই হাতকড়ায় আটকানো। পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ে মোটা গেঞ্জি। নিচে লুঙ্গি। টাক মাথা। তার ডান হাতের সঙ্গে রোগা মত একটা লোকের বাঁহাত পাশাপাশি হাতকড়ায় লটকানো। লোকটি আবার বলল, স্যার। ও স্যার - ঘুরে আসি -

যাও। - বলে পুলিস অফিসারটি বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠল।

দু'জনে একসঙ্গে পেচ্ছাপ ফিরব কি করে?

যেভাবে পারিস করে আয় -

অগত্যা। দু'জনই বাথরুমের দিকে গেল। মোটা, টাকমাথা, খোঁচা খোঁচা দাড়ির লোকটি

রোগা লোকটিকে প্রায় হেঁচড়ে নিয়ে এগলো।

আগুপিছু রাইফেল কাঁধে পুলিস।

রজত জানতে চাইল, কি কেস?

আফিসারটি বলল, লিফটিং। ট্রেন থেকে জিনিসপত্র তুলে নেওয়া। ওই শ্রীমান বড় এক গ্যাংয়ের চাঁই।

কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?

রামপুরহাট কোর্টে প্রডিউস করব।

মনে মনে অঙ্ক কষে নিল রজত। তার মানে বর্ধমানে নেমে রামপুরহাট লোকাল ধরা হবে। বেলা বারোটার ভেতর দু'জন রামপুরহাট কোর্টের কাঠগড়ায়।

কোমরে মোটা দড়ি। হাতকড়া সমেত দু'জন ফিরে এল। বসল। ওদের দু'পাশে দু'জন সেপাই বসল। বসেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি হঠাৎ অফিসারকে বলল, স্যার। আপনি আমার রাজা।

অফিসারের বয়স এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। তিনি মাথা না তুলে সকালের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ষণ্ডামত লোকটি ফের বলল, এখন থেকে আপনি আমার সারাজীবনের রাজা।

কথাগুলো রজতের কানে নাটকের ডায়ালগের মত লাগছে।

লোকটি রসিকতা করছে। নয়ত বুকের ভেতরকার কথা বলছে। খুব মন প্রাণ দিয়ে। কিন্তু চেহারাটা এমনই যে শুনলে মনে হবে মজা করে বলছে।

লোকটি এবার বলল, আপনাকে স্যার রাজা মানলাম। কোর্টে কেসটা একটু নরম করে দেবেন। নয়তো এবার আমার সাজা বেশি হয়ে যাবে।

২

ট্রেন ভীষণ জোরে ছুটছে। ধানকাটা মাঠে সবে বিয়ানো সাদা বাছুর। এদিক ওদিক ছিটকে দৌড়োচ্ছে। লাইনের পাশে গলা জলে দাঁড়িয়ে পানিফল তুলে ভাসানো হাঁড়িতে রাখছে দু'জন লোক। খোঁচা খোঁচা দাড়ির লোকটি বলল, এবার রাজা দু-পাঁচ টাকার খাবার দ্যান -। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে। -বর্ধমানে নেমেই পাবি।

-তা হচ্ছে না রাজা। কাল রাতে লকআপে কিছু মুখে দিতে পারিনি। দুর্গন্ধ। আর কি মশা! সারা গা চুলকে ঘুমের কথাই ভুলে গেলাম। কিছু খাবার খেতে দ্যান রাজা। আপনি আমার রাজা। নিজির রাজা। আপনাকে ছাড়া আর কাউরে চিনি না।

-ছাড়া পেয়েই তো ফের লিফটিং করে বেড়াবি। পারলে আমায় দূর থেকে বোমাও মারবি। কী বলিস!

-তা কি হয় রাজা। আপনি হলেন গে একজন আসল রাজা। আপনার অত্যাচারে হাওড়া জেলার ভাল ভাল ক্রিমিনাল বাংলা মুলুক ছেড়ে সব বিহারে চলে গেল। আফসোস। আফসোস।

হাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল রজত পালিত। লোকটার কথাগুলো একদিকে খুবই আন্তরিক - আবার আর একদিক থেকে মনে হবে - বুঝিবা অফিসারকে ঠাট্টা করেই কথাগুলো বলে চলেছে লোকটা - পরম ভক্তির মোড়কে।

ট্রেনের দু'ধার দিয়ে দু'পাশের মাঠঘাট পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। একসময় পানাগড়, রাজবাঁধ স্টেশন দুটোও পিছলে বেরিয়ে গেল। আগের মতই আজও আমরা বন্যা, খরার সামনে এতটুকু হয়ে যাই। আজও একজন মানুষের ভাগ্য আরেকজনের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন চোখ বুজে এসেছে টের পায়নি রজত। এক এক সময় তার মনে হয় - কোনও ট্রেনই ছুটে ছুটে পৃথিবীকে কোনওদিন ঘুরিয়ে ফেলতে পারবে না। এখানে যে একটু দয়া করলে আরেকজনের সবকিছু না হোক - কিছু হয়ে যায় - হয়ে যেতে পারে - সেই দয়াটুকুই করার লোকটি করে না। করতে পারে না। তার সামনে আইন এসে দাঁড়ায়। বিবেক এসে দাঁড়ায়।

অণ্ডালের কিছু আগে ঘুম ভেঙে গেল রজতের। চোখ মেলে দেখল বিশু ঘুমিয়ে পড়েছে। ডান হাতখানি শক্ত হয়ে ক্যামেবার ব্যাগের ওপর।

পেছন ফিরে রজত দেখল - সেই দুই আসামীসমেত কখন পুলিস নেমে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বর্ধমান থেকে ওরা রামপুরহাট লোকালে উঠে পড়েছে। কে জানে — খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা, ষণ্ডামার্কা লোকটার বাড়িতে কে কে আছে। ট্রেনেও পুলিস অফিসারকে রাজা বলে ডাকছিল। বাড়িতে ওকে ওর স্নেহের মানুষজন হয়ত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

হাত ঘড়িতে এখন প্রায় দশটা চারদিক দিনের আলোয় হাসছে। বেলা দশটা পঁচিশ নাগাদ দেখা গেল, আসানসোল স্টেশনের বাইরে একটা ব্র্যান্ড নিউ মারুতিতে দু'দিক থেকে দু'জন পেছনের সিটে বসছে। একজন রজত পালিত। অন্যজন ফটোগ্রাফার বিশু।

গাড়িতে ওঠার আগে স্টেশনের বাইরে একটা মোটর পার্টসের দোকান থেকে রজত ফোন করেছিল সাকতোড়িয়ায়। কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এখন ঠিক কোথায় আছেন তা যদি জানা যায়।

ফোন যাঁরা ধরেন - তাঁরা কিছু বলতে চান না। পাছে কিছু বেফাঁস বেরিয়ে পড়ে। খনির পাতালে তিনশো ফুট নিচে আগুন বলে কথা। আগুনের হাত থেকে বাঁচলেও, আগুনের দরুন কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থেকে বাঁচা কঠিন। এর গন্ধ মিষ্টি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢোকার সময় বোঝা যায় না - খোদ মৃত্যু বুকে ঢুকল।

এত সব কথা দৈনিক 'এখন' ছাড়াও সব কাগজ কোনও না কোনওভাবে বলেছে। খনি-বিশেষজ্ঞদের মতামতও ছেপেছে বেশির ভাগ কাগজ। রজতের কলকাতা থেকে এতদূর ছুটে আসার কারণ - খনির পাতালে কেন আগুন লাগল - বা কতজন সেখানে দম আটকে দগ্ধে মারা গেল - সে-কথা লেখার জন্যে নয়। আসানসোলে নেমে আরও চল্লিশ কিলোমিটার ভেতরে সেখনিতে যাবে - একটা জিনিসই দেখতে - তা হল - এমন মৃত্যুর থাবা কতটা বড় - তার পরিণাম কতখানি - যাদের গেল - তাদের কতটা গেল।

ঝকঝকে গাড়ি। নিয়ামতপুর পেরিয়ে ওরা শীতলপুরের রাস্তায় পড়তেই দু'ধারে কয়লাখনির চিমনি। যে-চিমনিতে ধোঁয়া নেই - সেখনিতে কাজ করেই বন্ধ হয়ে গেছে। যে-চিমনিতে ধোঁয়া - সেখানকার পাতালে হয়ত এখনই ক্যাপলাইট মাথায় পরে শিফ্‌ট সর্দার দলবল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। মাথার ওপর কয়লার ছাদ যাতে ধসে না পড়ে সেজন্যে জায়গায় জায়গায় কয়লা না কেটে পিলার করে রাখা। প্রাগৈতিহাসিক আমলের গাছ চাপা পড়ে গিয়ে পৃথিবীর ওলটপালটে মাটির নিচে কয়লা হয়ে আছে। যা কিনা একদিন শিল্পবিপ্লবের মায়ের কাজ করেছিল।

পৃথিবী তৈরি হওয়ার সময় এদিককার জমি-জায়গায় অনেক উথাল-পাতাল গেছে। হঠাৎ হঠাৎ প্রান্তরটা যেন কোন খোলা মাঠ হয়ে একদিকে নাবিতে নেমে গিয়ে বিশাল গর্ত। তার নাম কাদড়। বর্ষার জলে দীঘি হয়ে যায়। শীতে শীর্ণ ধারা। মানুষজন কাপড় কাচে সে জলে। গরু-মোষ চান করাচ্ছে কেউ কেউ এখন। গাড়ির জানলায় তাকিয়ে দেখতে পেল রজত। এ তল্লাট সবই জানা ড্রাইভারের। কোল ইন্ডিয়ার শীতলপুর গেস্ট হাউসের মুখে এনে গাড়ি দাঁড় করাল সে।

চারদিকে ডাঙাল জমি। দূরে কয়লাখনির চিমনি - আকাশে একটা লোহার চাকা ঝুলে আছে - বয়লারটা দেখতে অতিকায় পাশ-বালিশ। তারও অনেক ওপরে অদৃশ্য বাতাসে আকাশটা ভেসে আছে। চমৎকার রোদ। তার ভেতর সাদা রঙের গেস্ট হাউসটা লাল মোরামের রাস্তা, ফুলবাগান নিয়ে ঠা-ঠা করে হাসছে। এখানে যে মৃত্যু আছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

গেস্ট হাউসের গাড়িবারান্দার পাশেই আর্মড্ পুলিস পজিশন নিয়ে দাঁড়ানো। ভেতরে ঢুকে রজত যতই কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চায় - ততই তাঁর স্টাফের লোকজন বলেন, আগে আপনারা ব্রেকফাস্ট করুন। তারপর চেয়ারম্যান কথা বলবেন। উনি ব্যস্ত আছেন এখন। আপনারা এতটা পথ এসেছেন। কিছু খেয়ে নিন।

শেষে রজত প্রায় চেঁচিয়েই বলল, কোন্ ঘরে আছেন আপনাদের চেয়ারম্যানমশায়? বলুন। আমরা এখানে খাওয়াদাওয়া করতে আসিনি। কথাটা চেঁচিয়ে বলেই নিজে বেশ লজ্জা পেল রজত পালিত। সে তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়সের একজন রিপোর্টার নয়। সে ঘাট পেরিয়ে-যাওয়া একজন লোক। এখানে এসেছে বিপন্ন মানুষ খনির পাতালে মৃত্যুর সামনে কীভাবে দাঁড়ায় - মুছে যায় - সে কথা জানতে, জানাতে, লিখতে। আর কোল ইন্ডিয়ার স্টাফের লোকজন যে

আগে ব্রেকফাস্ট করে নিতে বলছেন - সে অনুরোধের সবটাই অপকর্ম চাপা দেবার জন্য। বাড়িয়ে-দেওয়া তোয়াজ নয়। বরং ভদ্রতা। হসপিটালিটি। আপ্যায়ন। যা কিনা আজও কলকাতার বাইরে আছে। একেবারে মুছে যায়নি। কলকাতার সরকারি আফিস-কাছারিতে যা একদম উবে গেছে। কলকাতা থেকে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দরজা ঠেলতেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মোটাসোটা সাধারণ চেহারার কোট-প্যান্ট গায়ে এক ভদ্রলোক। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আমিই কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান। আর এম ঝা।

চমৎকার বাংলা বলেন তো!

বাঃ। আমরা মৈথিলি। বাংলা-মৈথিলি তো একই কায়দার ভাষা। আমি দ্বারভাঙা জেলার স্কুলের ছেলে।

রজত পালিত মনে মনে বলল, আমিও খুলনা জেলা স্কুলের ছেলে। - কিন্তু মুখে সে বলল, গাফিলতি ছিল আপনাদের? কেব্‌ল কেটে গেছে? সস্তার কেব্‌ল কেনা হয়েছিল?

দেখুন, এ-সব হল গিয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ানো শিকায়েত। অভিযোগ। কমপ্লেন। আগুন লেগেছে পাতালে তিরিশ তলা নিচে। আগুন নেভাই - তবে তো বলব - খুঁজে দেখে বলব কেন আগুন লাগল। বডিগুলো তোলা হোক। হাজার দুই মানুষের দালরোটি হয় যে খনিতে - সে খনি তো চালু করতেই হবে। বসিয়ে রাখলে চলবে না। আমার সামনে এখন তিনটি কাজ। আগুন নেভানো। লাশ তোলা। খনি ফের চালু করা।

রজত পালিত এই প্রথম টের পেল - সে যেন এমন বিশাল প্রান্তরে কোনও একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছে - যে রাস্তার পাশে ফুল ফোটে - যে রাস্তার গায়ে মানুষের ঘরবাড়ি আছে।

এই পৃথিবীর কোথায় কী আছে আলাদা করে বোঝার কোনও উপায় নেই। সাদা রঙের গেস্ট হাউস। সুন্দর চাদরে ঢাকা খাবার টেবিল। সুগন্ধ ছড়ানো ঘরের বাতাস। রজতের সামনে কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আর এম ঝা। আর এরই কাছাকাছি কয়েক মাইলের ভেতর খনির পাতালে কিছু মানুষ ওপরে উঠতে পারছে না। সামনে দাউ দাউ আগুন। সেই আগুন থেকে মিষ্টি গন্ধের কার্বন মনোক্সাইড উঠে আসছে। যা কিনা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে বুকের কল বন্ধ করে দেয়। তখন সে পাতালের কয়লা-চাতালে পড়ে যায়। কিছু জানতে পারে না আর। আচ্ছন্ন। জানার কোনও উপায় নেই। আগুন এসে তখন তাকে চাটতে থাকে। সে টেরও পায় না। তার গায়ের মাংস আগুন খেতে থাকে।

তাই তো ব্যাপার। যে ক'টা বডি রেসকিউ পার্টি ওপরে তুলেছে - তার সব ক'টিই আগুনে ঝলসানো। মুখ চেনা যায় না।

ঠিক এই সময় আকাশে একটা বোঁ বোঁ শব্দ উঠল। চেয়ারম্যান আর এম ঝা খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালেন। আওয়ার বাটারফ্লাই!

খুব উৎসাহী লম্বা চওড়া মানুষ। একটু কালোপানা। দেখে রজতের মনে হল - তার চেয়ে এই ঝা মশায় সাত-আট বছরের ছোটই হবেন। হয়ত খুব বড় খনি ইঞ্জিনিয়ার। বিশাল এক্সপিরিয়েন্স। মৃত্যু, অভিযান, এমপ্লয়মেন্ট, তদন্ত - সবকিছুই মানুষটি সমান চোখে দেখে থাকেন।

কয়েক লক্ষ খনি মজুরের মাথার ওপর মানুষটি যেভাবে লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন - ঘাড় তুলে আকাশে তাকালেন - তার ভেতরে যেন অন্যকেও ডেকে নিয়ে

যাওয়ার একটা ডাক আছে।

রজত বারান্দায় বেরিয়ে এসে পরিষ্কার আকাশে মাথা তুলে তাকাল। বিরাট পাখির মতই অ্যালুমিনিয়াম রঙের একটি হেলিকপ্টার নেমে আসছে। অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের ছায়াছবিতে যেভাবে আকাশ থেকে অন্য গ্রহের মানুষ নেমে আসে - প্রায় সেইভাবেই কয়েকজন লোক নেমে আসছে। তাদের মাথা, মুখ - সবই দেখতে পাচ্ছে রজত। বিশু কখন তার ক্যামেরা তাগ করেছে। চোখের ইশারায় তাকে থামাতে রজত দেখতে পেল - গেস্ট হাউসের পেছন দিকটায় বেশ বড়সড় মাঠ। সেখানেই হেলিকপ্টারটা নামছে। আর এম ঝা বললেন, বাটারফ্লাই উইল গো ব্যাক টু দি সাইট। আপনারা ইচ্ছে করলে দশ মিনিটে পৌঁছে যেতে পারেন।

এখান থেকে খনি কতদূরে?

তা বাই কারে দেড়ঘণ্টা লাগবে। যাবেন নাকি? দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন।

নাঃ, আপনার কি মনে হয়?

কি জানতে চাইছেন?

এখনো কি কেউ নিচে বেঁচে আছে খনির ভেতর?

আমি না বলব না। হ্যাঁ বলব না। পিটসাইডে আমরা সারা দেশের এক্সপার্টদের জড়ো করেছি। কেউ খনির আগুন নেভাবার ব্যাপারে চল্লিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স রাখেন। কেউ বা পাতালে ভেন্টিলেশনের এক্সপার্ট। ওঁরা সবাই খনির সামনে বসে পাতালের সার্ভে ম্যাপ সামনে রেখে মাথা ঘামাচ্ছেন। ঘন্টায় ঘন্টায় রেসকিউ টিমকে পরামর্শ দিচ্ছেন।

কথা বলতে বলতে আর এম ঝা ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। ফোন বাজছে। সাইট থেকে আসতে পারে ফোন। দিল্লি থেকেও আসতে পারে। কিংবা কলকাতা থেকে।

রজত বলল, চল বিশু। আমরা আমাদের মত এগোই।

বিশু 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে না কখনো। চুপ করে ফলো করে। নয়ত পছন্দ না হলে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখে কখনো হাসি দেখেনি রজত। দূর থেকে একবার কি দু'বার সে বিশুকে হাসতে দেখেছে। সেই বিশু গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে খুব চাপা গলায় বলল, জানেন রজতদা, মৃত্যু আসে বিদ্যুৎবেগে।

রজত কোনও জবাব দিল না। শীতের এই দুপুরে তাদের ভাড়া করা গাড়িটা অনাথ শিশুর মতই প্রান্তর ভাঙছে। সরু ফিতে পিচরাস্তার দু'ধারে খাড়াই নালা। শীতে কুঁকড়ে যাওয়া হলুদপানা ঘাস সব জায়গায় মাটি ঢাকতে পারেনি।

বেলা প্রায় তিনটেয় রজত আর বিশুকে নিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল নিরসা মাইনের কাছাকাছি। ততক্ষণে বিকেলের ছায়া মাখানো আকাশ কেমন কালচে হয়ে উঠল।

পিচরাস্তা থেকে ডাইনে খানিকক্ষণ পাথর পেটানো রাস্তা। তারপরই ঘন করে ফেলা কয়লাগুঁড়ো। গুঁড়োর নিচে কোথাও মাটি আছে। গাড়ির চাকার এক-একটা দাগ আরেকটা দাগকে কেটে বেরিয়ে গেছে। কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়ার রোপওয়ে বন্ধ। তাই দু'টো বাকেট শূন্যে দূরে দূরে ভাসছে।

একটা গোডাউন মত বাড়ির আড়াল পেরোতেই রজত তো অবাক। এ যেন ছুটির দিনে - বা বড়দিনে কোনও টুরিস্ট স্পটে মানুষের মেলা।

শুধু মানুষ নয়। গাড়িরও মেলা। কালো কয়লাগুঁড়ো বাতাসে। পায়ের নিচে কালো কয়লাগুঁড়োয় ঢাকা মাটি। তার ওপর অন্তত দেড়শো গাড়ি। অ্যামবাসাডর, ফিয়াট, মারুতি,

জিপসি - কি নয়। সব এদিক-ওদিক ছড়ানো। তার ভেতর পুলিসের ভ্যান, লরি। আর পুলিস তো চারদিকে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা - এমন কালো চারদিকে - কয়লার গুঁড়োর কালো, কালো হয়ে আসা শীত ছড়ানো আকাশ - এতবড় মৃত্যুর বিষাদ থেকে - দুশ্চিন্তা থেকে ছড়িয়ে পড়া অদৃশ্য এক কালোর ভেতর বেশির ভাগ গাড়ির রং সাদা। একদম দুধসাদা। আর খনিকে ঘিরে ছড়িয়ে থাকা বিশাল উঁচু-নিচু প্রান্তরের ভেতর দূরে সব গাছের মাথা কেমন ঝুপসি মত। একটা পাখি নেই আকাশে। মাঠে একটা গরু নেই। রাস্তায় একটাও কুকুর চোখে পড়েনি রজতের।

এখানে কার সঙ্গে কথা বলবে সে? সবাই সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত। একটা অফিসঘরে ঢুকতে গেল রজত। পারল না। ঘরের ভেতরের মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না। তাকে ঘিরে একদল মানুষ। সবাই খুব উত্তেজিত। এখানে কি করে কথা বলবে?

ফের সে খনির সামনেকার মাঠে নেমে এল। এক জায়গায় ত্রিপল খাটিয়ে তার নিচে চা হচ্ছে বড় চুলোয়। পাশে খাবারের প্যাকেটের স্তূপ।

তুলনায় কিছু ফাঁকা একটা হলঘরে ঢুকে পড়ল রজত আর বিশু। সেখানে বিশাল এক টেবিলে ম্যাপ বিছানো। একজন রীতিমত বুড়ো মানুষ আতশ কাচ হাতে সেই ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। গায়ের কোটপ্যান্ট ঢলঢলে। চোখে মোটা কাচের চশমা। মুখের সব মাংস কুঁচকে গেছে। চারদিকে এত কাণ্ডের ভেতর মানুষটি ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখছেন। আশপাশের কিছুই তাকে ছুঁতে পারছে না।

রজত কাছে গিয়ে বলল, কী দেখলেন?

বুড়ো মানুষটি মাথা তুলে রজতের মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে যেন এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসতে লাগলেন। তারপর এক সময় প্রায় শোনা যায় না- এমন গলায় বললেন, আগুন তো কারও কথা শোনে না। শুধু লিকুইড্ নাইট্রোজেনকে ডরায়-

রজত পালিত সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, এই খনির পাতালে আটকে পড়া মানুষগুলোর সেই রোগীর দশা- যে রোগীর ওষুধ আসেনি, ডাক্তারের খোঁজ নেই, ওষুধ কখন পড়বে তারও কোনও ঠিক নেই। কোল ইন্ডিয়া আগুন নেভানোর একজন এক্সপার্টকে এনে একখানা কাগজের ম্যাপের সামনে বসিয়ে দিয়েছে। এ যেন বরযাত্রীরা খেতে বসার পর আলো নিভে যাওয়ায় যে-যার কলাপাতা থেকে রসগোল্লা ছুঁড়ছে অন্ধকারে।

রজত হলঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ভিড় পেরিয়ে খনির চিমনির কাছে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণে সে নিরসা খনির মুখে এসে পড়েছে। রাস্তায় আসার সময় দেখেছে - সাইনবোর্ডে লেখা- নিরসা চটি। হয়ত এ জায়গায় খনি হওয়ার আগে গাঁয়ের মানুষ গাছতলায় জিরিয়ে নিত। তাই 'চটি' নামটি এসেছে।

পৃথিবীর কোথায় ক'জন মানুষ খনি-পাতালে দগ্ধে মারা গেল - কে তার খোঁজ রাখে। ডেকরেটর তার নামের শালু টানিয়েছে পাবলিসিটির জন্য নিয়ামতপুর ডেকরেটর্স অ্যান্ড ক্যাটারার। মাটির নিচের কটি মানুষের জন্য পৃথিবীর কোনও উনিশ-বিশ হয়নি।

বিশু কোথায় গেল? ভাল করে তাকিয়ে ভিড়ের ভেতর বিশুর দাড়ি দেখতে পেল রজত। দূরে ক'জন দেহাতী মানুষজন, মাঝে - একটি লোহার পাইপের ওপর বসে। বিশু তাদের ছবি তোলার জন্যে উবু হয়ে বসল।

যেন একটি মাদার ডেয়ারির বড় ভ্যান দাঁড়িয়ে। একজন বলল, লিকুইড নাইট্রোজেন-রজত কোনওদিন কোনও গ্যাসকে তরল অবস্থায় দেখেনি। আর গ্যাস তো সাধারণত চোখে দেখা যায় না- যদি না তার গা থেকে ধোঁয়া ওঠে।

খনির মুখ থেকে একটি লোহার ডুলি উঠে এল ওপরে। অনেকটা পাল্কির মত। লোহার একটি খাচা। তার ভেতর থেকে ক'জন রেসকিউয়ার বেরিয়ে এল। মাথায় ক্যাপ। পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার। পাশেই খাঁচা ভর্তি খুদে খুদে মুনিয়া পাখি।

৩

রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটি গাছতলায়। সেখানে যেন বা রোদের ফিল্টার করা নরম আলোয় দুটি বাড়ির ছায়া এসে পড়েছে।

প্রথম বাড়িটার বারান্দায় বিশাল ডাইনিং টেবিলে তারের ফাঁক ফাঁক ঢাকনা দিয়ে খাবার ঢাকা দেওয়া।

ইরা ঠিক বুঝতে পারল না এখন কটা বাজে। এটা কি দুপুরবেলা? না, সবে সকাল? ভীষণ নির্জন। কাদের জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে? সাদা রঙের টেবিল ঘিরে ছ'খানা চেয়ার। সবকটি খালি। টেবিলের মাঝখানে সব খাবার এক জায়গায় করে তবে ঢাকা দেওয়া। কিন্তু কার জন্যে? কে খাবে? রাস্তায় একটা লোক নেই।

ইরা খাট থেকে নেমে ঝুলবারান্দায় বেরিয়ে এসে বাইরে ভাল করে তাকাল। নিচের রাস্তাটা লাল সুরকির। প্রথম বাড়িটার দেওয়াল কালো রঙের। তার বারান্দাটা দেখাচ্ছে বিস্কুট রঙের, কিন্তু টেবিল চেয়ার সবই সাদা। কারা যেন এখুনি এসে সেখানে খেতে বসবে। সে রকম একটা ভাব। তাদের যেন চেনে ইরা। কিন্তু কিছুতেই তাদের নাম মনে করতে পারল না সে।

বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ি। দুটো লিফ্‌ট ওঠা-নামা করছে। এক এক ফ্লোরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রবারের বল নিয়ে লোফালুফি করছে। তাদের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ইরার গায়ে একটা বল এসে লাগল।

একটি ক্লাস থ্রি-ফোরের মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, সরি আন্টি।

ইরা তার দিকে চেয়ে এমনই মুখের ভাব করল - যার মানে - ও কিছু নয়। এমন তো কিছু লাগেনি।

লিফ্‌টে নিচে নেমে এসে গোড়াতেই ইরার চোখ আকাশে পড়ল। অন্যদিনের চেয়ে আজকের আকাশ বেশি নীল। আর দূরের দিগন্ত কেমন লালচে হয়ে উঠেছে। ঠিক এই সময় সে দেখতে পেল - খাবার টেবিল-চেয়ার পাতা বারান্দা আর তার উল্টোদিককার বাড়িটার মাঝখানের রাস্তা দিয়ে পাড়ার ধর্মের ষাঁড়টা - যাকে প্রায়ই এ তল্লাটের সব রেশন শপ পোকায় কাটা গম এগিয়ে দেয় খেতে - সে বেরিয়ে আসছে। যেন বেরিয়ে এসেই সে বাঁ হাতের রজনী সেন রোডে ঢুকবে।

কিন্তু এ কি? চমকে উঠল ইরা। ধর্মের ষাঁড়টার কুঁজে - ঘাড়ে - এমনকি শিরদাঁড়া বরাবর লেজ অব্দি দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেছে। আর সে আগুনে ষাঁড়টার কোনও ভ্রূক্ষেপই

নেই। সে দিব্যি রজনী সেন রোডে না ঢুকে খাবার টেবিল পাতা বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। কী ভেবে যেন একবার দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পিঠময় আগুন সমেত বারান্দা থেকে নেমে প্রথম বাড়িটার পেছন দিককার অন্ধকারে চলে গেল।

ইরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এমন একটা চেনা ষাঁড়ের আগুনে কী হল? তা জানার জন্যেই সে এক ছুটে বাড়িটার বারান্দায় উঠে এল। আশপাশে কেউ নেই। একবার যেন মনে হল - এখন বোধহয় সন্ধ্যে রাত। বাড়িটার পেছনেই ফক ফক করছে জ্যোৎস্না। আর এও মনে হল ইরার - না, না, দিব্যি দুপুরবেলা - তবে রোদে কোনও তাপ নেই।

কিন্তু বাড়ির পেছন দিকটায় ষাঁড়টার খোঁজে এগিয়ে গিয়েই ইরার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এদিকে যে এসব আছে - জানতামই না। মেটে পাহাড়। ছাই রঙের। পাহাড়ের পায়ের কাছে ধানকাটা মাঠ। হলুদ রঙের। একটা পাথুরে ঢিবিতে অনেক কষ্টে উঠে ইরা দেখল - আগুনলাগা ধর্মের ষাঁড়টা পাথুরে রাস্তা ধরে একটা ভাঙা খিলানের নিচে। ইরা দৌড়ে গেল। তার পায়ের স্যান্ডেলে শাড়ির পাড় জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোথায় সন্ধ্যে রাত! কোথায় জ্যোৎস্না! এখন তো খা-খা দুপুর। পিঠে দাউ দাউ আগুন - সেই দশায় চেনা ষাঁড়টা খিলান পেরিয়ে পাহাড়ের ভাঁজে ঢুকে যাচ্ছে। রোদ নরম বলে আগুনের শিখা বেশ স্পষ্ট। ইরা দৌড়তে দৌড়তে দুই পাহাড়ের ভাঁজের মুখে এসে পড়ল।

এখানে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পেল - জায়গাটা অন্ধকার। ষাঁড়টা জ্বলন্ত আগুন হয়ে আরও অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে। নিশ্চয় ওখানে কোনও গুহা আছে।

আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির এত কাছে - রজনী সেন রোডের এত কাছাকাছি যে পাহাড় - পাথুরে ঢিবি - উঁচু - ভাঙামত খিলানের নিচ দিয়ে পাথুরে রাস্তা - ধানকাটা মাঠ যে আছে, কে জানত!

ইরা কোনওদিকে খেয়াল না করে একদম সেই ঘন অন্ধকারের সামনে এসে দাঁড়াল। পিঠময় আগুন নিয়ে ষাঁড়টা এইমাত্র গুহার ভেতর ঢুকে গেল। আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

ইরাও এগিয়ে গেল। সামনেই ঘন অন্ধকারের ভেতর গুহা আছে কিনা বুঝতে পারছে না। একবার তার মনে হল - এভাবে একা এতটা এগিয়ে আসা কি ঠিক হচ্ছে? এখন আর পিছোবার উপায় নেই। সে আবারও এগিয়ে গেল। কিন্তু আর যে এগনো যাচ্ছে না। ইরার চোখের সামনে চার-পাঁচটা দাঁতাল হাতি ঠিক গুহার মুখটায় শুঁড় তুলে হো হো করে হেসে উঠল। গুহার অন্ধকার মুখে হাতিদের সাদা দাঁত - শুঁড়ের নিচের লালচে হাঁ-মুখ - সবই দেখতে দেখতে ইরা খুবই অবাক হল। এরা হাতি। মস্ত বড় জন্তু। অথচ কী নরম। ভোলেভালা। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। বরং ঠা-ঠা করে হেসে পড়ে ছোট ছোট চোখ দিয়ে যেন ভেতরে যেতেই ডাকছে। চলে এসো। এসোই না। এসে দ্যাখোসে একবার।

ভেতরে ঢুকে পড়ে ইরার ততটা অন্ধকার লাগল না। বরং, কোত্থেকে যেন আলো আসছে। হাতিগুলো গেল কোন্ দিকে? যতই সে মাটির নিচে নামে - ততই তার চোখের সামনে একটার পর একটা পাতাল-পথ বেরিয়ে পড়ে। যেন ফিকে অন্ধকারে অসংখ্য গলিপথের মৌচাক। তার ভেতরটা খানিক দেখা যায়। অনেকটা কলকাতায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বিরাট বিরাট গোলাইয়ের সিমেন্ট ঢালাই পাইপ - যার ভেতরের খানিকটা রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখা যায়।

আলোটা আসছে কোন্ দিক থেকে? একটা বেশি উজ্জ্বল পাতাল পথে ঢুকে পড়ল ইরা। পায়ের নিচে এবড়ো-খেবড়ো। ঠিক দাঁড়ানো যায় না। ভাল মত হাঁটাও যায় না। তবু, ইরা এগোতে লাগল।

কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। আর সেই সঙ্গে মানুষের চিৎকার - যা কিনা কীসে যেন চাপা পড়ে থেঁতলে যাচ্ছে। আর গরম তো এখানে সহ্য করা যাচ্ছে না। সারা গা ভিজে উঠেছে ইরার।

এই পাতালের কোথায় চলে গেল হাতিরা? কোথায় বা গেল সারা পিঠে আগুন ধরে যাওয়া সেই ধর্মের ষাঁড়টা? তার মাথার ওপর এখন আকাশের নিচে খা খা দুপুর। সেখানে পাহাড়ের পা থেকেই ধানকাটা মাঠের শুরু।

আচমকা আগুনের হলকায় কয়েক পা পিছিয়ে এল ইরা। পাতাল পথের শেষটায় অনেকটা জুড়ে শুধুই আগুন। সেখানে আগুনের শিখাগুলো এক একবার চাতালে পড়ে লুটোপুটি খায় - আবার দাউ দাউ করে ঠেলে ওঠে। ঠেলে উঠতেই ইরা দেখতে পেল - আগুন যে সারা চাতাল জুড়ে - আর তার ওপাশেই কয়েকজন লোক - গাদিমারা সিমেন্টের বস্তার মতই পর পর পড়ে আছে। এদিক-ওদিক কেউ কেউ উঠে দাঁড়াতে চাইছে। পারছে না। চোখ জুড়ে অসম্ভব ঘুম। ডানদিকে একটা লোকের হাতের গাঁইতি মত কী একটা শব্দ করে পড়ে গেল। তার গায়ের জামায় এইমাত্র আগুন ধরে উঠেছে। ইরা পরিষ্কার দেখল - লোকটার কবজিতে হাতঘড়িটা আগুনের গরমে গলে গিয়ে ফুলকপির মতই ফুলে উঠেছে - গলে গিয়ে।

লোকটি আগুনের দিকে ফিরে তাকাতেই তার মুখ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল ইরা। বাবা গো - বাবা -

দুটো চোখই গলে গেছে। চোখের জায়গায় খানিক করে থপথপে নীল সাদা মলম যেন।

পড়ে যাচ্ছিল ইরা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল সে পড়ে যায়নি। কে যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে। মা - মা -

আবার একসঙ্গে দুটি গলা মা। ও মা - মাগো -

ঘুম ভেঙে গেল ইরা বসুর। সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। জানলা দিয়ে আকাশ দেখে ইরার মনে হল, বেলা বোধহয় চারটে সাড়ে চারটে। কিন্তু এ আমি কোথায় এখন?

ইরার চোখের সামনে বারো তের বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। তার পিঠে স্কুলের ব্যাগ। সাদা মোজা। কালো শ্যু। গলায় লাল টাই। তার পাশে কিছু ছোট একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তারও পিঠে স্কুলের ব্যাগ। দু'জনেরই চোখে চশমা।

এরা কারা? ইরা একদম চিনতে পারল না! আমি কি কোনও স্বপ্ন দেখছি? আমি তো সেই ধর্মের ষাঁড়টার কুঁজে - শিরদাঁড়ায় দাউ দাউ করে আগুন ধরে উঠতে দেখলাম। গলিপথের মৌচাক যেন ইরার মাথার ভেতরে খাপে খাপে বসে গেল। একদম জুতসই। এখন তার নিজের মাথার ভেতরেই কাদের গলা তুলে চেঁচানোর আওয়াজ থেঁতলে যাচ্ছে, টের পেল ইরা।

শঙ্কু আর তার ছোট বোন চিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেল। মায়ের এমন চোখ তারা কখনও দেখেনি। মাথার চুল এলোমেলো। চিনি বুঝতে পারছে - তাদের মা ফাঁকা বাড়িতে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে মা এখন কেমন ফাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, মা - কী হয়েছে তোমার?

শঙ্কুর কাঁদতে লজ্জা করছিল। সে বুজে-আসা গলায় কোনওরকমে বলতে পারল, মা-

সবে শঙ্কু কিশোর হয়ে উঠছে। গলার স্বর বদলাচ্ছে তার। তাই তার গলায় 'মা' কথাটা ভীষণ ভারি, গাঢ় শোনাল।

ছেলেমেয়ের গলা শুনে ইরা একটু একটু করে নিজের ধাতে ফিরে আসতে লাগল। নিজের ফ্ল্যাটে। এই কলকাতায়। তাহলে এতক্ষণ আমি যেখানে ছিলাম - সে জায়গা আমার নয়। বরং

এখন যেখানে আছি, সে জায়গাই আমার। ওই আমার ছেলে শঙ্কু। ক্লাস সেভেনে পড়ে। ওই যে চিনি। আমার মেয়ে। ক্লাস ফাইভে পড়ে। এখন ওরা স্কুল থেকে ফিরল। এবার ওদের খেতে দেব। এইসব ভাবতে ভাবতে ইরা বিছানা থেকে নামল। আমি এত স্বপ্ন দেখি কেন? স্বপ্নে এক একদিন এক এক দেশে চলে যাই। ব্যাপারটা তো রুক্মিণী মাকে বলতে হবে। মা তুমি বলে দাও - কোনটা আসলে সত্যি? স্বপ্নে যেখানে চলে যাই - সে-সব সত্যি? না, চোখ খুলে যেখানে ফিরে আসি - সেটাই সত্যি? রুক্মিণী মা। আমার তো এক এক সময় মনে হয় - চোখ মেলেই যেখানে ফিরে আসি - সেখানটাই মিথ্যে। এই বাড়ি। এই ছেলে মেয়ে। অভিষেক। সব। আমার বিয়ে করা স্বামী হল অভিষেক। এরা তো আমার নতুন নতুন। আসলে চোখ বুজলে স্বপ্নে আমি যেখানে চলে যাই - সেখানটাই আমার অনেকদিনকার - আসল - সত্যি। আমি মাঝে মাঝে শুধু এখানে চলে আসি। এখানে মানে এই ফ্ল্যাটে। শঙ্কুর কাছে। চিনির কাছে। কতদিনই বা ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ।

ইরা শঙ্কুকে এখনও নিজের হাতে ভাত মেখে খাইয়ে দেয়। শঙ্কু ভাত না খেয়ে - ডিমভাজাটা আগে খেয়ে নিচ্ছিল। ইরা বকে উঠল, ভাত খেয়ে নাও। তোমার বাবা বলেছে - ভাত না খেলে এই বয়সে মাসল্ তৈরি হয় না। লিকপিকে শরীর নিয়ে ক্রিকেটার হবে কী করে?

ভাতের গ্রাস মুখে নিতে নিতে শঙ্কু জানতে চাইল, বাবা বলেছে? কখন বলেছে?

কাল রাতে। খাবার সময়।

রাতে? খাবার সময়? - বলে বেশ সন্দেহের চোখে শঙ্কু জানতে চাইল, আমি তখন কোথায় ছিলাম?

তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলে! নাও খেয়ে নাও।

চিনি বলল, মা। কালও তো বাবা অনেক রাতে ফিরেছে। দাদা ঘুমিয়ে পড়ল। আমি হোমটাস্ক করছিলাম। শেষে তুমি একা একা খেয়ে নিলে। আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছি। তখনও তো বাবা ফেরেনি।

বেশি পাকা হয়েছ? তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবে তোমাদেব বাবা এল। অনেক রাতে তাকে খেতে দিয়েছি। তখন বলতে পারে না কথাটা?

চিনি তার বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিল। তার মানে মা বলতে চেয়েছে - বাবা একা একা খাওয়ার সময় - কাল রাতে মাকে ওই কথাটা বলেছে। ভাত ঠিক মত না খেলে শঙ্কুর মাসল্ তৈরি হবে না। মাসল্ তৈরি না হলে - যতই চেষ্টা করুক না কেন - শঙ্কু কিছুতেই ক্রিকেটাব হতে পারবে না। লিকপিকে শরীরে ক্রিকেটার হওয়া যায় না।

শীতের বিকেল খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাকে ডেকে আনে। বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ির রান্নাঘরে রান্নাঘরে নানা রকমের রান্নার গন্ধ এখন বেরিয়ে পড়বে বাতাসে। কলঘরে কলঘরে জলের ছচ্ছড়। শঙ্কু আর চিনি খেয়েই খেলতে নেমে গেল একতলার মাঠে। ঝুলবারান্দায় এসে ইরা ফের দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে একা একাই বলল, বাবা গো - বাবা-

ঠিক তখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে রজত পালিত আগে আগে হেঁটে চলেছে। তার পিছনে বিশু। হাতে ক্যামেরা। ওদের পেছনে পাড়ে আছে নিরশা কোলিয়ারি। রজত একবার পেছন ফিরে তাকাল। কোলিয়ারির শুকনো চিমনির ডগা দেখা যায় শুধু। ওখানে ভিড় করে থাকা

গাড়ির পর গাড়ি, মানুষজন, পুলিস - কিছুই চোখে পড়ল না রজতের। সবই গোডাউন আর গাছপালার আড়ালে। আকাশ অন্ধকার করে সন্ধ্যে হয় হয়।

বিশু বলল, আমরা মনে হচ্ছে এসে গেছি। সামনের এই কোয়ার্টাবগুলোই বোধহয় তের নম্বর ধাওড়া।

রজত কিছু না বলে হাঁটার স্পিড বাড়িয়ে দিল। এমন করেই অন্ধকার নামছে- এরপব তো চিনে বের করা যাবে না কোন্ জায়গা। এখানে তো প্রায় জঙ্গলের ভেতর পায়ে চলা পথের মতই সরু সরু পিচের রাস্তা। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে কী করে তের নম্বর ধাওড়া খুঁজে পাওয়া যাবে, তা সে বুঝে উঠতে পারে না। বিশুর ওপর রজতের এখন খুব রাগ হচ্ছে। সে রাগ রজত আর চেপে রাখতে পারল না। বলেই ফেলল, অতগুলো ছবি তোলার খুব কী দবকার ছিল বিশু?

বিশু লম্বা লম্বা পা ফেলে রজতকে ধরে ফেলে বলল, কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা তুলি বলুন তো?

সে তো তোমাকেই ঠিক করতে হবে। এটা তো পিকচার পেজ হবে না বিশু। আমরা খনির আগুন কিংবা রেসকিউয়ের কাজের ছবি আলাদা কবে তুলতে আসিনি এখানে।

তা আপনি বলবেন তো।

আমি তো সকাল থেকেই পই পই কবে বলে আসছি - আমরা এখানে কেন এসেছি।

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। পাথুরে রাস্তাঘাটের দু'পাশেব জঙ্গল

অন্ধকারে এই মাত্র মুছে গেল। খনির লোকজনের থাকবার কোয়ার্টার থেকে ইলেকট্রিকের আলো যা বেরিয়ে পড়েছে - তাতেই বোঝা যায় কাছাকাছি মানুষজন আছে।

রজত ফের বলে উঠল, ইন্ডিডেন্টের যা কিছু খবর সব তো বেরিয়ে গেছে বিশু। সে জন্যে তো আর সব কাগজের মত আমাদের লোকজন ঘুরে গেছে। আবার আসছে। ছবিও নিয়েছে। তুমি শুধু শুধু অতক্ষণ ধরে ক্যামেরার শাটার টিপে যা পাচ্ছিলে, তারই ছবি তুলছিলে কেন? মাটি ফুটো করে অন্য পথ দিয়ে লিকুইড নাইট্রোজেন খনিতে পাঠাবে - আগুন নেভাতে - তারও ছবি চাই!

ওটা তো ইমপর্টান্ট।

তোমার কাছে সবই ইম্পর্টান্ট! মানুষের মুখের ছবির চেয়ে ইমপর্টান্ট কিছুই হতে পারে না বিশু। আমরা এসেছি এখানে - এতজনের মৃত্যু - সে মৃত্যু কতটা বড় - কতখানি গ্রিম - সেই ছবি তুলতে - সেই ছবির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় - এমন লেখা লিখতে।

বিশু আর কথা না বাড়িয়ে চাপা গলায় বলল, এটাই তের নম্বর ধাওড়া। পুরনো টাইপের কোয়ার্টার।

পায়ে চলা পথ। দাগরাজি করা ইটের এক ধাঁচের কিছু বাড়ি। সামান্য উঠোন। দু-একটা গাছ। সব বাড়ি থেকেই রাতের খাবার তৈরি করার চুলো থেকে অঢেল ধোঁয়া বেরচ্ছে। দু-একটি বাচ্চা ছেলে এদিক ওদিক।

রামটহল দুসাদের কোয়ার্টার চিনতে কষ্ট হল না রজতদের। একটি দোতলা কোয়ার্টারের একতলার বারান্দায় রীতিমত ভিড়। আশপাশ শুনশান। একটি মারুতি জিপসি দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লেখা - অ্যাম্বুলেন্স। ইংরেজিতে।

ভিড়ের ভেতর গলা বাড়িয়ে রজত জানতে চাইল, কিছু খেয়েছে -?

এক মহিলা। মাথায় ছাপা শাড়ির ঘোমটা। রজতের মুখে তাকিয়ে বলল, আভি তক কুছ নেহি খায়া - তিন রোজ হো চুকে -

কয়লাখনির হাসপাতালের নার্স খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। হাতে রবারের নল। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা এখানে ভিড় করবেন না তো। সরুন। সরে যান - হাওয়া কি জরুরত হ্যায়।

রজত শান্ত গলায় জানতে চাইল, গ্লুকোজ নিচ্ছে না?

নার্স মেয়েলি মাঝবয়সী, বাঙালি। তাই তো মনে হচ্ছে রজতের। সে রজতের মুখে তাকিয়ে পড়ে বলল, এত যখন জানেন, তো ভিড়টা একটু পাতলা করে দিন না। ঘরের ভেতর ঘেমে উঠেছেন মহিলা। আর আধঘন্টা দেখে হসপিটালে শিফ্‌ট করাব। বার বার ফেইন্ট হচ্ছেন।

রজত পালিত বুঝল, এখানেই তার লেখার থিম শুয়ে আছে। ওই খোলা দরজা দিয়ে সে যে মহিলার আভাস পাচ্ছে - তিনি রামটহল দুসাদের স্ত্রী। রামটহলের বডি এখনও খনি-পাতাল থেকে তোলা সম্ভব হয়নি। কোল মিনিস্ট্রি যারা যারা মারা গেছে- তাদের জন্য কমপেনসেশনের বহর ঘোষণা করেছে। তাদের বউ-বাচ্চা সবাই টাকা পাবে। কাজ পাবে। কিন্তু রামটহলের বউ যে যায় যায়। তিনদিন হল মুখে কিছু দেয়নি।

নার্স মেয়েটি বেরিয়ে যেতে অনেকগুলো মুখ একসঙ্গে রজতের দিকে তাকিয়ে পড়ল। রজত খনির লোক নয়। রজত পুলিসেরও লোক নয়। সে ট্রেড ইউনিয়নেরও কেউ নয়। কিন্তু ভারি চেহারা - কাঁচাপাকা মাথা তার জানতে চাওয়ার মোটা গলা - সব মিলিয়ে ভিড়ের মুখে

সে একজন কেউকেটা হয়ে গেল।

রেখায় রেখায় কোঁচকানো মুখখানি নিয়ে সেই মহিলা মাথার ওপরকার ঘোমটা টেনে জানতে চাইল, হামারি ক্যা হোগি বাবুজি?

বয়স পঞ্চান্ন হতে পারে। আবার পঁচাত্তর হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মুখখানি একদম পাথর। নাকে রুপোর নথ্। রজত জানতে চাইল, রামটহল কউন হোতি হ্যায় আপকি?

মেরি বেটা -

তার মানে ঘরের ভেতর যে মেয়েটি বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে - যাকে কিছুই খাওয়ানো যায়নি গত তিনদিনে - সে এই মহিলার ছেলের বউ।

ক্যা মেরি রামটহল জিন্দা হ্যায়?

রজত অন্যদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, কোশিশ তো চল রহা হ্যায় -

এ কথায় মহিলা তার শুকনো হাতখানি রজতের পিঠে রাখল। শার্টের ওপর দিয়ে সে হাতখানির ছোঁয়া রজতের রীতিমত ঠাণ্ডা আর কেঠো-কেঠো লাগল। কী এক অস্বস্তিতে নিজেই ভিড়ের ভেতর সরে যেতে চেষ্টা করল রজত পালিত। পারল না। ওই গাদাগাদির ভেতরেই বিশু ক্যামেরা বের করে ফেলেছে।

মহিলা রজতের পিঠের ওপর থেকে হাতখানি সরিয়ে নিল না। বরং, খুব নির্ভর করেই আরও বেশি করে ভর দিল। দিয়ে বলল, রামটহল ক্যা জিন্দা লওটেগা? এ কথার কোনও উত্তর হয় না। সুগন্ধী মৃত্যু, আগুনের মাঝখানে পথ আটকে রয়েছে পৃথিবীর গায়ের মাটির মলাট। পাথরের মলাট। সে মলাট ফুটো করে অন্য কোনও রাস্তা দিয়ে তরল নাইট্রোজেন ঢেলে দেবার চেষ্টা চলছে। তিষ্ঠোতে না পেরে কয়েকজনকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই রজত কোয়ার্টারের ছোট্ট মত পয়লা ঘরখানিতে ঢুকে পড়ল।

চড়া ইলেকট্রিক আলোর নিচে বছর ত্রিশ-বত্রিশের একজন মহিলা ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে ভেতরকার খিঁচুনিতে মেয়েটি থরথর করে কেঁপে উঠছে। মুখের একদিক আলোয়। অন্যদিক অন্ধকারে।

ঘরের দেওয়ালে একমাত্র ছবি পবন নন্দনের আর জল রাখার কলসির পাশে ছোট্টমত একটি আলনা। তাতে রামটহলের জামা, ট্রাউজার, একখানি নীল রঙের শাড়ি।

এর মুখ থেকে এখন তো কোনও কথা পাওয়া যাবে না। পেলে লেখার একটা আন্দাজ পেত রজত। ফিডিং নলের রবারের মুখটি মাথার বালিশের কাছে। রজত ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির মুখ দেখতে গেল।

অমনি মেয়েটি যেন খিঁচুনি দিয়ে আধখানি উঠে বসল। বসেই বলে উঠল, বাবা - বাবা গো -

ঘরের জানলার বাইরেই অন্ধকার মাঠ। উঁকি দিলে রজত পালিত রানীগঞ্জের দিককার আকাশের মাথায় একটা চাঁদ দেখতে পেত। এসব দেখার মত তার মন নেই এখন।

রামটহলের বউ মূর্ছার ঘোরেই আধখানা উঠে বসে তার হাত এমন শক্ত করেই ধরেছে - রজত কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারল না। তাছাড়া জোর করে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে যদি ঝাঁকুনির চোটে খাট থেকে পড়ে যায়। একেই তো টানা তিনদিন মুখে কিছু দেয়নি।

কিন্তু যে-ই না বউটি 'বাবা-বাবাগো-' বলে উঠল - অমনি নিজের হাতখানি এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে রজত চেঁচিয়ে উঠল, ইরা -। ইরারে -

পেছন পেছন বিশু ক্যামেরা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। রজতের এই ঘর ফাটানো গলায় 'ইরা -' বলে চিৎকারে তার হাত থেকে ক্যামেরা পড়ে যায় যায়। সামলে নিয়ে বিশু বলল, কী হল? কী হল রজতদা?

রজত পালিত কোনও কথা বলতে পারল না। তার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠেছে। সে কোনও কথা বলতে পারছে না। রামটহলের বউ আবারও নেতিয়ে পড়েছে। ফের তার দু'চোখ মুদে এল।

ঘরের দোরে - বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা - দাঁড়ানো মানুষজনও কম অবাক হয়নি।

আর সে অবাক হওয়াটা যতটা রজতের অমন চেঁচিয়ে ওঠায়- তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হয়েছে সবাই কী করে রামটহলের বউ অমন বাঙ্গালিনের মত প্রায় 'শুধু বাঙলায়' চেঁচিয়ে ওঠে? গলাটাও কেমন বদলে গেল। আশ্চর্য। রামটহল দুসাদরা তিনপুরুষ ধরে নিরসা কোলিয়ারির নুন খাচ্ছে। ওরা বাংলা বলতে পারে। বোঝেও। সেই কবে হাজিপুর থেকে গঙ্গা পেরিয়ে পাটনায় এসে আসানসোল-রানীগঞ্জ-ঝরিয়ার ট্রেন ধরেছিল তার ঠাকুর্দা। তারপর যে কতরকমের অদলবদল হয়ে গেল। কিন্তু -

রামটহলের মা উঠে এসে ছেলের বউয়ের কপালে হাত রাখল। বিশু দেখল, তার মুখেও কেমন অবাক হওয়ার - অবিশ্বাসের ছায়া। চামেলি - এ চামেলি - চল চামেলি - উঠ -

কোনও সাড়াই দিল না চামেলি। কে বলবে - এই একটু আগেই এই বউটিই সারা শরীরে খিঁচ তুলে আধো শোওয়া দশায় একদম ঠেলে উঠেছিল। 'বাবা - বাবাগো' বলে রজত পালিতের ডান হাতখানি খিমচে ধরেছিল।

রজত পালিত বুঝল রামটহলের বউ চামেলীর মুখ থেকে এখন একটি কথাও পাওয়া যাবে না। কোনওরকম কথা বলার অবস্থাই নেই মেয়েটির। সে রামটহলের মাকে ভাঙাচোরা হিন্দিতে বোঝাতে চাইল - এখন রামটহলের বালবাচ্চা তাদের মায়ের কাছে থাকলে ভাল হত। উসকি বালবাচ্চাকো আভি উনকি পাশ রহেনা চাহিয়ে -

রামটহলের মা যে চোখে রজতের চোখে তাকাল - তাতে রজত পালিত ওখানে আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বারান্দায় - বারন্দা থেকে একদম উঠোনে বেরিয়ে এল।

৪

এখন মাথার ওপর সন্ধ্যেরাতের আকাশ। বিশু গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে এসে রজতের পাশে দাঁড়াল। রজত তখন আকাশে তাকিয়ে দেখল, যাও বা ক'টি তারা আকাশে ফুটি ফুটি হয়ে দেখা দিয়েছিল — তারা এখন নিরসা খনি-মুখে ঝিমিয়ে পড়া মুনিয়া পাখির মতই নিভু নিভু। —দু' একটা তারা যেন বা খুদে খুদে জ্বলন্ত হলুদ ডানা মেলে সামান্য-প্রাণ মুনিয়াদের ধাঁচেই এই মাটির পৃথিবীতে খসে পড়ে মুছে যাচ্ছে।

অমন চেঁচিয়ে উঠলেন কেন রজতদা?

রজত পালিত একথার কোনও জবাব দিল না।

ইরা কে?

খচ করে বিশুর মুখে ফিরে তাকাল রজত পালিত। বিশু এখনও সেভাবে সংসার করার মত সংসারে ডোবেনি। ওর বউ রেণুকে আগামীকাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া দরকার। আমরা এখন অজয় আর দামোদরের মাঝখানের কোল বেল্টে দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের নিচে পাতালে প্রাগৈতিহাসিক সব গাছ কয়লা হয়ে পড়ে আছে। রজত শান্ত গলায় বলল, ইরা আমার মেয়ে।

বিশুর সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তার এখন একসঙ্গে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করছে। যেমন — ইরা এখন কোথায়? কত বড়? সে বয়সে বড়? কেনই বা রজতদা রামটহলের বউ চামেলির মুখে — বাবা — বাবাগো — ডাকটা শুনেই নিজের মেয়ের নামটা চেঁচিয়ে বলে উঠল?

বিশু বলল, ভাড়া করা গাড়ি যখন সঙ্গে রয়েইছে — তখন একটা অ্যাটেমপ্ট নিলে কেমন হয়?

আমরা তো কোনও ইনসিডেন্টের খবর রিপোর্ট করছি না। তাড়াহুড়োর কী আছে বিশু।

ধরুন বাই কার একদম বর্ধমান চলে গিয়ে সেখানে গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। ফাঁকা রাস্তা এখন। দু'ঘণ্টায় পৌঁছে যাব। রাত সওয়া ন'টা — সাড়ে ন'টায় কোনও লোকাল পেলে হাওড়ায় পৌঁছব রাত বারোটার ভেতর। অফিসে পৌঁছে যাব সাড়ে বারোটায়। লিখতে আপনার আর আধঘণ্টা। তার ভেতর আমার ছবিও হয়ে যাবে। তাহলে কালকের 'এখন' পয়লা পাতায় স্টোরিটা দিতে পারে —

উঠোনের আবছা আলোয় বিশুর মুখখানি দেখা যাচ্ছে না। ভেতর বারান্দায় দুসাদ বাড়ির লোকজন ছাড়াও আর অনেকে। নার্স মেয়েটি ফের বারান্দার লোকজনকে গুঁতিয়ে ঘরের ভেতরে গেল। হাতঘড়িতে সাতটা বেজে তিন মিনিট। রজত পালিত বলল, নিরসা খনির ঘটনার ঘনঘটা সবই তো 'এখন' সমেত কলকাতার সব কাগজ ফলাও করে ছেপেছে। দৌড়োদৌড়ি করে দেবার মত এখন তো কোনও খবর নেই বিশু।

বিশু কোনও কথা বলল না। ভেতর ঘর থেকে চামেলির গলার চাপা আওয়াজ ভেসে এল। অনেকটা বোবায় ধরার গোঙানির মত। নিশ্চয় নার্স মেয়েটি চামেলিকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। রবারের নল দিয়ে। বিশুর দিকে তাকিয়ে রজত বুঝল, ও বাড়ি ফেরার জন্যে আঁকুপাকু করছে। আগামীকালই রেণুর ব্লাড ট্রান্সফিউশনের দিন।

আস্তে জানতে চাইল, তোমার তো ছবি হয়ে গেছে বিশু?

হ্যাঁ। সাত-আটটা নিয়েছি। তার ভেতর থেকে বেছে নেওয়া যাবে।

তাহলে তুমি চলে যাও। আর দেরি কোরো না।

যাব? আপনি?

তুমি সিধে গাড়ি নিয়ে দুর্গাপুর চলে যাও। ব্ল্যাক ডায়মন্ড মিস করলেও আরও অনেক ট্রেন পেয়ে যাবে—

আপনিও চলুন না রজতদা—

না। আমার এখনও সব দেখা হয়নি।

কোথায় থাকবেন? কাছাকাছি তো কোনও হোটেল নেই।

দেখি। কিছু না পেলে এখানেই কোথাও থেকে যাব।

বিশু রীতিমত চমকে উঠল। কী বলছেন রজতদা? নিরসা খনির তের নম্বর ধাওড়ায় থেকে যাবেন?

হ্যাঁ। থাকব বিশু।

কোথায় থাকবেন? এখানে কে আপনাকে থাকতে দেবে! কাউকে চেনেন? না। চেনেন না। কেউ আপনাকে চেনে? না। চেনে না। নিরসা খনির এখন খারাপ সময়। মানুষজন ক্ষেপে আছে। পাতাল থেকে ডেডবডি উঠছে। পুলিস পাহারায় চব্বিশ ঘণ্টা রেসকিউ কাজ চলছে। যদি খনি সাইটে গেস্ট হাউস থেকেও থাকে — এই অবস্থায় কোনও মাইনেরই ম্যানেজমেন্ট জেনেশুনে — বিশেষ করে একজন খবরের কাগজের লোককে আদর করে রাত্রে থাকার জন্যে তাদের গেস্ট হাউসের দরজা খুলে দেবে না। দিতে পারে না রজতদা।

বাতাসে শীত। আকাশের নিচে ধাওড়ার এই সামান্য জায়গাটুকুতেই শুধু ইলেকট্রিকের আলো। নয়ত বাকি সব অন্ধকার। তার ভেতরেও রজত পালিত বুঝল, রোগা মত বিশু রীতিমত থরথর করে কাঁপছে। কী এক উত্তেজনায়। কেউ উত্তেজিত না হলে একসঙ্গে এতগুলো কথা বলতে পারে না।

রজত শান্ত গলায় বলল, আজই কলকাতায় ফিরে গিয়ে অফিসে লেখা জমা দিতে হবে — এমন তো নয়। আমাকে আর একটু বুঝতে দাও। তারপর লেখা যাবে। আমাকে থাকতে হবে।

তাই বলে আজকের রাতটা আপনাকে এখানে তাকতে হবে? কোথায় থাকবেন? চলুন। চলুন — একসঙ্গে ফিরে যাই।

না, তা হয় না বিশু। তুমি ফিরে যাও। আমি থাকব।

থাকবেন কোথায়? গাড়ি রয়েছে। আপনাকে আসানসোল নয়ত দুর্গাপুরে কোনও হোটেলে আজকের রাতটা থাকার জন্যে তুলে দিয়ে একদম বর্ধমানে গিয়ে হাওড়ার কোনও লোকাল ধরে নেব।

রজত কোনও কথা না বলে ছ'খানা একশ টাকার নোট বিশুর হাতে দিয়ে বলল, বর্ধমানে পৌঁছে ড্রাইভারকে হিসেব করে টাকা মিটিয়ে দেবে। রশিদ নিতে ভুলো না। কিলোমিটার পিছু দু'টাকা আর গাড়ির জন্যে দু'শ টাকা। হল্টিং পঞ্চাশ টাকা।

রজতের গলার স্বরে কী ছিল। আধো অন্ধকারে টাকাটা নিল বিশু। কোথায় থাকছেন তা হলে রাতটা শুনি?

কোথায় আর থাকব! মাঠের ওই গাছগুলো রাতটা যেমন কাটিয়ে দেবে — তেমনি থেকে যাব এখানে আকাশের নিচে! একটা তো রাত।

রাগে রাগে বিশু গাড়ির দিকে খানিকটা হেঁটে গিয়েই ফিরে এল। আচ্ছা বলুন তো রজতদা — আপনি না হয় আমার চেয়ে এই প্রফেশনে অনেক অনেক সিনিয়র — তাই বলে একটা স্টোরির সব বুঝে নিতে আপনাকে এখানে একটা গাছের মতই আকাশের নিচে রাত কাটাতে হবে?

আঃ! বুঝছ না কেন বিশু। আমি একজন বুড়ো লোক। পি এফ, গ্র্যাচুইটি কিছুই পাইনি আগের কাগজ থেকে। চাকরিটা রাখতে আমাকে তো রিপোর্টটা জোরালো — ভাল করে করতেই হবে। খেটেখুটেই তো লিখতে হবে।

আমাকে কী ভাবেন বলুন তো রজতদা? আমি কি একটা গাধা? আমি কোনও কিছু বুঝি না!

কেন? কেন?

ভাল কপি করতে হবে — ভাল রিপোর্ট পাঠাতে হলে -- কি রাত কাটাতেই হয় স্পটে? কাছাকাছি কোনও হোটেলেও রাতটা থাকা যায় না রজতদা?

তা হলে শোনো। এখানে থাকলে অন্তত একজন ডেডের -- অন্তত রামটহল দুসাদের মৃত্যুর পরিণামটা বুঝতে পারব বিশু। খনির পাতালে দগ্ধে মারা গেছে রামটহল দুসাদ। পাঠকে জানতে চায় — রামটহলের বউ চামেলির কী হল? সে কেমন আছে? সে কী পেল? চামেলির কী হবে? তা ছাড়া —

তা ছাড়া? তো ছাড়া কী?

চামেলি যে আমাকে ডেকেছে বিশু। বাবা — বাবাগো — বলে আমায় ডেকেছে। ডেকেই ফের জ্ঞান হারিয়েছে। তার জ্ঞান ফিরুক। জ্ঞান ফিরলে আমাকে ফের কী বলে — তাই শুনি আগে। সে সব কথা না জেনে না শুনে আমি যাই কী করে?

বলতে বলতে রজত দেখতে পেল — তার মুখের কথা শুনতে শুনতে বিশুর চোখ জোড়া বড় হয়ে উঠল। তারপর সে কিছুই না বলে গট গট করে হেঁটে গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে পলকে মিলিয়ে গেল।

কলকাতার কাশীপুরে বিশু নিজের বাড়িতে ফিরল রাত সওয়া একটায়। দিনরাতের কাজের মেয়েটির ঘুম খুব পাতলা — খুট খুট করে দরজায় শব্দ করতেই ঝর্না অন্যদিন আলগোছে দরজা খুলে দেয় — পাছে সামান্য শব্দেও বৌদিমণির ঘুম ভেঙে যায়।

আজ কিন্তু দরজায় খুট খুট করে শব্দ করতেই দরজা খুলে বিশু ঘোষের সামনে দাঁড়াল রেণু।

তুমি জেগে আছো এতরাত? কী ব্যাপার? ঝর্না কোথায়?

জেগে থেকে থেকে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার ট্যাক্সির আওয়াজে বিছানায় উঠে বসলাম। খেতে দিই?

নাঃ! এত রাতে খাব না রেণু। তুমি শুয়ে পড়। রাস্তায় খেয়েছি।

খেয়ে এসেছ সত্যি?

হ্যাঁ। দুর্গাপুরের কাছাকাছি রাস্তায় একটা ভাল হোটেল পড়েছিল। কিন্তু তুমি জেগে থেকেছ কেন এতক্ষণ? বলতে বলতে জুতো জামা খুলে পাজামা পরে নিল বিশু। দেওয়াল তাকে ক্যামেরা সমেত ব্যাগ রেখে নিজেই গ্যাস খুলে জল গরম করতে বসাল। কাশীপুর রতনবাবু রোডে বড় একখানা ঘর আর কল বাথরুম নিয়ে এই ছোট্ট আস্তানাটায় দু'জনের দিব্যি চলে যায়। রান্নাঘরের লাগোয়া ঢাকা বারান্দায় কাঁথায় মুড়িসুড়ি দিয়ে ঝর্না ঘুমোচ্ছে। সারা পাড়া নিঃঝুম। খানিক আগে শ্মশান যাত্রীদের হরিধ্বনিতে কয়েকটা কুকুর জেগে গিয়ে এদিক ওদিক চেঁচিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

গরম জল গামলায় ঢেলে তাতে খানিক নুন দিল বিশু। তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই পায়ের গোড়ালি গরম জলে ডোবাতে লাগল। এভাবে পায়ের ব্যথা কমানো যায়।

ছবি দিয়ে এলে অফিসে?

নাঃ! আগে দিয়ে কী হবে? রজতদা স্টোরি জমা না দিলে ছবি দিয়ে তো কোনও লাভ নেই। কেমন স্টোরি দেবেন — সে স্টোরির সঙ্গে কোন ছবি খাপ খাবে — সে সব তো দেখতে

হবে রেণু। জানো রেণু — মানুষটা বড় অদ্ভুত।

কীরকম?

গরম জলে পা পালটে পালটে ডোবাতে লাগল বিশু। তারপর বলল, ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে —

কী ব্যাপার? সেই খনিতে আগুন তো? হ্যাঁ

রেণু। আগুন। হ্যাঁ। আগুন মানে অনেক লোকের একসঙ্গে খনির পাতালে হেল্পলেস্ মৃত্যু — বিরাট এক মৃত্যুকে লেখার মত ভাষায় তুলে আনতে রজত পালিত নিরসা খনির মাইনারদের ধাওড়ায় থেকে গেলেন আজকের রাতটা।

থাকার জায়গা আছে বুঝি সেখানে —

আরে নাঃ! মাথার ওপর স্রেফ শীতের আকাশ। কাছেপিঠে কোনও হোটেল বা বোর্ডিং হাউস — কিছুই নেই। চারদিকে শুধু খা খা মাঠ। খাদান। কাদড়। আর দু-চারটে গাছ। রিটায়ারের বয়স হয়ে গেছে লোকটার। খবরের কাগজেও অনেকদিন। পুরনো দিনের প্রফেশনাল জিল আর কি। ও হ্যাঁ। আর বলেন কি — এক মাইনারের — যার বডি এখনও খনি পাতালে পড়ে আছে — তার বউ আমাকে বাবা — বাবাগো বলে ডেকেছে — আমি যাই কী করে তাকে ফেলে —

রেণু বলল, হয়ত ভদ্রলোকের আমাদেরই মত কোনও ইস্যু নেই।

হয়ত তাই। হয়ত নয়। কে জানে!

পা ভাল করে মুছে নিতে নিতে বিশু জানতে চাইল ওদের দুধ, কলা, ডিম দিয়েছিলে?

ব্লাড ডোনেশনের ক্যাম্পই হল না আজ তো ডিম কলা ও সব দিতে যাব কেন শুধু শুধু?

ছিঃ! ছিঃ! দাওনি?

না।

ক'জন এসেছিল রেণু?

মোট সাতজন।

ফি মাসেই ডোনার কমে যাচ্ছে। কার বা ভাল লাগে রক্তদান করতে! শোনো রেণু — ভাল করে শোনো। মাসে দু' বার আমাদের রক্তের দরকার। তোমার জন্যে দরকার। ডোনেশন ক্যাম্প খুলে পাবলিককে ডেকে এনে আমরা যে রক্ত পাই — তা সরকারকে দান করি বলেই না তার বদলে তোমার জন্যে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত পাই। তাই ব্লাড ডোনেট করতে কেউ এলে — তার রক্ত টানা হোক বা না হোক — তাকে তোয়াজ করে হাসিমুখে বসাতেই হবে — ডিমসেদ্ধ, দুধ, কোনও একটা ফল তাকে এগিয়ে দিতেই হবে। নয়ত রেণু দেখবে আমাদের ডোনেশন ক্যাম্পে একদিন একজনও ডোনার আসেননি। তখন?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে থেমে পড়ল বিশু। কী হল? মুখ তোল।

তুলতে পারল না রেণু। বিশু খানিকটা এগিয়ে এসে রেণুর সামনে দাঁড়াল। তারপর তার চিবুক তুলে মুখখানি তুলে ধরতে চাইল। পারল না। রেণু কিছুতেই তার মুখ তুলবে না। দু'চোখই জলে ভরে গেছে। কোনওমতে সে বলতে পারল, শুধু আমারই জন্যে —

বিশু ভাল করে তাকাল। রেণুর শরীরটা ভাল নেই। বিয়ের কিছুদিনের ভেতরই হঠাৎ রেণু হাঁফ ধরে শুয়ে পড়তে থাকে। এ এক গভীর অসুখ। রক্তের গভীরে। রেণু মায়ের পেটে থাকতে তার ভ্রূণ শরীরে রক্তকণা যে দশায় ছিল — রেণু এই পৃথিবীর আলো দেখার পরও সেই

রক্তকণাই শরীরে থেকে গেছে। বদলায়নি। এর ভেতর রেণু একদিন শিশু থেকে বালিকা — বালিকা থেকে কিশোরী — কিশোরী থেকে তরুণী হয়েছে — তবু রক্তকণার কোনও বদল হয়নি।

বিশু আলগোছে রেণুর মাথা নিজের বুকের ভেতর চেপে ধরল। আমি কোনওদিন তোমায় ছেড়ে যাব না রেণু।

রেণু দু'হাতে বিশুকে জড়িয়ে ধরল। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। মাসে দু'বার নিয়ম করে বাইরের রক্ত শরীরে ঢোকালে তার শরীর ঠিক এভাবেই থরথর করে কাঁপে। কী অস্থির দশা হয় তখন। বুকের ভেতরটা দপদপ করতে থাকে। নাড়ির চলাচল ভীষণ ইরেগুলার হয়ে পড়ে। এই দৌড়নো তো দৌড়নো, আবার কেমন ধিকিয়ে ধিকিয়ে এগোনো। বিশু মাথা নিচু করে রেণুর মুখখানি দেখতে পেল। এই মুখে সে যেন জন্মকাল থেকে থেকে-যাওয়া রক্তকণার মতই না-বেড়ে-ওঠা এক বালিকাকে দেখতে পেল। সে এক অনাদি বালিকা। রেণুর যেন কোনওদিন বিয়ে হয়নি। বিয়ে হবে না। তার রক্তকণার মতই। যারা কোনওদিন বদলাবে না। যারা বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেবে ঠিকই। কিন্তু শরীরের কোষে কোষে সে অক্সিজেন পাঠাতে পারবে না। যদি পাঠাতে পারত — তা হলে রেণু বদলে যেত। রক্তকণাগুলোও বদলাতে থাকত। সারা শরীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমানতালে এগোত। রেণুর মুখখানি দেখতে দেখতে বিশু পরিষ্কার বুঝল, সে আগের চেয়ে কিছু রোগা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কী এক মায়ায় বিশুর মন ভরে গেল। সে আরও জোরে রেণুকে জড়িয়ে ধরল। ধরতে গিয়ে দেখল, আজ যেন রেণু অন্যদিনের চেয়ে কিছু অন্যরকম। তারপর তার চোখে পড়ল, রেণু কাজল টেনেছে চোখে। মাথার চুলও শক্ত করে বাঁধা। অন্য দিনের তুলনায় শাড়িখানি একদম পাটভাঙা। দুই ভ্রূর মাঝখানে শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে তুঁতে রঙের টিপ — গায়ের ব্লাউজও সেই রঙের। চোখেমুখে অনেকদিন পরে যেন এক অন্য জগতের হাসি।

বিশুর ঠোঁট নেমে আসছিল। ঠিক এই সময় রেণু যেন নিজের কাছেই নিজে জানতে চাইল, চাপা গলায় — আমাদের তো একটি বাচ্চা হতে পারে — পারে না? এ কথায় ইলেকট্রিক শক ছিল। বিশু পটাং করে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল, পাগল হয়েছ? এই শরীরে বাচ্চা পেটে নিতে গেলে — তোমাকে হারাতে হবে রেণু। সে আমি পারব না — কিছুতেই পারব না।

নাগো। আমায় হারাতে হবে না। আমি ঠিক পারব।

সে হয় না রেণু।

হয়। তুমি জানো না। আমি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম। তিনি বললেন, সাবধানে রক্ত বদলে বদলে আমি মা হতে পারি।

হ্যাঁ। তাই হও — আর তুমি পট করে মরে যাও — সে কিছুতেই হবে না।

রেণু আর কোনও কথা বলল না। সে বিশুর হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাঁ হাতের তালু দিয়ে নিজের কপাল থেকে টিপটা ঘষে তুলে দিল। তুলতে তুলতে দেখতে পেল, বিশু বিছানায় পড়েই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ছে।

সারা পৃথিবীতে একই সঙ্গে একই সময়ে নানা রকমের মানুষ নানান জায়গায় কথা বলছে, ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে, জ্বরে ভুগছে, হাসছে, ভাবছে। আমরা শুধু এক জায়গার কথা, ভালবাসা, ঝগড়া বা হাসি দেখতে পাই। ভাবনা তো দেখা সম্ভব নয়। আচ্ছা, এমন যদি হত — আমরা

একই সময়ে একই সঙ্গে নানা রকমের মানুষের নানা জায়গার কাণ্ডকারখানা দেখতে পেতাম? তা হলে কেমন হত? এ যেন অনেকটা — একই সিনেমা হলে বসে চারদিকের দেওয়ালে টাঙানো অনেকগুলো পর্দায় একই সঙ্গে অনেকগুলো ছায়াছবি দেখতে পাওয়া। কিন্তু তা তো দেখতে পাওয়া যায় না। তা দেখতে পায় — যদি তেমন চোখ থাকত — আকাশের উড়ন্ত পাখি। উড়ন্ত বিমানের ককপিট থেকে পাইলট — আর অবশ্যই ভগবান।

রজনী সেন রোডের ডানদিকে বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ির আটতলার ঘরে এই একই সময়ে ভারি চেহারার লম্বা চওড়া একজন মানুষ ঠিক এখন টেবিলে ঝুঁকে বসে আছে। হাতে ডটপেন। সামনে, খোলা খাতা। সে খোলা দরজা দিয়ে কলকাতার নিশুতি রাতের আকাশ, উঁচু বাড়ির মাথা — আর দূরে নিচে আলো ঝলমল শুনশান রাস্তাও দেখতে পাচ্ছে।

এখুনি লোকটির কাছাকাছি গেলে দেখতে পাওয়া যাবে — পাজামার ওপর বুকখোলা পাঞ্জাবি গায়ে একজন বছর চল্লিশের মানুষের মুখেচোখে কী ভীষণ অস্থির অস্থির ভাব। টেবিলের নিচে সে খালি পায়ে এক পায়ের নখ দিয়ে আরেক পায়ে চুলকোবার চেষ্টা করছে। তার মানে মশা কামড়াচ্ছে।

পাতলা ঠোঁট, চোখে চশমা। তার পিঠের পেছনের দেওয়ালে র‍্যাকভর্তি বই। র‍্যাকের পাশে আরেক ঘরে যাবার রাস্তায় পর্দা। বোঝা যায় — ওদিকেই কল বাথরুম। তার ডানহাতের দিকে চওড়া খাটে নীলচে মশারির ভেতর যে মেয়েটি অঘোর ঘুমে কাত হয়ে শুয়ে — মাথার চুল একদিকের গাল ঢেকে ফেলেছে — সে নিশ্চয় এই লোকটির বউ। এ কথা এ জন্যে আসছে — তার কারণ, ঘরের জানলার নিচে টিভি-র পাশেই আরেক টেবিলে দু'টি স্কুলব্যাগ আর নানা সাইজের স্কুলের বই। তার মানে এই সংসারী লোকটির ছেলেপিলে আছে — যারা পাশের ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এটি সামনের ঘর হলেও রাতে স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘর। এবার ঘুমন্ত মেয়েটি পাশ ফিরল। মুখ দেখেই বোঝা যায় — ওদের বিয়ে কম করেও বছর পনের আগে হয়েছে। আরও খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে — খাটের দিকের পাশ-দেওয়ালে টাঙানো ছবিতে যে দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে — তারা আজ এই নিশুতি রাতের স্বামী-স্ত্রী। একজন ঘুমিয়ে। অন্যজন ডটপেন হাতে টেবিলে। অথচ ফটোতে ওরা দুজনেই এখন থেকে কত স্লিম কত তরতাজা ছিল।

হঠাৎ লোকটি দেখল — তার ডটপেন কোনও কথা শুনছে না। সাদা কাগজে ছোট ছোট করে লেখা ফুটে উঠল —

কে বলে কবিতা আসে? কিছুতে আসে না।

সে শুধু হাওয়ায় তার দুটো একটা উচ্ছন্ন পালক ছুঁড়ে মারে।

কে বলে কবিতা আসে? কখনও আসে না।

আবার ডটপেন থেমে গেল। মাথার ভেতর একসঙ্গে অনেক কিছু ভিড় করে আসছে। কিছুতেই তা বেছে সাজিয়ে নিতে পারছে না সে। এ কথা মনে হচ্ছে — কারণ, লোকটির ভ্রূ কুঁচকে উঠল। নিচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁটের চাপে মুখের ভেতরে মুছে যাচ্ছে। ডটপেনের পেছনটা একবার মুখে দিয়ে কামড়ে দেখল। বেশ শক্ত।

এ কি? তুমি কখন উঠে গেছ?

ঘুম আসছিল না ইরা।

তাই বলে ফের টেবিলে গিয়ে বসবে? সারাদিন এত ঘোরাঘুরির পর?

ঘুমই আসছে না ইরা।

ক্যাম্পোজ খেয়েছিলে?

হুঁ।

ক'টা?

যেমন খাই। দেড়খানা।

এই করে তোমার শরীর থাকবে? ট্যুর থেকে ফিরে সারা বিকেল শঙ্কুর গ্রামার বই খুঁজেছ দোকানে দোকানে। তারপর সন্ধ্যেবেলা ফিরে নিচের বংশীদার সঙ্গে অতটা হুইস্কি খেলে।

আমি তো বেশি খাইনি। বংশীই খেয়েছে। আমি শুধু কম্প্যানি দিয়েছি। আমি বাড়িতে বসে খেতে পারি না বেশি ইরা। ইচ্ছে করে না খেতে। তা ছাড়া ওই বংশীটার সঙ্গে ব্যারড় ব্যারড় করতে কার ভাল লাগে বলো?

ইরা এগিয়ে এসে আলনা থেকে একটা চাদর এনে লোকটির গায়ে জড়িয়ে দিল। দিয়ে বলল, তবু তো ওইসব লোকের সঙ্গেই তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দাও। খিদে পায়নি তো মাঝরাতে?

না। না। একটুও খিদে পায়নি। আজকাল আমার খেতেও বিশেষ ভাল লাগে না।

শোনো, অভিষেক। আমি, শঙ্কু, চিনি — আমরা তিনটি প্রাণী — আমাদের সবকিছু তোমাকে ঘিরে। তুমি ওদের বাবা। আমার স্বামী। তোমাকে খেতেও হবে — ঘুমোতেও হবে।

হো হো করে হেসে উঠে অভিষেক বসু বলল, আবার জেগেও থাকতে হবে! জেগে থেকে অফিসে যেতে হবে। টাকাও আয় করতে হবে। সেই টাকা খরচ করতে হবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খরচ করা যায় না। সে জন্যেও জেগে থাকতে হবে।

হ্যাঁ। হাসিমুখে বলতে বলতে ইরা ফস করে বলল, কবিতাও লিখতে হবে।

কবিতা আসে না ইরা। আজকাল কবিতা আসতে চায় না। তুমি যে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে উঠে বস — আমার এই বেঁচে থাকা — জেগে থাকা সেই স্বপ্নের চেয়েও আরও বেশি স্বপ্নের মনে হয় আমার।

ইরার দুই চোখ এ কথায় তার স্বামীর মুখে তাকিয়ে স্থির হয়ে এল। সে জানে অভিষেক বিয়ের আগে থেকেই কবিতার ভেতরে ভেতরে শাবল দিয়ে কী যেন খুঁজে চলেছে — খুঁড়ে চলেছে। একদম নিচের মাটির খোঁজে। যেন অন্ধকারে হাতড়েই চলেছে। শান্ত গলায় সে তার স্বামীর কাছে জানতে চাইল, তুমি লেখো কেন?

মরতে চাই না। বেঁচে থাকতে চাই। তাই সে জন্যেই লিখি।

চলো না একদিন আবার রুক্মিণী মায়ের কাছে। দেখবে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তোমার মৃত্যুভয় কেটে যাবে। রুক্মিণী মায়ের কথা শুনলে — তাঁর চোখে তাকালে তোমার ভেতরটা শান্ত হয়ে আসবে। মৃত্যুভয় বলে আর কিছু থাকবে না। তোমার যে-লেখা পড়ে — যে-কবিতা শুনে আমরা গোড়ায় কিছু বুঝি না — ধরতে পারি না — রুক্মিণী মায়ের মুখের কথা শুনলে প্রথম প্রথম সেরকমই মনে হবে। তারপর একদিন বুঝতে পারবে — রুক্মিণী মা তোমার বেঁচে থাকাটা কত আনন্দের করে তুলেছেন।

অভিষেক অস্থির গলায় বলে উঠল, হয়ত তিনি কবিতাই বলেন তোমাকে — তোমাদের। কিন্তু ইরা—

আর কিন্তু নয়। শুয়ে পড়ো। আমি তো এক গ্লাস জল খেয়েই ফের ঘুমোবো। সেই সকালে

উঠেই চিনির টিফিন বানাতে হবে। চিনি সাঁতার শিখেই ফিরে এসে তখন তখনই কিছু খেতে চায়।

খানিকক্ষণের ভেতর ইরা ফের ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই। সে শুয়ে শুয়েই দেখল —

অভিষেক ডটপেন হাতে অন্ধকার ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। গায়ে জড়িয়ে দেওয়া চাদর মেঝেতে লুটোচ্ছে। বিয়ের সময় অভিষেক অনেক ছিপছিপে ছিল। তখন জানতাম না — শঙ্কু বা চিনি আমার জীবনে আসবে। তখন ছিল শুধুই অভিষেক। অভিষেক যদি একবার রুক্মিণী মায়ের কাছে যেত আমার সঙ্গে। ও তা হলে ভেতরে ভেতরে শান্ত হয়ে উঠত। আমি এখন কোনও অবস্থাতেই ডরাই না। রুক্মিণী মা আমাকে ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। আমি যোগে-ক্রিয়ায় এই পৃথিবীর সঙ্গে সব সময় এক হয়ে যাই। দুলি না। ভাঙি না। এক হয়ে থাকি। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই ব্রহ্ম। একবার ওঁ যদি সেভাবে বলতে পারি তো সেই নাদ ব্রহ্মে পৌঁছে যাবই।

অভিষেক বসু অন্ধকার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে নিশুতি রাতের কলকাতাকে অনেকখানি একসঙ্গে দেখতে পেল। এই যে ঘুমন্ত কলকাতা — এটাই আসল? না, সারাদিনের জেগে-থাকা জটপাকানো হইচইয়ের কলকাতা আসল? আমার তো এখন এই আটতলা থেকে ওই ঘুমন্ত কলকাতার নরম বুকের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কারণ, এটাই আসল কলকাতা। জেগে-থাকা কলকাতার চেয়ে আলো ঝলমল ঘুমন্ত কলকাতাকে আমার বেশি বেশি আসল লাগে। এখানে এখন আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। প্রতিটি মানুষের তার নিজের ইচ্ছেমত কাজ করার — নিজের নিজের পাগলামিতে অধিকার আছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আসল বিপ্লব। কে বলেছে — ভুল আসলে ভুল? হোক তা ভুল। তাতেই আমি বিশ্বাসী। আমি জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানেই বেশি বিশ্বাস রাখি। এলোমেলো হলে আমি নিজেকে চিনতে পারি। বুঝতে পারি।

হঠাৎ তীরের মতই কয়েকটি কথা অভিষেকের মাথায় এসে বিঁধে গেল। সে সোজা টেবিলে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল। বসেই লিখতে লাগল —

কে বলে কবিতা আসে? কখনও আসে না।
হয়ত হঠাৎ কোনও দুর্জ্ঞেয় দেশের ডাকটিকিট
পাঠায় তোমাকে রামধনু-রঙ খামে।
কে বলে কবিতা আসে? কখনও আসে না।
শব্দের জঞ্জালে তুমি খোঁজো রুগ্ন হাজামজা
অনুভূতিগুলি
জলের ভেতরে খোঁজো অন্য জল, ভর দুপুরে খুঁজে মরো
ভোরের আকাশ,
সমুদ্রকিনারে খোঁজো মৎস্যকন্যা,
নিজের নারীতে খোঁজো নদী —

বিছানায় শুয়ে শুয়েই ইরা দেখতে পেল — অভিষেক থেমে পড়েছে। সে জানে, এখন অনেকক্ষণ অভিষেকের ডটপেন থেমে থাকবে। এই অভিষেকের জন্যে ইরার ভেতরে খুব গোপনে একটা গর্ব কাজ করে। যখন লোকে টাকা, দাপট, দখল-টখল নিয়ে কথা বলে — তখন এই মানুষটা শেষরাতে দেখা স্বপ্নটার রঙ নীল? না, লালচে ছিল? — তাই নিয়ে মাথা

ঘামায়। কবিতাকে নিয়ে — কবিতার ছন্দ, পচে যাওয়া শব্দকে কীভাবে বাতিল করা যায় — তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে একদিন এক কাপ চা জল ভেবে টবের নয়নতারায় ঢেলে দিয়েছিল অভিষেক।

ওরই মুখে শুনেছে ইরা — সালভাদর দালি নামে একজন বড় পেইন্টার তার ছেলেবেলায় বড় এক থোকা চেরিফল আঁকতে বসে পাশেই ঘুরন্ত উইন্ডমিলের আওয়াজের তালে তালে ক্যানভাসে রঙ চাপিয়ে ছিলেন। বোঁটা আঁকা ভুলে যাওয়ায় পাশে রাখা চেরিগুলো খেতে খেতে দালি তাদের বোঁটা ছবির চেরিতে জায়গামত আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছিলেন। দালি কোন্ দেশের সাহেব তা জানে না ইরা।

হঠাৎ ইরা পটাং করে উঠে বসল বিছানায় — এই শোনো। বাবা মাকে একখানা অদ্ভুত চিঠি লিখেছে—

৫

ভোরবেলা কলকাতার টেলিফোনের তার দিয়ে দৈনিক 'এখন'-এর সম্পাদক খানিকক্ষণ আগুন ঝরালেন। খুব শান্ত, চাপা গলায়। তাঁর প্রতিটি কথা সলিড পাথর। ফোনের ওপাশে যার কানে গিয়ে পড়ল — সে বুঝল, এক একটা সিসে গুলি সিধে কানে ঢুকে যাচ্ছে।

এখন-এর সম্পাদক গোড়াতেই ফোন তুলে ব্যুরো চিফ পরাশর মালাকারকে ধরলেন। কথাবার্তার নমুনা অনেকটা এরকম—

কাগজ দেখলেন?

আমাদের বিটে হকার একটু দেরিতে আসে।

কোনও কাগজ পাননি এখনও?

না। অন্য সব কাগজ এসে গেছে। শুধু 'এখন' দেরিতে আসে।

আমি এখন-এর কথা বলিনি। 'প্রত্যুষ' দেখুন। পয়লা পাতায় আটের কলমে টপ হেডিং। নিরসা খনির যারা মারা গেল — তাদের আত্মীয়স্বজন — মৃত্যু নিয়ে স্টোরি। আমাদের যায়নি কেন? আমি জানতে চাই যায়নি কেন? রজত পালিতের স্টোরি ধরানো হয়নি কেন? ছবির জন্যে বিশু ঘোষ সঙ্গে ছিল। ছবি সমেত রজত পালিতের স্টোরি যায়নি কেন?

পরাশর মালাকার এখন-এর সম্পাদকের দিক থেকে যতবড় গোলাই দাগা হোক না কেন — অবলীলায় সে সে-সব নিতে পারে। হেসে বলল, ছবি পেয়েছি— কিন্তু স্টোরি পাইনি।

কেন? অফিসে হারাল?

না। রজতবাবু সেই যে নিরসা গেলেন—আর ফেরেননি। লেখাও পাঠাননি।

মানে?

হ্যাঁ। ফোটোগ্রাফার বিশু ফিরে এসেছে। ছবিও দিয়েছে—। বিশুর হাত দিয়ে অপিসের টাকাও ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন রজতবাবু।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। রজতবাবুর বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হয়েছে?

ওঁর বাড়ি থেকে মিসেস পালিতই ক'দিন আগে অফিসে ফোন করেছিলেন। সেখানেও

ফেরেননি।

হোয়াট? আজই বিশুকে সঙ্গে দিয়ে একজন রিপোর্টার পাঠানো হোক। জলজ্যান্ত লোকটা উবে গেল নাকি?— বলতে বলতে সুধীন ঘোষাল ফোন নামিয়ে রাখলেন। 'এখন' যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল তখন সুধীনকে সেই মরা ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল। এই ক'বছরে সেই মরা ঘোড়া সুধীনের হাতে পড়ে টগবগানো আরবি ঘোড়া। তিনি জানেন, 'এখন' দাঁড়িয়ে আছে লেখার জোরে। আর সেই লেখাগুলোকে একমুখো করতে— মজাদার, রঙিন করে তুলতে সুধীন যাকেই যেখানে পাঠান— পাঠাবার আগে তাকে পই পই করে ব্রিফ করেন— লেখাটা কোন ধাঁচে লিখতে হবে। তাই রোজকার ভোরের 'এখন' সারা গায়ে সুধীন ঘোষালের হাতের ছাপ নিয়ে বেরয়। তিনি ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময়— কলেজে ঢুকেও রজত পালিতের লেখা পড়েছেন। সেই লোকটি— তার কাগজ বন্ধ হওয়ায়— সুধীনের ডাকে এখন-এ এসে জয়েন করেছেন। চাকরি ছিল না বলে একটু 'শেকি' মত হয়ে গিয়েছিলেন। বয়স হয়েছে। কিন্তু রজতের হাতের কপি আজও মজাদার— পড়তে সুখ— মজিয়ে ছাড়ে— এ কথা ভাল করেই জানেন সুধীন ঘোষাল। দিব্যি এখানে ওখানে পাঠিয়ে রজত পালিতের কাছ থেকে ভাল স্টোরি পেয়েছেন সুধীন ঘোষাল। এমন মানুষটা নিরসায় গিয়ে উবে গেল?

সকালের সব কাগজ দেখেন সুধীন ঘোষাল। দেখে বুঝতে পারেন— 'এখন' কোথায় জিতল। 'এখন' কোথায় হারল। সেইমত পরদিন ভোরের কাগজের যুদ্ধটা তিনি সাজাতে বসেন। সারাদিন ধরে— সেই নিশুতি রাত অবধি এই যুদ্ধের আয়োজন চলে।

ইদানীং রজত পালিত প্রায়ই সুধীনকে একটি কথা বলতেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। দিন না আমায় একটা ডেজিগনেশন। আমি এখন-এ কী কাজ করি কাউকে বলতে পারি না। আমি কি পোস্টে আছি?

সুধীন হাসতে হাসতে বলেছেন, সে একটা কিছু দেওয়া যাবে।

ক'দিন আগেও রজত পালিত ওই কথা বললে— তিনি বলেছিলেন— আপনার আবার ডেজিগনেশনের কী দরকার। রজত পালিত নামটাই তো একটা ডেজিগনেশন।

একটু একটু করে এই লোকটির মুখ, মাথা— বিষণ্ণ হাসি— সবই সুধীন ঘোষালের মনে ভেসে উঠছে। পাম অ্যাভিনিউর দশতলার ফ্ল্যাটে সকালবেলা শীতের শেষের সূর্য একফালি রোদ পাঠিয়ে সুধীন ঘোষালের পিঠ—গা চিড়বিড়িয়ে দিল। তিনি ভোরের কাগজগুলো নিয়ে বসেছিলেন। হাতে লাল পেন্সিল। সব ফেলে তিনি ঝুলবারান্দার রেলিংয়ে এসে দাঁড়ালেন। ষাট পেরিয়ে যাওয়া একজন সাবেক কাগুজে লোক লেখায়— চিন্তায় সবসময় টাটকা— তরতাজা থাকতে— থাকবার জন্যে— লেখার ব্যাপারটা— লেখার শব্দ বাছাইয়ে ভীষণ সাবধানী ছিলেন! কপি লেখার ব্যাপারে খুবই যত্ন নিতেন রজত পালিত। বেশি রাতে বাড়ি ফিরেও প্রেসে ফোন করতেন— আমার হাতের লেখা পড়তে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? তার মানে ছাপার সময় কোনও ভুল থাকল না তো।

সুধীন ঘোষালের মনে পড়ল, 'এখন' কাগজে জয়েন করে রজত পালিত লেখা জমা দিয়ে বসে থাকতেন। শেষে সুধীনকে বলতেন, দেখেছেন? দেখে দিয়েছেন?

সুধীন একদিন বলেছিলেন, কখন প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি।

দেখে দিয়েছিলেন আপনি?

আপনার কপি আবার কি দেখব? পেয়েই প্রেসে দিয়েছি। ছাপা হলে কাল সকালের কাগজে

একবারে পড়ব।

সুধীন ঘোষাল লক্ষ্য করেছিলেন, এ কথায় মানুষটির মুখখানি পলকের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যেন কনফিডেন্স ফিরে পেয়েছিলেন রজত পালিত।

সেই মানুষ নিরসা খনিতে কভার করতে গিয়ে উবে গেল? আশ্চর্য!

পৃথিবী তৈরি হওয়ার সময়টা অনেকদিন আগেকার কথা। তার অনেক—অনেক পরে অজয় আর দামোদরের জন্ম। এই দুই নদীর মাঝের বিশাল বিশাল প্রান্তরের নিচে কয়লা।

নিরসা কোলিয়ারিতে যে লিস্ট টাঙিয়ে দিয়েছে— তার ওপরের পয়লা নামটি— রামটহল দুসাদ। রজত নামটা পড়েই খোঁজ খবর করে নিরসা খনির তের নম্বর ধাওড়ায় দুসাদ কোয়ার্টারে এসেছে। খানিক আগে বিশু কলকাতায় চলে গেল। এখন যতই রাত বাড়ছে— ততই ভিড় পাতলা হচ্ছে। সেই নার্স মেয়েটি একজন হাট্টাকাট্টা পুরুষকে নিয়ে ফিরল। লোকটি সম্ভবত মেল নার্স। সে পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে জানতে চাইল, রামটহল দুসাদ কি কৌন হ্যায়—?

বারান্দা প্রায় ফাঁকা। রজত এগিয়ে গিয়ে ছাপা শাড়ির ঘোমটা টানা সেই মহিলাকে বলল, আপকি নাম বাতাইয়ে—

মহিলা এগিয়ে এসে কোনওরকমে বলল, মোতিয়া দুসাদ।

মরিজকো হাসপাতাল লেনা পড়েগা।

এ কথায় মোতিয়া দুসাদ খানিক ঘাবড়ে গেল।

তার পর ঘরের ভেতর তার ছেলের বউ 'চামেলীর' দিকে তাকাল। চামেলীর জ্ঞান ফেরেনি। খাটের বাইরে একখানি হাত ঝুলে আছে। মোতিয়ার চোখে জল এসে গেল। সে এবার রজত পালিতের মুখে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

এখন বেশ রাত। পুলিসের লরি দু'বার সামনের রাস্তা দিয়ে নিরসা খনির দিকে গেল। শীতমাখানো ফিকে জ্যোৎস্নায় একটা-দু'টো সাদা অ্যামবাসাডর খনি থেকে বেরিয়ে ভুস করে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। গাড়ির ভেতরের লোকজনের কথাবার্তা অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল।

মোতিয়া দুসাদ তার দিকে এমন করেই তাকিয়ে— যে তাকিয়ে থাকার সামনে রজত পালিত সিধে চোখে তাকাতে পারছে না। রামটহলের লাশ খনি-পাতাল থেকে এখনও উঠেছে কিনা জানে না রজত। হয়ত রামটহলের বাবার সঙ্গে বিয়ের পরপরই মোতিয়া সিধে এই তের নম্বর ধাওড়ায় এসে উঠেছিল। এখানেই রামটহলের জন্ম। বিয়ে। এখানেই মোতিয়া দুসাদের বিধবা হওয়া। মহিলা বোধহয় তাকে খনির লোক— নয়ত ইউনিয়নের লোক ভেবে থাকবে। আসলে ইউনিয়নের লোকজনকে সে খনি অফিসে ভিড় করে থাকতে দেখেছে। ওদের একদল নাকি এখন শীতলপুর গেস্টহাউসে কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান সেই ঝামশায়ের মুখোমুখি টেবিলে বসেছে। এসব বাতাসের খবর। কিংবা যেসব খবর বাতাসে ভাসছে— তারই একটি এই খবরটি।

রজত পালিত কিছু এগিয়ে একবার চামেলীর মুখে তাকাল। ঘরের আলোয় মুখখানি একদম মরে আছে। এই মেয়েটিই খানিক আগে তার হাত জাপটে ধরে রীতিমত বাংলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল— বাবা। বাবাগো।

চামেলীর তো বাংলা জানার কথা নয়। বাংলা মুলুকে থেকে থেকে কি বাংলা এসে গেল

মুখে কিংবা এই ধাওড়ায় বেশ কিছু বাঙালি থাকে হয়ত। তাদের সঙ্গে মিশে মিশে ঘোরের ভেতর বাঙালি বুলি উঠে এসেছে চামেলীর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে রজতের এ কথাও মনে হল— বাবা কথাটা তো সব বুলিতেই আছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে 'গো' কথাটা জুড়ে গেল কীকরে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না রজত। মোতিয়া দুসাদের চোখের সিধে-তাকানোর সামনে তার সব ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে। হিন্দিতে তো অনেকেই বলে থাকে— বাবা গ। মা গ।

রজত পালিত মোতিয়া দুসাদকে পরিষ্কার হিন্দিতে বলে ফেলল, কোই ফিকর নেহি। ম্যায় চামেলীকে সাথ অসপাতাল যাউঙ্গা—

অল্প আলোয় দুসাদ কোয়ার্টারে মানুষজনের ছায়া ভূতের মত লম্বা হয়ে পড়েছে। উঠোন ছাড়িয়ে সরু-ফিতে পিচ রাস্তা অবধি। তার ভেতর মোতিয়া দুসাদ চোখ নামিয়ে ফের রজতের মুখে তাকাল। মোতিয়া দুসাদ যেন তার ওপর নির্ভর করে থাকতে পারছে। কেননা, এখন এখানে বোধহয় অন্য সব ঘরের মরদদের কেউ নেই। সবাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মাথা নামিয়ে মোতিয়া কোনও মতে বলল, সাকতোড়িয়া সেন্ট্রাল অসপাতাল— এর খানিক বাদে চামেলীকে নিয়ে মারুতি জিপসি অ্যাম্বুলেন্সটা যখন সাকতোড়িয়ার পথে পাড়ি দিতে লাগল— তখন এই পুঁচকে— পলকা গাড়িটার ভেতর স্ট্রেচারে ঘুমন্ত চামেলীর পাশে হাত-পা কুঁচকে বসে থাকা রজত পালিত নিজেই নিজের কাজে রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

পথ যেন আর শেষ হয় না। অন্ধকার রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স পথ হারিয়ে ফেলেনি তো? নার্স মেয়েটি ড্রাইভারের পাশে। মেল নার্সটি অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরেই স্যালাইনের বোতল ঝুলিয়ে চামেলীর হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে ড্রিপ দেওয়া চালু করে দিল। অন্ধকারে মাঝে মাঝে দু'পাশে বসতি, আলোর আভাস।

মেল নার্স লোকটি চোখ দিয়ে চামেলীকে দেখিয়ে ঠেট হিন্দিতে জানতে চাইল, মরিজ কৌন হোতি হ্যায় আপকি?

রজত পালিত বুঝল, তার চেহারা— পোশাক-আশাকের সঙ্গে স্ট্রেচারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা চামেলী বা নিরসা খনির তের নম্বর ধাওড়ার বাসিন্দাদের চেহারা, হাবেভাবে কোনও মিল নেই। তাই মেল নার্সের মনে প্রশ্ন জেগেছে।

রজতের মুখে এসে গেল, মেরা বেটি।

আপনা বেটি?

বেটিকা বরাবর। — বলে রজত যেন মেল নার্সকে খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করিয়ে দিতে পারল। যদিও সে বুঝতে পারছে— তার এ কথায় লোকটির মনে যেসব জিজ্ঞাসা জেগেছে, তা আদৌ মেটেনি। সাকতোড়িয়ায় সেন্ট্রাল হাসপাতালে পৌঁছতে-পৌঁছতে রজতের হাতঘড়িতে রাত পৌনে বারোটা হয়ে গেল। দোতলা হাসপাতাল-বাড়ির ঢাকা বারান্দা দেখেই বোঝা যায়— এ-বাড়ি অনেকদিনের। কয়লাকে সরকার হাতে নেবার অনেক আগের। তার মানে, সাহেবদের সেই বেঙ্গল কোল কোম্পানির আমলের। চামেলীকে এমারজেন্সিতে নিয়ে যাবার পর রজত পালিত প্রথম বুঝল, তার খিদে পেয়েছে।

সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। শ্যু-জুতোর ভেতর পায়ে ব্যথা ধরেছে। শুধু সোয়েটারে শীত আটকাচ্ছে না। এ আমি কী করলাম? কেনই বা বিশুকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি থেকে গেলাম? আমার স্টোরির জন্যে যে 'এখন' বসে থাকবে। তাদের টাকায় আমি এখানে এসেছি। 'এখন' থেকে মাস মাইনে নিয়ে আমি বাড়িভাড়া দিই। মুদি শোধ করি। ইলেকট্রিক বিল দিই। আর

সেই 'এখন-কে খবর না পাঠিয়ে' তাদের হয়ে সারা নিরসা খনির মৃত্যুর চেহারাটা না লিখে, আমি দিব্যি অজ্ঞান চামেলীর সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে সাকতোড়িয়া হাসপাতালে চলে এসেছি!

খানিকক্ষণের জন্যে রজত পালিত দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ আমি কী করেছি? বিশুকে বলেছি— লেখার জন্যে— মৃত্যু নিরসা খনিতে কতটা বড়— তা বুঝে উঠতে আমি থেকে যাচ্ছি। কিন্তু আমি কি মৃত্যুর ছায়ার পেছন পেছন ছুটছি?— যাতে কিনা মৃত্যুর সাইজটার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়? বাইরের বেঞ্চে আর বসা যাচ্ছে না। নিশ্চয় এখানে কোনও ক্যান্টিন আছে। থাকলেও এত রাতে কে খাবার দেবে! একবার এমারজেন্সিতে ঢুঁ-মারল রজত। কোনও লাভ হল না। চামেলীকে ভেতরে ওয়ার্ডে নিয়ে গেছে। ফিমেল ওয়ার্ডে। কাল ভোরের আগে কোনও খবর পাওয়া যাবে না। ভোর সাতটায় ডিউটি বদল হয়। তখন জানতে সুবিধে হবে। এমারজেন্সির ডাক্তার ছেলেটি তাই বলল।

রজত এসে এমারজেন্সির বাইরের বেঞ্চে বসল। বসে জুতো খুলে পা ছড়িয়ে দিল। দিয়ে দেখল— হাসপাতালের আলোর খুঁটির বাইরেই বিরাট অন্ধকার দাঁড়িয়ে। ওর ভেতর আমার অজানা জগৎ ডুবে আছে। সে বুঝেই পাচ্ছে না— সে কেন এখানে চলে আসতে গেল। এ ভাবে আমি এসেছি বলে বিশুর সারাদিনের দৌড়োদৌড়ি— ছবিতোলা সবই মাঠে মারা গেল। লেখা না পৌঁছলে বিশুর ছবি ছাপা হবে কী করে?

সারা রানীগঞ্জ বেল্টে একশর ওপর খনি। তাদের সব রোগীই কি এখানে আসে?

হাসপাতাল বাড়িটা ধ্যাধ্ধেড়ে লম্বা। মূর্ছার ভেতর ঘোরের মাথায় চামেলী নামে অল্পবয়সী একটি বউ বাবা— বাবাগো— বলে হাত চেপে ধরায় আমি এই অজানা জায়গায় থেকে গেছি।

রাত যতই বাড়ছে কয়লারপাথুরে-শীত ততই হাসপাতাল বাড়িটার ভেতর ঢুকে রজত পালিতকে কামড়াচ্ছে। শীতের এ কামড় সহ্য করা যায় না। সেই সঙ্গে সারাদিন প্রায় না-খাওয়া দশা। এর সঙ্গে এসে জুটল রানীগঞ্জের মশা। রজত পালিত কোনওদিকে না তাকিয়ে সিধে এমারজেন্সিতে ঢুকে পড়ল।

ফাঁকা এমারজেন্সি। রোগী এসে শুয়ে পড়ার গদিখাটে দিব্যি পা লম্বা করে দিয়ে শুয়ে পড়ল রজত পালিত। খিদে আর ঘুমে তখন তার শরীরে আর কিছু নেই। চারদিকে ফটফট করছে ইলেকট্রিক আলো। তার ভেতর রজত পালিতের চোখ বুজে আসতেই সে হারিয়ে গেল।

ঘুম, খিদে, দুশ্চিন্তা এক এক সময় মানুষের সামনে শরীর নিয়ে দেখা দেয়। তার ভেতর তলিয়ে যেতে যেতে রজত পালিত পরিষ্কার দেখল, একটি বছর দশেকের মেয়ে— মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল— রজতের খুব চেনা একটা রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। ইজেরের ওপর সাদা টেপফ্রক।

এটা ঠিক রাস্তা নয়। মাটির চওড়া খালপাড়। পাশেই খাল। খালের ওপারে বাতিল ইটখোলার মাঠ— তাতে ইট খোলার ভেঙে-পড়া চিমনি মাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে— তারপরই রেল লাইন। আপ লোকাল ট্রেন শিয়ালদা যাচ্ছে। রজত চিনতে পারল। দক্ষিণ পুরন্দরপুর। ওখান থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় চাকরি করতে আসি। লোকাল ট্রেনে শেয়ালদা পৌঁনে এক ঘণ্টা।

বাবা— বাবা—

ছুটতে ছুটতে আসছে ইরা। পড়ে যাবি।

ইরা এসে রজতকে জড়িয়ে ধরল। কী এনেছ দেখি?

কলকাতা থেকে ফেরার পথে রোজ ইরার জন্যে কিছু না কিছু আনতেই হবে। সে যা-'ই হোক। একটা লাল-নীল পেন্সিল হলেও আনা চাই।

বছর কয়েক আগেও ইরা ছুটে এলে দু'হাতে উঁচু করে লুফে নিয়ে কোলে তুলেছি। রজত বুঝল, এখন আর সে উপায় নেই। ইরা বড় হয়ে যাচ্ছে। লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ভারি হয়ে যাচ্ছে।

রজতের পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ইরা। দেখি—

ও পকেটে নেই রে পাগল!

তবে কোথায়?— বলে খালপাড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল গোঁজ হয়ে। এখন কি বিকেল? না, সকালেবেলা? আমি কি কলকাতায় গিয়েই ফিরে এসেছি? তাহলে তো দুপুর হবে। আলোর চেহারা দেখে সময়টা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না রজত।

হাতঘড়িটা সারাতে দিয়ে আনা হয়নি।

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল ইরা। হাত বাড়িয়ে রজতের বুক পকেটটা প্রায় ধরে ধরে। কোন পকেটে বাবা? দিচ্ছিরে দিচ্ছি। দাঁড়া। আর একটু হলে পকেট ছিঁড়ে যেত ইরা—

না। ছিঁড়বে না। দাও না বাবা— কী এনেছ দেখি। — বলতে বলতে ইরা, চলন্ত রজতের পাশাপাশি লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে লাগল।

খালপাড়ের ওমাথা অনেক দূরে। সেখানে এই খাল আর একটা খালে গিয়ে পড়েছে। আরেক দিকে স্টেশন থেকে আসা বাসরাস্তার পুলের নিচে অবধি চলে গেছে এ-খাল। খালপাড়ের আর একদিকে ধানক্ষেত। কলাবাগান। ফাঁকে ফাঁকে বসতবাড়ি। বাবলা গাছ। শিরীষ গাছ।

দেখাচ্ছিরে দেখাচ্ছি। তার আগে বল— একবার আমার কোলে উঠবি।

লাফাতে-থাকা ইরা একমাথা কোঁকড়া চুলে এক ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মুখ ভর্তি লজ্জা। সে হয় না বাবা। আমি যে বড় হয়ে যাচ্ছি।

তাতে কি? আগের মত একবার আমার কোলে উঠবি?

তুমি পারবে না বাবা।

খুব পারব। উঠে দ্যাখ্—

উহুঁ, তা হয় না বাবা। আমি যে অনেক ভারি হয়ে গেছি। কী এমন ভারি হয়ে গেছিস? দেখি। নিজের বাবার কোলে উঠতে পারবি না—

রজত পালিত ইরাকে কোলে তুলে নিতে গেল। ইরা পিছলে নেমে গিয়ে সরে দাঁড়াল। দেখাও না বাবা, কী এনেছ আজ আমার জন্যে—

রজত কোনও কথা না বলে হন হন করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। আর তাকে ধরার জন্যে ইরা দু'হাতে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতে গেল— যেমন আর কি যে কোনও বাচ্চা মেয়ে করে থাকে। ইরা যতবার রজতকে কোমরের কাছে জড়িয়ে ধরতে যায়— ততবারই রজত পিছনে সরে যায়। এইভাবে খালপাড় থেকে নেমে নয়নতারার টবগুলো পেরিয়ে রজত পালিত তার বাড়ির বারান্দায় — উঠতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে ইরাও।

দেখি বাবা —

দেখাচ্ছি। একটা মাদুর পেতে দে বারান্দায়। আর এক কাপ জল আনবি। সঙ্গে একখানা

রাফ খাতা চাই—

মুখের কথা থামাতেই মাথার ঝাকড়া চুল ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে সব এনে হাজির করল ইরা। ঢলো ঢলো একখানি মুখ। তাতে দুটি বড় বড় কালো চোখ। রজত মনে মনে বলল, আমার মেয়ে।

ইরা মুহূর্তে মাদুর বিছিয়ে তাতে জলের কাপ রাখল। তারপর অঙ্কের বড় রাফ খাতাখানা রেখে বলল, এবার? এবার বাবা?

দাঁড়া। দেখাচ্ছি। জামাকাপড় ছাড়ি আগে।

না বাবা। আগে দেখাও কী এনেছ।

তবে দ্যাখ। — বলে মাদুরে বসে পড়ল রজত। পাশে বসল ইরা। রজত বুক পকেট থেকে কয়েকখানা কাগজ বের করে বলল, এই দ্যাখ। জলছবি—

সে কী জিনিস বাবা?

দ্যাখনা। এই কাগজখানা কাপের জলে ভেজালাম তো—

হুঁ।

এবার ভিজে কাগজখানা খাতার পাতায় সেঁটে নিয়েই তুলে নিচ্ছি। বাড়ির সামনের মাঠে কয়েকটি গরু মাথা নামিয়ে মন দিয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। ইরা রজতের হাতের দিকে তাকিয়ে। কথামত রজত পালিত জলছবির ভিজে কাগজখানি কাপ থেকে তুলে রাফ খাতার পাতায় সেঁটে দিয়েই তুলতে লাগল।

ইরা প্রায় দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। তার দুই চোখ খাতায়। ভিজে কাগজখানি তুলে নিতেই খাতার পাতায় যে মুখের জলছবি একটু একটু করে ফুটে উঠতে লাগল— তা দেখে রজত পালিত চেঁচিয়ে উঠল, চামেলী-ই-ই—

সারা শরীর কাঁপছে রজতের। সে রোগী শোয়াবার এমারজেন্সির গদি-খাটে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। ঘরে কেউ নেই। দূরে খোলা দরজায় দেখতে পেল, একজন নার্স একটি বিকার হাতে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পাশের পর্দা সরিয়ে ছোট একটা ঘরে ঢুকছে।

বাইরে বারান্দার নিচেই রাত ফিকে হয়ে গিয়ে পাতলা অন্ধকার। পুলিসের একটা কালো ভ্যান এসে দাঁড়াল। বিশাল মাইনিং এলাকায় দাদাগিরি, গুণ্ডাবাজি লেগেই থাকে। কোনও জখম ক্রিমিনাল নিয়ে পুলিস ভ্যান এল বোধহয়।

আধখেঁচড়া ঘুমে সারাটা শরীরে যেন আগাগোড়া ব্যথা। খিদের বোধ আর নেই এখন রজতের। ন'দশ বছরের ইরার মুখখানি চোখে ভাসছে তার। ঢলো ঢলো বড় বড় দুই কালো চোখ। রজনী সেন রোডের সামনে বারোতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে সে এখন শঙ্কুর মা। চিনির মা। অভিষেকের বউ। আর কোনওদিন একমাথা ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে খালপাড় দিয়ে আমার দিকে ছুটে আসবে না। আর কোনওদিন বলবে না— বাবা দেখি— কী এনেছ আজ আমার জন্যে? এক নার্স বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, চামেলী দুসাদকি ঘরোয়ালা কোই হ্যায়? রজত কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ক্যায়সি হ্যায় চামেলী?

নার্স অবাক হয়ে রজত পালিতের ভদ্রলোক ক্লাসের চেহারার দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, আভি আচ্ছি হ্যায়। উনকি এক চাদ্দর চাহিয়ে। বহুত জাড়া পড় গিয়া—

চাদ্দর?

হাঁ হাঁ চাদ্দর। আভি তো রাত বাকি হ্যায়। দিন আয়েগা— দুকান খুলেগি তব এক চাদ্দর খরিদনা পড়েগা আপকো। ইতনি ঠাণ্ডা মে বে-চাদ্দর ক্যায়সে ঘর লে যায়েঙ্গে?

ঘর যায়েগি চামেলী? ক্যা ছুট্টি হো যায়েগা?

হ্যাঁ। ডাগদর সাহেব আয়েগা। তব ছুট্টি লিখ দেগা। — বলতে বলতে নার্স মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। ভাবভঙ্গি অনেকটা যেন চল্লিশ বছর বয়সের এক বালিকার মত। কাল রাতে যে নার্স চামেলীকে অ্যাম্বুলেন্স করে এখানে এনেছিল, তার চেয়ে এই নার্সটির কথাবার্তা বেশ ভাল। কোনও ঝামটা নেই গলায়।

গদি-খাট থেকে নেমে রজত পালিত বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখানে এমারজেন্সির রোগীর খাটে তাকে বসে থাকতে দেখে নার্স কোনওরকম বকাবকি করেনি। কলকাতায় হলে?

হঠাৎ নার্স ফের রজতের সামনে এসে দাঁড়াল। রজত তো তাকে দেখে তটস্থ।

মরিজ কো আপ কৌন হোতা হ্যায় জি?

ম্যায় উনকি বাপ বরাবর। চামেলী মেরা বেটিকা বরাবর। বেটি য্যায়সি—

সবে ভোর হচ্ছে। সারা হাসপাতালের চেহারাটা এবার কুয়াশা আর অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে পড়ল। হাসপাতালের হাতায় বিরাট এক হরিতকী গাছের ঝাঁকড়া ডালপালা থেকে ছোট ছোট পাখি যেন ঝরে পড়ছে। পাখিরা গাছটার পাতায়-পাতায় যেন থোকা-থোকা-ফুল হয়ে এতক্ষণ ফুটে ছিল। এবার তারা কিচিরমিচির — কুঁই কুঁই— টিং— নানারকম শব্দ করে ঝর্ণা হয়ে নিচে ঝরে পড়ছে। গাছতলায়। শুকনো লালচে ধুলোয়। সেখানে পুটিপুটি খেয়ে ওরা দিগ্বিদিকে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। যেখানটায় লাল হয়ে আলো দেখা দিল এইমাত্র।

এমারজেন্সির সকালের ডাক্তারসাহেবের এসে পৌঁছতে এখনও দেরি আছে নিশ্চয়। টেবিলে একটি মোটা সাদা প্যাড। কলমদানিতে অনেকগুলো ডটপেন। চেয়ারটা ফাঁকা।

ওয়ার্ড কে ওয়ার্ড ধোয়াধুয়ি শুরু হয়ে গেছে। জল ঢালার শব্দ। ঝাঁটা। বালতি টানল কে। একটা ফোন বেজে উঠল।

রজত পালিত হঠাৎ ফাঁকা চেয়ারটায় বসে পড়েই সাদা প্যাডখানি টেনে নিল। প্যাডের ওপর ছাপা লেখা লাইনদুটি ভাল করে কেটে দিল ডটপেন দিয়ে। তারপর লিখল—

প্রিয় ছায়া,

আমি অনেক ভেবেচিন্তে আজ বুঝতে পারছি— আমার আর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তোমার সঙ্গে আমি চৌত্রিশ বছর একটানা সংসার করেছি। সেই আমার সাতাশ-আঠাশ বছর বয়স থেকে আমরা দু'জনে একসঙ্গে আছি। আমি আমার সাধ্যমত সব করেছি। এবার আমি আমার নিজের মত করে জীবন করতে চাই। সে জীবনের সবটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। সবে তা ফুটে উঠছে। আগে ভাবতাম আমাকে না হলে তোমাদের চলবে না। এখন বুঝি— ব্যাপারটা একদম তা নয়। আমাদের মেয়ে ইরা। আর সেই ছোটটি নেই। সে এখন তার নিজের জগৎ গড়ে নিয়েছে...

৬

গরম পড়লে শহর কলকাতার ভেতর কাশীপুর যেন সবচেয়ে বেশি তেতে ওঠে। তাই মনে হল রেণুর। গায়ে কিছু রাখা যাচ্ছে না। অথচ, এখন সবে মার্চের শুরু। ভাগ্যিস আমরা একতলায় থাকি। রেণু মাথায় চিরুনি বুলিয়ে বাজারের ছোট ব্যাগটা নিয়ে বেরবে। ঠিক এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ল কে?

দরজা খুলতেই রোগা মত একটি ছেলে— ওই বছর পঁচিশেক বয়স — জানতে চাইল, বিশুদা আছেন?

না তো।

কখন বেরিয়েছেন?

খুব দরকারি কিছু? আমায় বলে যেতে পারেন। ওর তো ফিরতে সেই বিকেল হয়ে যাবে।

ছেলেটি সাইকেলে উঠে বলল, না। বিকেলেই আসব আবার।

বাইরে থেকে দোর আটকে রাস্তায় নেমে রেণুর মনে হল, কেন ছেলে হয়ে জন্মালাম না। কী স্বাধীন। এই এল। সাইকেল চালিয়ে এই চলে গেল। অমন সাইকেল চালালে আমার থ্যালাসেমিয়া হতই না।

এখন জোর এগারটা বাজে। এখনও বাজার ভাঙেনি। জোর পায়ে বাজারে গিয়ে হাজির হল রেণু। বড় বড় পাতার পালং কিনল হাফ কেজি। কতকাল পালং শাক খাওয়া হয় না। বেশ সস্তাই মনে হল। হাফ কেজি এক টাকা। ছোট মত একটা মিষ্টি কলার মোচা আর পঁচাত্তর পয়সার থোড় নিয়ে বাড়ি ফিরে এল রিকশায়। একটু হাঁটলেই হাঁফ ধরে।

গ্যাস জ্বেলে কড়ায় তেল চাপিয়ে কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা ছেড়ে দিয়ে খুব তাড়াতাড়িতে পালং শাক কুটে নিতে লাগল রেণু। এখন তাকে দেখলে মনে হবে যেন ট্রেন ধরার তাড়া আছে। সামান্য আলু, আর কুমড়োও কেটে ফেলল। তারপর ভাল করে সব ধুয়ে নিয়ে কড়ায় দিয়ে হলুদ, নুন, সামান্য চিনি ছেড়ে একখানা বড় থালায় কড়ার মুখ চাপা দিল। ট্রানজিস্টারটা খুলল। এই সময় অনেকদিন ভাল গান থাকে। ট্রানজিস্টারে গান বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রেণুর মনটা নেচে উঠল। পালং শাকের আলাদা একটা স্বাদ আছে। শেষ কবে যে পালং শাক, থোড়ভাজা, মোচার ঘণ্ট কেয়েছে, তা আজ আর মনে পড়ে না রেণুর। গরম মশলা, নারকেল দিয়ে মোচার ঘণ্ট। ভাবতেই চোখে জল এসে গেল তার। এই শরীরটা আজ তার বোলতার ফাঁকা চাক মনে হয়। তাকে দেখতে বসে ডাক্তাররা বিশুর সঙ্গে যা যা কথা বলেছে — তার প্রায় সবটাই সে শুনেছে। মায়ের পেটে থাকতে তার শরীরে যে রক্ত কণা ছিল, তা নাকি এতদিনেও বিশেষ বদলায়নি। তাই তার শরীরের কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছয় না।

চোখ মুছে রেণু রান্নাঘরে গিয়ে ছোট্টমত মোচাটি সেলোফেনে মুড়ে ফ্রিজের ভেতর রাখল। আজ এখনই একসঙ্গে এত রান্না করা সম্ভব নয়। হাতির দাঁতের মত সাদা থোড় অন্ধকার রান্নাঘরের ভেতর আনাজের প্লাস্টিক ঝুড়ি থেকে রেণুর দিকে তাকিয়ে আছে। সেটাও তুলে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিল রেণু। যদিও সে জানে — ফ্রিজে রাখা মোচা, থোড়, পটল খেতে বিচ্ছিরি লাগে — এবার সে সাঁড়াশি দিয়ে কড়াইয়ের ওপর থেকে ঢাকাচাপা থালাখানি একদিকে একটুখানি তুলল।

উঃ! — কালোজিরে, লঙ্কা, হলুদের সঙ্গে সবুজ পালং শাকের নিজের গায়ের গন্ধ মিশে

গিয়ে সে যে কী সুবাস। কতকাল এ সব খাওয়া হয়নি। আরেকটু রাখা দরকার। ফের থালাখানি চাপা দিতেই সদর দরজা দড়াম করে খুলে গেল।

সেই শব্দে সামনের ঘরে ছুটে এসেই রেণু বুঝল, বাজার থেকে ফিরেই তাড়াতাড়িতে সে দোর আটকাতে ভুলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? কি ব্যাপার?

কিন্তু খাটের ওপর ক্যামেরার ঝোলাটা রেখে জুতো খুলতে খুলতে বলল, সেই রজত এক ফ্যাকড়া বাধিয়ে বসে আছেন। খবর করতে গিয়ে তিনি নিজেই খবর হয়ে গেলেন।

কিরকম?

ফেরেননি তো। এখন ছোটো নিরসায়। আমায় যেতে হবে রিপোর্টারের সঙ্গে। এডিটর জানতে চেয়েছেন — লোকটা উবে গেলেন নাকি? খোঁজো — খোঁজো। লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বাঃ! তার বাড়িতে খোঁজ নিয়েছ তোমরা?

ওর বাড়ি থেকেও বৌদি ফোন করেছেন। রজত পালিত ফেরেননি কেন?— জানতে চেয়ে।

তোমরা কি বলেছ?

কী বলা হয়েছে তা আমি জানি না। তবে অফিসও তো জানে না — তিনি কোথায়? কিংবা সেখানে তার ভালমন্দ কিছু হল কিনা — তাও তো কলকাতায় বসে জানার কোনও উপায় নেই। সে জন্যেই তো আমরা নিরসায় যাচ্ছি। — বলতে বলতে বাতাস শুঁকে উঠে দাঁড়াল বিশু। তারপর রেণুর কাছে এসে বলল, কি রাঁধছ?

কিছু না।

অনেকদিন পরে রেণুর প্রায় গায়ে গা মিশিয়ে বিশু জানতে চাইল, হ্যাঁ, কিছু নিশ্চয় রাঁধছ। খুব ভাল গন্ধ ভাসছে — বলই না।

বললাম তো — কিছু না। সবটাকে এত জানার ইচ্ছে কেন তোমাদের?— বলেও ভেতরে ভেতরে ভয়ে একদম কাঁটা হয়ে গেল রেণু। সে ভাবতেও পারেনি বিশু নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হবে।

অন্ধকার ছোটমত রান্নাঘরে ঢুকেই বিশু সুইচ টিপে আলো করে নিল। নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, ও সব কিসের খোসা? দেখি — বলে নিজেই নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে বঁটির পাশে কুমড়োর খোসা, পালংয়ের গোড়া চাঁছা দেখতে পেল। পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, কি ব্যাপার রেণু?

রেণু কোনও কথা বলতে পারল না। লজ্জায় মরে গেল।

বিশু চেঁচিয়ে উঠল, নোলা! নোলা! নোলার জন্যে নিজের মরণ ডেকে আনছ। সেই সঙ্গে আমারও।

রেণু দেখল, কথা বলতে বলতে বিশুর গলার শিরা সরু ইলেকট্রিক তার হয়ে ফুলে উঠেছে। সে খুব আস্তে বলল, আমি কারও মরণ চাইনি। আমি নিজেই মরে আছি। রোজ রোজ ভাত, রুটি, মাছ কাঁহাতক খাওয়া যায় বল তো? ভাত খেলে আমার নাকে একটা গন্ধ উঠে আসে। বমি পায়।

তাই বলে কুটনো কুটে রান্না করে সবজি খাবে?

হ্যাঁ খাব। আমি আর মাছ-ভাতের পিণ্ডি দিনের পর দিন গিলতে পারছি না। আমার যা

ইচ্ছে তাই খাব। মরি তো আমি মরব। তাতে তোমার কি?

তুমি ভাল করেই জান, শাকসবজি তোমার পক্ষে বিষ। শাকসবজি খেলে তোমার শরীরে আয়রন জমে যায়। তা বের করে দিতে মাসে দু'বার তোমার শরীরে ডেসিফেরাল ইঞ্জেকশন আমি নিজের হাতে পুশ করে থাকি।

জমে তো জমতে দাও আয়রন। জমলে আমার শরীরে জমছে। তোমার শরীরে তো নয়?

এ কথায় নিজেকে আর সামলাতে পারল না বিশু। সে সাঁড়াশিটা দিয়ে টগবগ করে ফুটতে থাকা কড়াইয়ের ঢাকাচাপা থালাখানি তুলেই পালং শাকের ঘণ্টের ভেতর আলু-কুমড়ো গলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি কি একা? আমি কি একা?

রেণু চেঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ। আমি একা। একা। একা —

সঙ্গে সঙ্গে বিশু গরম কড়াইটা সিঙ্কের কাছে উল্টেট দিল। রেণুর চোখের সামনে সবটা একদম নালির মুখে।

রেণু ছুটে গিয়ে শোবার ঘরে কোনওরকমে খাটের কাছে পৌঁছতে পারল। তার কোমর অবধি বিছানায়, বাকিটা নিচে। পলকা শরীরের ভার মেঝেতে পায়ের ঠেকান দিয়ে রাখল — কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বিশু কিছু না বলে প্যান্ট-শার্ট না ছেড়েই খাবার টেবিলে চেয়ারটায় গিয়ে বসে থাকল। সেখানে বসে সে উপুড় হয়ে বিছানার পড়ে থাকা রেণুর পিঠ, মাথার সঙ্গে ভাঙা খোঁপা, ব্লাউজের বাইরে সরু মত বাঁ হাতখানি দেখতে লাগল।

বেশ অনেক পরে বিশু উঠে গিয়ে রেণুর পিঠে হাত রাখল। রেখেই চমকে উঠল, কেঁদে কেঁদে তো জ্বর এনে ফেললে। দেখি তো — বলে সে ব্লাউজের ভেতর হাত গলিয়ে পিঠে হাত রাখল। তারপর বলল, বেশ জ্বর। সকালেই এসেছে?

রেণু কোনও জবাব দিল না।

আগামী সোমবার তো তোমার ব্লাড নেবার দিন। তার আগেই জ্বর এসে গেল? রেণু বিছানায় চেপে রাখা মুখে বলল, আমি আর ব্লাড নেব না।

বিছানায় উঠে বসে বিশু রেণুকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। তোমায় নিতেই হবে। আজই আমরা কোঠারিতে যাব।

আমি যাব না।

আমার জন্যে তোমায় নিতে হবে ব্লাড। তুমি না থাকলে আমি বাঁচব না। সোমবারের মধ্যেই তোমার গায়ে জ্বর এসে গেল। এতো ভাল নয়। চল। এক্ষুনি আমরা কোঠারিতে যাই। তোমার ভালমন্দ ওখানকার ডাক্তাররাই ভাল বোঝে। এখন বেরলে ফাঁকায় ফাঁকায় দুটো-আড়াইটের ভেতর পৌঁছে যাব। —একসঙ্গে এত কথা বলে কী খেয়াল হল বিশুর, আমি তো অফিস ক্যান্টিনে ভাত খেয়েছি। তুমি কি খেয়েছ?

রেণু কোনও কথা বলল না।

ঠিক আছে। এখন এই শরীরে আর তোমায় রাঁধতে হবে না। ধর্মতলায় পৌঁছে আগে তোমায় খানিক খাইয়ে নেব। মাংসের রেজালা।

লিফ্‌টে ছ'তলায় উঠতে উঠতে বিশু রেণু দু'জনই দেখল—ঘড়িতে পৌনে তিনটে। কার্ড করা থাকায় জায়গা মত গিয়ে ওদের বিশেষ দাঁড়াতে হল না। পোষা প্রাণীর মত রেণু গিয়ে শুয়ে পড়ল। যিনি রক্ত দেন তিনি মুখে কোনও কথা না বলে রেণুর কার্ডখানিতে কী যেন লিখে নিজেই রেণুর বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর জায়গা খুঁজতে লাগলেন।

বিশু দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর ওভাবে ঠায় তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। রেণু রোজ রোজ একটু করে একা হয়ে হয়ে কোনদিকে চলে যাচ্ছে? সেদিকটা দেখেনি বিশু। দেখেছে যেন রেণু একাই। তাই সে জেনেশুনে সেদিকে এগিয়েই চলেছে। আর আমি আমিও একা হয়ে আছি। অথচ একা হয়ে যাবার জন্যে আমরা বিয়ে করিনি। আমরা দুজনে আলাদা আলাদা করে একা হয়েই চলেছি। এমন তো কথা ছিল না।

রেণু অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ব্লাড দেওয়া সারা। এখন কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে। এখন কি কি হবে বিশু জানে। ভদ্রলোক পাশের কিউবিকেলে যেতেই বিশু এসে রেণুর পাশে বসল। গলার কাছে হাত দিয়ে বুঝল, সেই জ্বরটা এখন ধা ধা করে রেণুর দখল নিচ্ছে।

বাড়ি ফেরার পথে রেণু ট্যাক্সির ভেতর মাথা, পিঠ দিয়ে বিশুর বুকে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল। জ্বরে কেঁপে কেঁপে ওঠা রেণুকে বিশু আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল। যেন রেণু এখনই কোথাও চলে যাবে।

বাড়ি ফিরে সব দরজা জানলা খুলে দিল বিশু। কিছু হাওয়া আসুক। বছরের নতুন গরম এত চড়া হয় যে মনে হবে সবকিছু না দগ্ধে সূর্যের কোনও আনন্দ হয় না। রেণু একদম নেতিয়ে পড়েছে। এ দশা চলবে অনেকক্ষণ। অবশ হয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল রেণু।

বিশু আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কাশীপুরে রতনবাবু রোডে এখন বিকেলের ছায়া পড়ে এসেছে। তেলেভাজার দোকানে বেসন ফ্যাটানো শুরু হয়ে গেছে কখন। গনগনে কয়লার আঁচে তেল ফুটছে। এবার চিলতে করে কাটা বেগুনের ফালিগুলো বেসনে ডুব দিয়েই কড়ায় পড়বে। লাল বেগুনি হয়ে উঠে আসবে। বিশু হাঁটতে হাঁটতে বরানগর বাজারে ঠাকুরের মাংসের দোকানের সামনে এসে পড়ল। সদ্য দুটি খাসি কেটে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সিমেন্ট করা গদি ঘরের মত মাংসের দোকান। ক্যাশবাক্স নিয়ে একজন বসে। আর তার উল্টোদিকে দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে তিনজন বসে। তাদের হাতে চপার। ওরাই কেটেকুটে ওজন করে দেয়। হঠাৎ বিশু দেখল দোকানের বাইরেই একটা কুকুর শুয়ে। পেট বের করে। তিনটে বাচ্চা কুকুর তার দুধ খাবার চেষ্টা করছে। মা-কুকুরটি ঝোলানো মাংসের দিকে তাকিয়ে।

একটা বাচ্চা তার মাকে ক্রস করে তুলতুলে পায়ে বড় রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে। এদিকটায় খুব সাইকেল-রিকশা। যে কোনও সময়ে চাপা পড়তে পারে। বিশু ঝুঁকে পড়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। এমনভাবেই নিল—যাতে ওর মা না দেখতে পায়। তারপর একটা রিকশায় উঠে বসেই বলল, রতনবাবু রোড—

বাড়ি ফিরে কিন্তু দেখল, রেণু বিছানায় উঠে বসে ফাঁকা চোখে খোলা জানলা দিয়ে পুষ্প ডেকরেটরের দোকানের দিকে তাকিয়ে। ঠিক এই সময়টায় সেই ইঞ্জেকশনটা দিতে হবে। এখন রেণুর জ্বর নামার সময়।

ঘরে ঢুকেই বিশু বলল, তোমার জন্যে একজন সবসময়ের বন্ধু এনেছি—

রেণু এ কথায় ঘুরে তাকাল। চোখদুটো যেন কিছুটা জ্বলে উঠল।

এই নাও। আমি তো সবসময় বাড়ি থাকতে পারি না। এর সঙ্গে তোমার সময় কেটে যাবে দিব্যি।

রেণু দু'হাত এগিয়ে দিয়ে চুনেহলুদে রঙের কুকুরের বাচ্চাটা কোলে নিল। বাচ্চাটাও দিব্যি রেণুর কোলে উঠে গেল।

রামটহলের বডি উঠল দুপুর দুপুর। রেসকিউ দল দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটো পিট দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। উঠে আসছে। লোহার চেনে ঝোলানো দুটি লোহার ডুলি নিচে নেমে যাচ্ছে। আবার উঠে আসছে। রেসকিউয়ের এক একটি দল চারজনের। তাদের পিঠে ছোট ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডার দু'টি করে। সেখান থেকে নল এসে নাক-মুখের ওপর এঁটে বসানো। মাথায় ক্যাপলাইট। হাতে গ্লাভস্। সেই হাতে গোটানো, ভাঁজকরা স্ট্রেচার।

গোড়ায় গোড়ায় যখন লাশ উঠছিল পাতাল থেকে—তখন কী পড়িমরি ভাব সবার। কার লাশ? রিস্তেদার কে কে আছে? কলকাতার কাগজের ফটোগ্রাফাররা ছুটে ছুটে আসছিল।

তারপর হাওয়া অনেক বদলে গেছে। রামটহল দুসাদের বডি যখন ওপরে উঠল—তখন সে পঞ্চান্ন নম্বর লাশ। কোথায় ভিড়! শীত ফুরিয়ে আসায় বাতাসে এখন তাপের ভাপ। তাই লোকজন কমে আসছে?

নিরসা মাইনে একটা অসুবিধে দেখা দিয়েছে। খনিতে নেমে যারা মরল—তাদের বডি ওপরে উঠলেই কমপেনশেসন, সারা জীবনের পেনশন, প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দাহ করার খরচ-খরচা, গ্রুপ ইনসিওরেন্স—রিস্তেদারের ভেতর সাবালক কেউ থেকে থাকলে তার চাকরি—সব মিলিয়ে এত টাকা, এত সুযোগ—যা কিনা যে মরল, সে বেঁচে থাকতে কোনওদিন একসঙ্গে পায়নি, দেখেনি—ছেলে-মেয়ে মা-বোনের জন্যে বেঁচে থাকলে করতেও পারত না।

তাই নিরসা খনি ঘিরে এক অস্বস্তির মেঘ ঘনিয়ে উঠল। চারদিকে অচল খনির বন্ধ যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে। পুলিস এখনও তাঁবু খাটিয়ে রয়ে গেছে। কালো ভ্যান। খাবার প্যাকেট সাপ্লায়ার প্যাকেটের পর প্যাকেট শুকনো খাবারের প্যাকেট ডাঁই করে থাক দিয়েছে। খনিমুখে যারা নামছে—তারা ওপরে উঠে এসে সেই প্যাকেট খুলে খেতে বসছে। সবকিছু যেন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কোনও চমক নেই। কোনও উদ্বেগ নেই। কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। আর তিন-চারটে লাশ ওপরে ওঠাতে পারলেই খনি পাতালে আটকে পড়া মানুষের হিসেব সই সই মিলে যায়। ব্যস! বাতাসে এখন শুধু অন্য আরেক হিসেব। ভিক্টিমের রিস্তেদার কত টাকা পাবে? যে মরল তার লায়েক ছেলে বা বেওয়ারিশ আওরত কোন খনিতে কি চাকরি পাবে? মরদ হলে খনিতে নামবে। আওরত হলে অফিসঘরে এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে ফাইল দিয়ে বেড়াবে। বিকেল পাঁচটা বাজলে ছুটি। মাস গেলে কড়কড়ে নোটে তংখা।

ডেডবডি ওপরে উঠছে আর জলের ট্যাঙ্কি, ছোটা অফিসের বারান্দা নানান রিস্তেদারে-দাবিদারে ভরে যাচ্ছে! এখন নিরসা খনি চত্বরে গেলে চোখে পড়বে—এখানে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে নানান বয়সের মেয়েদের জটলা। এক এক ঝাঁকে এক একজন বুড়ি মত মহিলা। তাকে ঘিরে অল্পবয়সী বউ ঝিয়ের দল। কেউ বা আঁচলের আড়ালে বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে! তাদের মুখে এখন উদ্বেগের বদলে যেন বা চোখ ছুঁচলো হয়ে ওঠা এক লোভ রীতিমত সরু হয়ে ফুটে উঠেছে। বাচ্চাকে দুধ দিতে দিতে—কিংবা পাশের আওরতের মাথার চুল তার পেছনে বসে বেঁধে দিতে দিতেও চোখ কিন্তু অফিসঘরের লম্বা কালো বোর্ডের দিকে। যদি নতুন কোনও 'কাগজা' টাঙিয়ে দেয়—যাতে কিনা থাকবে হরিদ্বার পাসোয়ান কিংবা নয়ন দুসাদের পাওনাগণ্ডার হিসাব। রিস্তেদার থাকলে সে কি পাবে তার পরিষ্কার হিসেব। আর থাকবে ক্যাশঘরে যাবার ডাক—যেখানে গিয়ে দাহ করার খরচ-খরচা নিতে হবে।

ক'দিনের ভেতর সারাটা নিরসা খনি এলাকায় এক এক লাশের হরেক রিস্তেদার গজিয়ে উঠেছে। তাদের ঠেকাতেই খনি-অফিসের হিমশিম খেয়ে যাওয়ার দশা। একই ডেডবডিকে

দাহ করতে তিন-চারজন করে দাবিদার এগিয়ে আসছে। কেউ বলছে—নেহি, আসানসোলমে অন্তিম সংস্কার হোগা। সেই ডেডবডির ভাতিজা পরিচয় দিয়ে আরেক 'দাবেদার' বলছে—সো ক্যায়সা হোগা? হামলোগ বৈশালী কা কুর্মি। হামারা লাশ ব্যান্ড বাজাকে গঙ্গা মাই-কি কিনারে লে যাতা—তব তো দাহ হোতা।

ব্যাপারটা ক'দিনেই রজতও বুঝতে পেরেছে। এখন অনেক ডেডবডি হ্যান্ডওভারই করা যায়নি। কারণ, 'দাবেদার' যে অনেক। তাই বেশ কিছু লাশ সাকতোড়িয়ার সেন্ট্রাল হাসপাতালের মর্গে রাখতে হয়েছে।

রামটহল দুসাদের ডেডবডি নিয়ে বিশেষ কেউ জটলা করতে পারল না। কেন না রামটহলের মা মোতিয়া দুসাদ নিরসা খনির ধাওড়ার সাবেক বাসিন্দা। বলা যায়, বনেদী রহনেওয়ালী। সে এসেছিল তার স্বামীর হাত ধরে। হয়ত এই নিরসা-চটিতেই রামটহলের পয়দায়িস। এই নিরসা খনিতেই রামটহলের বচপন কেটেছে। তাই নোটিসবোর্ডে টাঙানো কাগজাতে 'দাবেদার' হিসেবে যে দুটি নাম উঠল—তার পয়লা নাম—চামেলী দুসাদ। পরের নামটি মোতিয়া দুসাদ।

ক'দিন আগে সাকতোড়িয়া সেন্ট্রাল হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যাবার পর চামেলীকে নিয়ে রজত পালিতই ফিরেছে। দুসাদ কোয়ার্টারে বারান্দায় খাটানো চৌপাইতে এখন সে বসে। উঠোনে পড়ন্ত বিকেল পড়ে আছে। সেই উঠোনে ছোট্ট একটা দোপাটি চারার সামনে সবে বেওয়া চামেলী দুসাদ বসে। মরসুমের শেষ দোপাটি ফুটে গাছটা এখন ন্যাড়া। দেখে তাই মনে হল রজতের। চামেলীর চোখ কোনও কিছুতেই আটকে নেই। সে একা বসে ফাঁকা একখানি আকাশের নিচে। ঘাগড়ার অনেকটাই ইট পাতা উঠোন ছাড়িয়ে ঘাসে লুটিয়ে পড়েছে। মাথার চুল রুক্ষ। ঘাড়ের ওপর দিয়ে সামনের দিকে। চৌপাইতে বসে রজত পালিত শুধু পিঠ আর মাথা দেখতে পেল। সে হাতের কাগজখানা তুলে গলা উঁচিয়ে ডাকল, রামটহল কি মা — ও রামটহল কি মা?

ম্যায় মোতিয়া দুসাদ ইহা হাজির হুঁ বাবুজি।

এমন সহবত মেশানো কথায় চমকে উঠে দাঁড়াল রজত পালিত। একদিনে সে দুই আওরতের কাছের লোক হয়ে উঠেছে। বাইরে উঠোনে বেরিয়ে এসে দেখল — মোতিয়া দুসাদ লোহার আঙটায় একটা তোলা উনুন ঝুলিয়ে ঘরের দিকে আনার সময় বারোয়ারি চত্বরে দাঁড়িয়ে খানিক রেস্ট নিচ্ছে।

কেয়া? থক গয়ী?

হা তো থোড়া বহুত বুঢটি হো চুকি!

নেহি নেহি মোতিয়া। — বলে রজত পালিত বুঝল, সন্ধ্যের ঝোঁকে রুটিটা বানিয়ে নেবে বলে মোতিয়া বাইরে মাঠে গিয়ে উনুন ধরিয়েছে — পাছে কয়লার ধোঁয়ায় এই কোয়ার্টারের ভেতর রজত পালিত কাল সন্ধ্যের মত কাশতে থাকে।

হাতের কাগজখানি দেখিয়ে রজত বলল, রামটহল কো লানে পড়েগা।

সো তো সোহি বাবুজি। — বলতে বলতে মাটির দিকে তাকিয়ে মোতিয়া দুসাদ বলল, চামেলী কো লে যাইয়ে — তুমহারি বেটা রামটহল। তুমহে তো যানাহি পড়েগি। চামেলীকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে মোতিয়া বলল, রামটহল উনকি ভি কুছ কম নেহি হোতি থি বাবুজি —

সন্ধ্যে হয় হয়। শীতের সেই দাপট যেন এ ক'দিনেই ভীষণ কমে এসেছে। চামেলী যেন অন্ধকারের জন্যেই ওয়েট করছে। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল তার ভেতর ও মুছে যেতে চায়।

কথাটা কিছু ভুল বলেনি মোতিয়া দুসাদ। রামটহল তার ছেলে। কিন্তু সে চামেলীর স্বামী। এখন রামটহলের বডি কে আনতে যাবে! দাবেদার তো দুজনই হতে পারে। অন্য লাশের বেলায় দাবেদার অনেক। রামটহলের লাশের বেলায় এই সাচ্চা দুই দাবেদারের ভেতর কোনও রেষারেষি নেই। চামেলী হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে মারুতি জিপসিতে বসে দু'বার চোখ তুলে তাকে দেখেছিল। সেই প্রথম রজত পালিতকে তার দেখা। কোনও কথা বলেনি।

শুধু গতকালই সকালে একবার চোখ তুলে চামেলী রজতের মুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত, আবছা গলায় জানতে চেয়েছিল, আপ কৌন হোতি হ্যায় বাবুজি?

রজত কোনও কথা না বলে শুধু হেসেছে। সকালের গরম চায়ের বড় গ্লাসটা চামেলীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলেছে, খা লো। ঠাণ্ডা হো জায়গা —

৭

চামেলী এমনভাবেই রজতের মুখে তাকায় — যেন সে এই কাঁচা-পাকা মাথার বাঙালিবাবুটিকে কোথায় দেখেছে। স্বপ্নে? না, নিরসা খনির এই ধাওড়ার পথেঘাটে? না, সাকতোড়িয়ার হাসপাতালে? এখন অন্ধকার সন্ধ্যায় সে মিশে যেতে চাইছে। তার শাশুড়ি কয়লার উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকতে বসবে। আটা মাখা সেই কাঁচা বিকেলেই সারা হয়ে গেছে। রামটহল বেঁচে থাকতে এই সময়েই মোতিয়া রুটি সেঁকে নিত।

রজত পালিত বলল, দো রোজ হো গয়া রামটহল সাকতোড়িয়া হাসপাতাল কো মর্গ মে পড়ে রহে হ্যায়। তুম্ দোনো কি যানে পড়েগি। সরকারসে রুপিয়া দে রহে হ্যায় — উসকা শম্‌শান খরচা বগেরা বগেরা সব সরকারকা —

এ কথা বলেও রামটহলের মা বা বউকে রজত চাঙ্গা করে তুলতে পারল না। সন্ধ্যে পুরোপুরি নেমে পড়েছে। নিরসা চটির রাস্তায় হেড লাইট জ্বেলে লরি আর নিরসা খনিতে শুধু রেসকিউয়ের জায়গায় আলো। ঘরে ঘরে ট্রানজিস্টারে গান। পৃথিবী ফের আগের মতই — দিন আর রাতের ভেতর দিয়ে ঘুরে চলেছে। ঘাসের ডগায় ফড়িংরা ফিরে এল। ফেরেনি রামটহল।

এখন তের নম্বর ধাওড়ায় — রজত পালিত বুঝতে পারে — সে একটি পরিচিত মুখ। গায়ে গায়ে লাগোয়া কোয়ার্টারগুলো থেকে মানুষজন বেরোয়। খনি বন্ধ বলে মরদরা কেউ হেড অফিস সাকতোড়িয়ায়। কেউ বা নিরসার খনি-অফিসেই হপ্তার জন্যে — নাগা মিলিয়ে হাজিরার ঠিক করিয়ে নিতে ধর্না দিচ্ছে। এর ভেতর ঘরে ঘরে যে সব মা-বোন-ঝি আছে — তারা নিত্যদিন দেখছে — কাঁচা-পাকা মাথার এক বাঙালিবাবু মোতিয়াদের হয়ে খনি-অফিসে যাতায়াত করছে — দুপুর পড়লে চানটান করে খোলা বারান্দায় খেতে বসছে — আবার ছ-সাতটা খনি মিলিয়ে শনিবারের শনিচারিহাটে গিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাজারহাট করেও ফিরছে — ফিরে হাঁক দিচ্ছে — ও রামটহলিয়াকা মা — ও মোতিয়া আহোনি — ই সব সামান রাখ দিয়া যায় — বলতে বলতে সওদা-বোঝাই সাইকেল রিকশা থেকে নামছে রজত পালিত।

কাণ্ডকারখানা দেখে মোতিয়া দুসাদ অবাক। অবাক চামেলী দুসাদ। আগে কোনওকালে

যে মানুষকে দেখেনি — তাকে আবছা যত মনে পড়ে চামেলীর — হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে — হাসপাতাল-গাড়ির ভেতর সে শুয়ে — আর তার মুখের ওপর এই মুখখানি ঝুঁকে পড়ছিল।

মোতিয়া দুসাদ গনগনে আঁচের তোলা উনুনটা কোয়ার্টারের সামনে ভাগের এক চিলতে ইটপাতা উঠোনে এনে তুলল। কোয়ার্টারের ভেতর রান্নাঘরে পাতা উনুনে আজ ক'দিন হল সে আর আঁচ দেয়া না। মোড়া মত ছোট একটা ভাঙা টুলে বসে হাতের ইশারায় চামেলীকে ডাকল। চামেলী কোনও কথা না বলে আটা মাখিয়ে এক একটা আটার গুলি বেলে নরম রুটিটা শাশুড়ির হাতে তুলে দিতে লাগল। মোতিয়া সেটা জ্বলন্ত কয়লার লালচে আগুনে মেলে দিয়েই ফুলে ওঠামাত্র লোহার একটা শলা দিয়ে তুলে নিয়ে সেটা পাশের ডালায় রাখতে লাগল। রাখতে রাখতে রুটির দিকে চোখ রেখেই মোতিয়া জানতে চাইল, বাবুজি। আপ কৌন হ্যায়? চারদিক আমাবস্যার নিশুতি রাতের মত কালো। এখনও সন্ধ্যে রাতের চাঁদ দেখা দেয়নি। তাহলে অন্ধকার কিছু ফিকে লাগত। মোতিয়া দুসাদের কথায় রজত পালিত তার ভেতরসুদ্ধ কেঁপে উঠল। সত্যিই তো আমি কে? আমি কে যে কলকাতা থেকে উড়ে এসে এই নিরসা খনির ধাওড়ায় সদ্য বেওয়া চামেলী দুসাদের দুঃখকষ্ট কমাতে এঁটুলির মত লেগে আছি? মূর্ছার ভেতর হঠাৎ আমার হাত দু'খানি ধরে বাবা — বাবা গো — বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল বলে? হয়ত বাবা — বাবা গ — বলে ঠেলে উঠেছিল। আমার বাঙালি কানে শুনেছি — বাবা গো। শুনতে ভুল হয়ে থাকতে পারে। এই সামান্য একটা বাবা ডাকের জন্যে আমি সব ছেড়েছুড়ে রয়ে গেলাম? হোটেলে থাকতে হতে পারে ভেবে ভাগ্যিস ব্যাগে কয়েকটা জামা-প্যান্ট, পাজামা এনেছিলাম। টুথ ব্রাশ, চিরুনি, লুঙ্গি, সাবান, তোয়ালেও ছিল। ছায়ার দিয়ে দেওয়া টাকা এবার তলানিতে এসে ঠেকেছে। বাজারহাট যে করি — তার পয়সাকড়ি তো মোতিয়া দুসাদ এখন অব্দি বের করেনি একবারও। ঘুম পেলে আমি শুয়ে থাকি বারান্দায় — রামটহলের চৌপাইয়ে। অবিশ্যি মশারিটা খাটিয়ে দেয় মোতিয়া। কাল রাতে প্রথম দিয়েছে চামেলী। আমার এ সব কথা শুনলে এখন-এর পরাশর মালাকার কি বলবেন! হাসবেন?

মোতিয়া দুসাদ ফের জানতে চাইল, বাবুজি। আপ কৌন হ্যায়? ইউনিয়নকা?

নেহি নেহি মোতিয়া —

তব গরমিন্ট কা?

ও ভি নেহি।

তব নিরসা খনি কা?

নেহি নেহি মোতিয়া —

এবার রুটি সেঁকা থামিয়ে রামটহলের মা রজত পালিতের মুখে তাকিয়ে পড়ল। চোখ স্থির। উনুনের লালচে আগুনে শুকনো ভাঙা ভাঙা মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে। শান্ত গলা জানতে চাইল, তো তুম সুরজপ্রসাদ কা দালাল —?

এই নামটা নিরসা খনিতে এসেই শুনেছে রজত। খনি এলাকায় যে কোনও কথা উঠলে ও নামটা আসে। কয়লা সরকারি হওয়ার আগে সুরজপ্রসাদের কথামত লোক ভর্তি হত খনিতে। সে সব পাট অনেকদিন উঠে গেছে। সুরজপ্রসাদ এখনও ধানবাদ, আসানসোল, ঝরিয়া, রানীগঞ্জ দাপিয়ে বেড়ায়। তার এখন বয়স হয়েছে। সে নিজে এখন শুধু অন্যায় কাজের টাইম টেবিলটা বানায়। তার লোক বেআইনি সব কাজ এ এলাকায় চালিয়ে যায়। কয়লা তোলা, পাচার —

সবটাতেই সে আছে।

জিভ কেটে রজত তার বয়সের — শরীরের ওজনমাফিক গম্ভীর গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ মোতিয়া। মুঝে ক্যা ওইসা লাগতা?

মোতিয়ার শক্ত মুখ নরম হল। সে আবার রুটি ভাজতে লাগল। কিন্তু খানিক পরে ফের জানতে চাইল, তব বাবুজি আপ কৌন হ্যায়?

ম্যায় কলকাত্তাকে রহনেওয়ালা এক বাঙালি হুঁ। কুছ কাম ধান্দা তো জরুর করতা হ্যায় — জবাব দিতে গিয়ে চামেলীর মুখখানি রজতের চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রজতের বুকের ভেতর ধক করে উঠল। ট্রেনের যাবার সময় ছুটন্ত কামরার নিচে এমন বেমক্কা ধাক্কার অনেক আওয়াজ শোনা যায় — কারণটা জানা যায় না — তখন জানলায় দু'পাশের পৃথিবী পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। বারো-তের বছরের ইরা যেন — ইরা খুব অল্প বয়সেই শাড়ি ধরেছিল — শাড়ির খুঁটে মুখ চেপে চোখে হাসছে — এমনই ভঙ্গি চামেলী দুসাদের মুখে। পাছে অন্যমনস্ক হয়ে যায় — এই ভয়ে সে মনে মনে পলকে যুক্তি সাজাল। তবে ঠিক করল — যতদূর পারে সত্যি কথা বলবে সে। যা বললে ওরা বুঝতে পারবে না — কিংবা না বুঝে শুধু শুধু মিথ্যে সন্দেহ করে গোলমাল পাকাতে পারে — সেই জায়গাটাই এড়িয়ে যাবে রজত।

হাঁ। কাম তো ম্যায় জরুর করতা হুঁ। লেকিন ম্যায় রিটায়ার আদমি হুঁ।

তো বেকার হ্যায় বাবুজি?

নেহি নেহি। ম্যায় ফিন ভর্তি হুয়া কামমে। তংখা মিলতা হ্যায়। লেকিন রিটায়ারকা পহেলেসে আধা।

মোতিয়া দুসাদ খুব বুঝদার আওরত। সে সমঝদারি ভঙ্গিতে বলল, সো তো হোগা হি। রিটায়ার হো গিয়া না বাবুজি। এর পর খানিকক্ষণ খুব মন দিয়ে রুটি ভাজলো মোতিয়া। তারপর হঠাৎ জানতে চাইল, সরকারি নোকরি?

নেহি নেহি। প্রাইভিট।

আপকো ক্যা করনা পড়তা বাবুজি?

এখানেই রজতের মুশকিল। সে কি করে বোঝাবে — সে কলকাতার একখানি বড় ডেইলি পেপারের হয়ে ঘুরে দেখে রিপোর্ট লেখে। রিপোর্ট কথাটা বললে যদি তাকে পুলিসের লোক বলে ভুল করে। রজত পালিত আলতো করে বলল, অ্যায়সাহি। দফতরকা কাম য্যায়সা হোতা—

তো কৌন কৌন হ্যায় ঘরমে?

সব কোই হ্যায়। বিবি। বেটি —

ঠিক এইসময় — অন্ধকারের ভেতর একটা চাপা হল্লা শোনা গেল। হল্লাটা যেন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দলা পাকিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এদিকেই ছুটে আসছে।

ওই গোলমালে লোহার শিক-সমেত মোতিয়া দুসাদের হাতখানি থেমে গেল। চোখে কীসের আতঙ্ক। তবু মুখে সে জানতে চাইল, সব কোইকো ছোড়কে বাবুজি আপ ইঁহা কিউ হ্যায়? জরুর উন লোগোঁকে লিয়ে আপ বেচ্যায়ন হ্যায় —

রজত পালিত জবাব সাজাবে কী! হল্লাটা হই হই করে তের নম্বর ধাওড়ার এজমালি উঠোনে ঢুকে পড়ল। কাঁহা হ্যায় ও বদচলন? কাহা হ্যায় ও মক্কার?— বলতে বলতে ভিড়টাকে লেজে বেঁধে যে সামনে এগিয়ে এল — তাকে দেখেই বোঝা যায় মস্তান গোছের লোক। তার

বাজখাঁই আওয়াজে আশপাশের কোয়ার্টার থেকে ক'জন বউ ঝি বেরিয়ে পড়ল।

রজত পালিত সবটা বুঝে ওটার আগেই তার গালে লোকটা সপাটে একটা রদ্দা কষাল। রজত ঘূর্ণি খেয়ে উঠোন ছাড়িয়ে গাঁদা ফুলের ঘন ঝাড়ের ওপর গিয়ে ছিটকে পড়ল।

মোতিয়া দুসাদ রুটি সেঁকার লিকলিকে লোহার শিকখানি তুলে ছুটে এল, এ জটাধর। ক্যা হল্লা মাচাতারে —। এসেই পড়ে-যাওয়া রজত আর জটাধর নামে লোকটার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল। আলো বলতে তোলা উনুনের গনগনে আঁচের লাল আভা মোতিয়া দুসাদের মুখে।

মোতিয়ার এই ভঙ্গিতে কী ছিল। দাপটে এগিয়ে-আসা জটাধর রজতকে আরেকখানা আরও ভারি রদ্দা কষানোর জন্যে এগিয়ে গিয়ে হাত তুলেও দাঁড়িয়ে গেল। হাতে না পেয়ে রজতকে এবার সে মুখে সযুত করতে লাগল। ফুর্তি মাচা রহে ইঁহা বৈঠকে। ঘর কাঁহা? বোল্ — বোল্ — গাঁদা ফুলের ঝাড়ের ভেতর দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে ফের পড়ে গেল রজত। ঠোঁটের বাঁদিকটায় কষাড়ে ভিজে ভিজে। নিশ্চয় রদ্দার চোটে দাঁত বসে গিয়ে ঠোঁট কেটেছে। ভয়ে বারান্দায় উঠে-দাঁড়ানো চামেলী ককিয়ে উঠল, বাবুজি —। বেশ জোরে। সেদিকে তাকিয়ে ফের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রজত। পারল না। এবারে সে একদম চিৎ হয়ে পড়ে গেল। চোখ সন্ধ্যেরাতের খনি এলাকার আকাশে। সারা পৃথিবী থেকে এ জায়গাটা এখন একদম আলাদা।

চামেলী দুসাদ জটাধরের ভিড়টাকে একদম কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে ভিড় ফুঁড়েই ফুলের ঝাড়ের ওপর লেপটে বসে পড়ে রজতের বুকে হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠল, বাবুজি — কাঁহা চোট্ পৌঁছা — কাঁহা? বাবুজি —

রজত সব বুঝেও উঠতে পারল না। মাথার পেছনে আরও বেশি ব্যথা লাগতে পারত। ভাগ্যিস গাঁদা ফুলগাছগুলোর জঙ্গল এখানটায়। তবে সে এটা খুবই বুঝতে পারল — সাবেক বেওয়া মোতিয়া দুসাদ আর হালে বেওয়া চামেলী দুসাদের এই ভাঙাচোরা সংসারে বড় দুর্ভোগ নেমে এসেছে। আর তা এসেছে তারই জন্যে। আর সে ভাবতে পারল না। সারা শরীর — দু'চোখ — সবকিছু যেন একই সঙ্গে এলিয়ে পড়ল রজতের।

টানা ঝিঁঝির ডাক, দূরে গরমের শুরুতে রাতচরা পাখির ডাক — কোথায় যেন মালগাড়ি শান্টিং চলছে — তার ঘট্টা ঘটাং আওয়াজ — এ সবের ভেতর চোখ মেলল রজত।

লো ভোল্টেটর আবছা আলোয় রজত দেখতে পেল — তার মুখে পলক না ফেলে তাকিয়ে চামেলী। মোতিয়া দুসাদ।

মোতিয়া দুসাদ লোটা কাত করে রজতের মুখে জল দিল। মোতিয়া বলল, অউর থোড়া পানি পিজিয়ে বাবুজি —

রজত দেখল — সে বারান্দার চৌপাইতে শুয়ে। তার মাথার নিচে দলা পাকানো কাঁথা। বালিশের বদলি। সে জানে এই কাঁথাখানি রামটহল শীতে গায়ে দিত।

ম্যায় খুদহি ইহা চলা আয়া?

চামেলী হেসে বলল, নেহি বাবুজি। মাজি আউর ম্যায় — হাম দোনো আপকো লে আয়ে—। লেট যাইয়ে। মত উঠিয়ে বাবুজি—জরুর ভারি চোট লাগ গিয়া শিরমে —

মাথাটা খুব ভার ঠিকই। কিন্তু উঠে বসতে পারল রজত। তারপর কোনওরকমে বলল, ও লোক চলা গয়ে?

দূরে অন্ধকার আকাশের নিজের পাঠানো ফিকে আলোয় মোতিয়া দুসাদ চুলোটার পাশে

উঠোনে বসে। চুলোর আগুন নিভে এসেছে প্রায়। সেখানে বসেই মোতিয়া দুসাদ হেসে বলল, কব চলা গয়া জটাধর। বাহারমে লম্বাই চওড়াই — অন্দরমে ডরপোক।

তুম সব খা লিয়া?

ক্যায়সে খায়েগি! আপকো ভুখা রাখকে ক্যা ম্যায় দো আওরত খা সাকতি?

চামেলী সাত তাড়াতাড়ি ভিণ্ডি ভাজি, আচার আর দুখানি করে রুটি থালায় থালায় বেড়ে দিয়ে বলল, আসুন বাবুজি।

ফের চমকে উঠল রজত পালিত। সে জানতে চাইল, 'আসুন' ক্যায়সে শিখ লিয়া চামেলী?

মোতিয়া দুসাদ রুটি চিবোতে চিবোতে বলল, চামেলীকো বাঙ্গালি বুলি আতি হ্যায় বাবুজি।

ক্যায়সে?

চামেলী বলল, ম্যায় পূর্ণিয়া-ফরবেশগঞ্জকি রহনেওয়ালি বাবুজি।

তো?

য়ঁহা বঙ্গালি পড়োশন বহুত দিনকি। মেরি দো চার সহেলি বঙ্গালি থি। মেরি বাবুজিকো ভি বহুত বঙ্গালি কা সাথ দোস্তালি থি। বঙ্গালি পয়দায়িস কি সহেলিকো সাথ উঠন-বৈঠনসে বঙ্গালি লবজ আ গয়ি। বঙ্গালি বুঝি হামি বাবুজি!

রামটহলের লাশ নিয়ে রওনা দিতে দিতে পরদিন বিকেল হয়ে গেল ওদের। পাছে ডেডবডি নিয়ে কোনও টেনশন, মিছিল-টিছিল হয় — তাই নিরসা খনি থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা। লাশ পিছু একটি করে গাড়ি। রামটহলের জন্যে একখানি মারুতি জিপসি। ঠিক সাকতোড়িয়া হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সের মতই। যার লাশ তার দেশের বাড়ি অব্দি পৌঁছে দেবে। সৎকারের জন্যে নগদ বারো হাজার টাকা পেল চামেলী। সই করে টাকাটা নেবার সময় — খনি-অফিস থেকে শুনতে পেল — ফিরে এসে দপ্তরে তার জন্যে একটা কাজও থাকবে।

কাশীপুরে রতনবাবুর নামে রাস্তা — রতনবাবু রোড। গঙ্গায় তার নামে ঘাট। রতনবাবুর ঘাট। কাশীপুর শ্মশান যেতে বাঁহাতে এই ঘাট। শিবরাত্রির সময় জোর ভিড় হয় রতনবাবুর ঘাটে যাবার রাস্তায়। কাশীর আদলে বরানগরে ঘাটে ঘাটে ছোটখাটো মন্দির, দেবদেবী, শিব, দুর্গা। ছেলেবেলা রেণুর কেটেছে কাশীতে। শিবরাত্রির উপোস করে আকন্দ ফুল জলে ফেলল রেণু। তখন গঙ্গায় জোয়ার। ঢেউ এসে ভাঙা ধাপগুলো ঢেকে ফেলেছে। মেয়েদের ঘাটের পাশেই পুরুষদের ঘাট। কাছাকাছি লঞ্চ ভিড়ছে জেটিতে। সন্ধ্যেবেলায় অফিস ফেরত ঘরে-ফেরা ভিড়। ওপারে বেলুড় মঠ বরাবর ভটভটি যাচ্ছে। সূর্য ডুবে যাবার পরেরকার অন্ধকার। মাছমারা নৌকোয় কুপির আলো। চৈত্রের রোদে সারাটি দিন রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, গঙ্গা খাক হয়ে পুড়েছে। এখন চমৎকার বাতাসে সারা গা জুড়িয়ে গেল রেণুর। রাস্তার বাঁদিকে গঙ্গা। ডানদিকে ঘরবাড়ি। দোকানঘর। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিকের আলো। মানুষজনের কথাবার্তা। সব জায়গায় কী যেন একটা ঘটবে বলে মনে হয় রেণুর! সব সময় তাই মনে হয় তার। নিজের শরীর ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। ব্যাপারটা টের পেয়ে সারাদিন উপোস থাকা রেণু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করল।

কিন্তু ফিরতে গিয়েই সব গুলিয়ে গেল। রেণু যেদিক দিয়েই এগোতে যায় — সেদিকেই শিবের মাথায় ফুল দিতে আসা মেয়ে-বউদের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে যায়। একদম এগোতে পারে না রেণু। এ কি হল? শরীরও ভাল ঠেকছে না। যে করেই হোক বাড়ি ফিরতে হবে।

কিন্তু পথ পাচ্ছি না। আমি কি তাহলে রাস্তাতেই পড়ে যাব নাকি?

হঠাৎ পায়ে পায়ে কি জড়িয়ে গেল রেণুর। এই—! বলে সরে যেতেই দেখল — কখন কালু এসে তার সঙ্গী হয়েছে।

এই কালু? কখন এলি?

ছোট, কালো রঙের কুকুরের বাচ্চাটি কুঁই কুঁই করে উঠল।

পথ চিনে এতটা এলি কী করে?

কী আহ্লাদে ভিড়ের ভেতর গলে গিয়ে কালু বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল। রেণু দেখল — সে দিব্যি বাড়ি ফিরতে পারছে। এই একটু আগেই সব চেনা পথ অচেনা লাগছিল তার। আর এখন সব কেমন সরল লাগছে।

বিশু ফেরেনি। বাড়ি ফিরেই খানিকটা বেলের শরবত বানাল রেণু। ঢক ঢক করে তা খেয়েই সে খাটের ওপর এলিয়ে পড়ল। ঘুম এসে তার ভেতরকার কাঁপুনি পলকে মুছে ফেলল।

একসময় ভারি অদ্ভুত লাগতে লাগল রেণুর। কী সুন্দর গন্ধ। সারা গা ঠাণ্ডা বাতাসে ভিজে আছে। ও মা! রেণু টের পেল তার বুকও ভিজে যাচ্ছে। দুধ আপনা-আপনি গড়িয়ে পড়ছে। কী এক আহ্লাদে সারা মন ভরে গেল রেণুর। বাতাসে ফিকে মত কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ। আলোর রঙ অনেকটা যেন কলাগাছের মাঝের পাতার মত ফিকে সবুজ। আলো কি এভাবে রঙ বদলায়? আমি কি তবে মা হয়েছি? রেণু বুঝে উঠতে পারছে না — সে কবে মা হল। তাহলে কি আমার বাচ্চাটা হবার পরেই হাসপাতালে থেকে গিয়েছিল? আমি চলে এসেছি? বাচ্চা সুস্থ হতে তবে হাসপাতাল ফেরত দিল? বিশু কেন এ কথা আমায় একবারও জানায়নি?

সে দু' হাতে নিজের বুকের ওপর কী যেন জড়িয়ে ধরল। নরম। তুলতুলে। সত্যিই তো!

ঘুম ভেঙে উঠে বসল রেণু।

সারা ঘর একদম অন্ধকার। লোডশেডিং। পাখা কখন বন্ধ হয়ে গেছে। মশা একদম ছেঁকে ধরেছে তাকে। বহু কষ্টে রেণু উঠে বসল। তার বুক থেকে তুলতুলে মত জিনিসটি কোলে গড়িয়ে পড়ল।

রেণু তাকে জোরে দু'হাতে বুকে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে কালু চেঁচিয়ে উঠল, কেঁউ-কেঁউ-

রেণু খাট থেকে নেমে এমার্জেন্সি আলোটা জ্বেলে নিল। তারপর কালুর বাটিতে দুধ ঢেলে একটা কোয়ার্টার পাউরুটির খানিকটা তাতে মেখে দিল। নে — খা — মাদার ডেয়ারির দুধে পাউরুটির নরম মাঝখানটা পড়েই রেণুর মাখামাখিতে গলে গেল। এমার্জেন্সি আলোর ভেতর মহা আনন্দে কালু তা জিভে চেটে চেটে পেটের ভেতর পাঠাতে লাগল। প্রায় অন্ধকার ঘরে কালুর দুই চোখ একদম জ্বলন্ত। দুই নীল মার্বেল। একসময় বাটির দুধরুটি ফুরিয়ে গেল।

রেণু কালুকে কোলে তুলে নিয়ে সদর দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রাস্তাও অন্ধকার। তার ভেতর রিকশা, বাস, ট্যাক্সি। সে সব তুচ্ছ করে শিবরাত্রির উপোস করা বউ-ঝিরা রতনবাবুর ঘাটের দিকে চলেছে। পিল পিল করে। আজ রেণু এত কাণ্ডের ভেতর কোত্থেকে যেন-ফিকে ভাবে বেজে ওঠা কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ ফিরে ফিরে শুনতে পাচ্ছে। বাতাসে কীসের গন্ধ। অন্ধকার থেকেও আলো ফুটে উঠছে। তার রঙটা তরল সবুজ।

রেণু কালুর কানের কাছে আলতো করে চুমু খেয়ে বলল, জল খাবে না বাবু?

কালু, রেণুর কান ফট করে চেটে দিল।

রেণু তাকে কাঁধের ওপর তুলে ফিস ফিস করে বলল, তোর বাবা সারাদিন পরে বাড়ি

ফিরলে অমন আদেখলাপনা করিস কেন বল তো? জুতো চাটা চাই। হাত চাটা চাই। সে কি তোকে খাওয়ায়? না, নাওয়ায়? সব তো করি আমি। এই আমি। আমাকে চিনিস না! ওরে দুষ্টু! আমি তোর কে হই বল তো?

৮

রজনী সেন রোডের সামনে এই ফ্ল্যাটবাড়ির বসার ঘর থেকে খোলা দরজা দিয়ে ইরা সাউথ ক্যালকাটার তাবৎ উঁচু বাড়ির মাথা দেখতে পাচ্ছে। সঙ্গে টি ভি টাওয়ারের ডগা, পুলিস ওয়ারলেসের উঁচু মাথা। সবই তার চোখের সামনে। দূরে নিচে পিচ গলে গিয়ে এখন বিকেলের ছায়ায় বাড়ির সামনের রাস্তাটা কালো আমসত্ত্ব প্রায়। আর একটু পরে এই পথ দিয়েই শঙ্কু আর চিনি স্কুল থেকে ফিরবে। ইরা বসার ঘরের বিছানায় আসন করে বসল। এখন বাড়িটা ফাঁকা। শিরদাঁড়া সিধে করে চোখ বুজল। চোখ বুজেও সে টের পেল বাইরে গরমের তাত আলোর পিন হয়ে চোখে বিঁধছে।

ইরা বসু চোখ বুজে নিজের দুই চোখের দৃষ্টি ভ্রূর মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। সে এখন মন স্থির করতে বোজা চোখের ঢাকা দৃষ্টি নাকের শুরুতে নিয়ে যেতে চাইল। রুক্মিণী মা! মাগো! আমার মন স্থির করে দাও। বলতে বলতে সে বিড় বিড় করে কী আওড়াল। এ-মন্ত্র সে কাউকে বলতে পারবে না। রুক্মিণী মা তাকে এই মন্ত্র দিয়েছেন। মন্ত্রের সঙ্গে যা করতে বলেছেন তিনি তা করে থাকে ইরা। যা কিনা কিছু কিছু ক্রিয়া। সব চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শূন্য মনকে সে দুই ভ্রূর জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। সে কাজে সফল হতে হলে যেভাবে বসা দরকার ঠিক সেই ভাবেই বসেছে ইরা। সে জানে এই সব ক্রিয়া ছাড়া শুধু মন্ত্রে কোনও কাজ হবার নয়। শুধু মন্ত্রে না হয় শিষ্যের উপকার। না হয় গুরুর উপকার। অথচ সরল মানুষজনকে শুধু মন্ত্র দিয়ে দীক্ষা দেওয়া চলছে। এইভাবেই গুরুগিরি, মোহন্তগিরি চলে আসছে। নাকের একদিক থেকে নিঃশ্বাস নিয়ে সে নিঃশ্বাস ধরে রাখল ইরা। তারপর খানিকবাদে আরেক নাক দিয়ে সেই নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল। মনটাকে ফাঁকা করে দুই ভ্রূর মাঝখানে আজ বসাবেই বসাবে ইরা। একবার এভাবে বসাতে পারলে তার নিজের সঙ্গে দেখা হবে ইরার।

ঈশ্বরকে আমরা বৈকুণ্ঠে খুঁজি। ক্ষীরোদ সাগরে খুঁজি। তীর্থে, মন্দিরে, মসজিদে খুঁজি। কিন্তু তিনি তো আমাদের নিজের শরীরের ভেতর দুই ভ্রূর মাঝখানটিতে সব সময় রয়েছেন। অথচ তারই খোঁজ রাখি না। রুক্মিণী মা। তুমি তাঁর খোঁজ দিলে আমাকে। মন ফাঁকা করে ওখানটায় বসাতে পারলেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে। তুমি বলেছ রুক্মিণী মা— এই দেখা হওয়াটাই আমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া। আমার ভেতরে তিনি আছেন। তিনিই আমি। কিংবা আমিই তিনি। এবার ইরা তার নিঃশ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রেখে তারপর ছাড়ল। দেখাটা একবার হোক। হলেই জানতে চাইব— আমার বাবা— হ্যাঁ। আমার বাবা শ্রীরজত পালিত এখন কোথায়? কেন বাবা নিরসা খনিতে গিয়ে পড়ে আছে? সে জায়গায় তো তার কেউ নেই। তবে? কী একটা গন্ধে সারা ঘর ভরে গেল। খুব হালকা গন্ধ। বাইরের রোদের তাতে সে গন্ধ উবে যাবার নয়। ইরার একবার মনে হল— সারা ঘর এই গন্ধে ভরে যাচ্ছে। এ গন্ধ কোনওদিন শেষ হবার

নয়। ইদানীং এ সব ক্রিয়া করে সে গায়ে খুব জোর পায়। শঙ্কু, চিনিকে খাইয়ে-দাইয়ে-পড়িয়ে স্কুলে পাঠিয়েও কোনওরকম টায়ার্ড হয় না ইরা। সে পরিষ্কার বুঝল, এমন হালকা, ফিকে গন্ধ তাকে যেন কী মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু সেই জিনিসটা যে কী তা কিছুতেই মনে করতে পারল না ইরা।

পদ্মাসনে বসে ইরা তার দুই হাতের পাতা খুলে দুই হাত হাঁটুর ওপর রাখল। তারপর জিভের ডগা দিয়ে নাকের ডগা ছুঁতে চেষ্টা করতে লাগল। মাথা পেছনে কাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভেতরটা যেন সুন্দরবনের খাঁটি মধুর স্বাদে ভরে গেল। আর সারা মাথা বুঝিবা এক হাজার পাপড়ির পদ্মে ভরে উঠছে। সেই পদ্মের গন্ধে সারা ঘর ম ম।

রুক্মিণী মা বলেন, ঈশ্বর কোথায় নয়? স্বাদে। ঘ্রাণে। চোখে। সেবায়। সব জায়গায়। ইরা এবার যেন বুঝতে পারল— সে তার মনটা একদম ফাঁকা করতে পেরেছে। এবার শূন্য মনকে সে রামদুয়ারে বসাবে। দুই ভ্রূর মাঝখানটাই তো রামদুয়ার। ভগবানে যাবার সবচেয়ে বড় দুয়ার। ভগবান এসো। বসো।

এ সব ভাবতে ভাবতে— কিংবা কিছুই না ভাবতে ভাবতে ইরার হঠাৎ খেয়াল হল— তার দুই ভ্রূর মাঝখানটা আপনাআপনি থিরথির করে কাঁপছে। এতই কাঁপছে যে সে চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না। কেঁপেই চলেছে।

ঠিক এই সময় ঘটাং করে দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অভিষেক থমকে দাঁড়াল। তার মুখে যা এসে গিয়েছিল তা সে বলে ফেলল। আমার সালভাদার দালির উপন্যাসখানা কোথায় বলতে পার?

ইরা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে একদম অন্য কথা জানতে চাইল, অফিসে যাওনি?

গিয়েছি। একখানাই নভেল লিখেছিলেন দালি। মাত্র একখানি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মোটে একখানাই নভেল লেখেন তিনি। — জানলার তাকে বইয়ের ঢিবি ঘাঁটতে ঘাঁটতেই অভিষেক ফের বলে উঠল, ফিল্মও তিনি তুলেছিলেন মাত্র একটি। তাও বুনুয়েলের সঙ্গে। কিন্তু বইখানা যে পাচ্ছি না ইরা। দালির উপন্যাস মাত্র একখানিই আছে কলকাতায়।

অফিসে গিয়ে দালির উপন্যাসের কথা মনে পড়তেই বাড়ি চলে এলে খুঁজতে?

আঃ। দালির উপন্যাস তো বটেই। তিনি সারাজীবনে মাত্র একখানিই উপন্যাস লিখেছিলেন। সে উপন্যাস মাত্র এক কপিই কলকাতায় আছে। তাও আমারই কাছে। উপন্যাসখানা কোথায় গেল বলতে পার? শঙ্কু ওরা হাত দেয়নি তো?

ওরা কী করবে তোমার উপন্যাস দিয়ে। দ্যাখো ওখানেই আছে। অন্য সব বইয়ের ভেতর মিশে আছে। একখানা বইয়ের জন্যে অফিসের কাজ শেষ না হতেই বাড়ি ফিরে এলে?

আঃ! বুঝছ না কেন? ওর ভেতর আমার একটা কবিতা রেখেছিলাম।

ওঃ! তাই বল। তোমার কবিতা!

হ্যাঁ। কাল অনেক রাতে কবিতা এল। সারাদিনই কবিতার লাইনগুলো মাথার ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। কলকাতা ঘুমিয়ে পড়ল। আমি যেন কবিতার জন্যে বসে আছি। বসেই আছি। তারপর কখন খস খস করে একটানা লিখে ফেললাম। লিখে কাগজখানা ভাঁজ করে দালির উপন্যাসের ভেতর গুঁজে রেখেছি। গুঁজে রেখেই সারাটা শরীর আমার অবশ হয়ে গেল ইরা। যেন এতক্ষণ কত মাইল হেঁটে এসেছি খাড়াই পাহাড়ি পথ বেয়ে। গায়ে আর

কোনও জোর নেই। জোর পাচ্ছি না। বিছানায় পড়তেই ঘুমে ঢলে পড়লাম। আজ বেশ বেলায় উঠে বাজারে গেছি। দাড়ি কামিয়েছি। ভাত খেয়ে অফিসে গেছি। কবিতাটার কথা মনেই পড়েনি সারাদিন। অফিসে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অবাক হচ্ছি— কী করে ওর কথা সারাদিন ভুলেছিলাম ইরা! দীর্ঘ কবিতা। লম্বা লম্বা লাইন। ছাপার সময় দেখতে হবে লাইনগুলো যাতে ঠিকমত বসানো হয়। ঠিকমত স্পেস দিয়ে— এটা আমার একটা কী কবিতা— মনে হচ্ছে আমি অনেকদিন পরে একটা কবিতা লিখতে পেরেছি।

কথা বলতে বলতে থেমে গেল অভিষেক বসু। সে ভাল করে ইরা বসুকে দেখল। ইরা খাটের ওপর পদ্মাসনে বসে। হাতের দুই পাতা দুই হাঁটু ছুঁয়ে মেলে ধরা। নিজে বসেছে শিরদাঁড়া একদম সিধে করে। সঙ্গে সঙ্গে অভিষেকের মনে পড়ল, এইমাত্র সে যখন ভেজানো দরজা

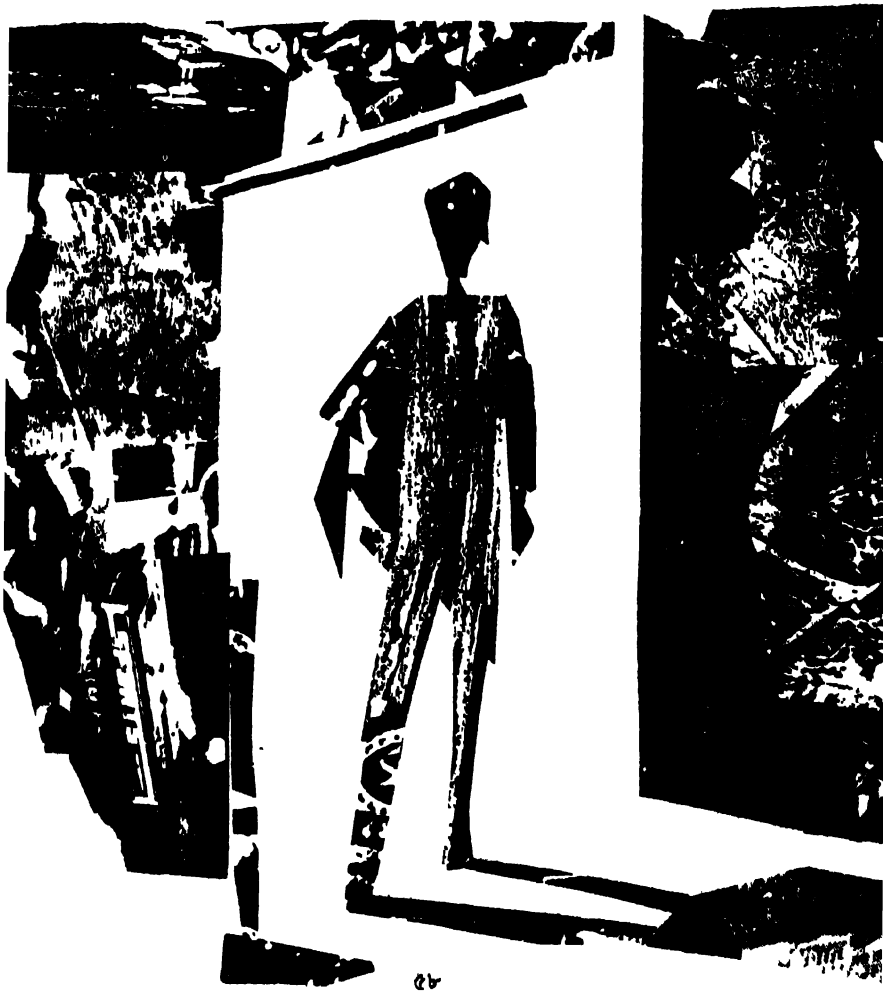

ধাক্কা দিয়ে ঘবে ঢোকে— এই কযেক মিনিট আগে তখন ইরা যেন জিভ বের করে নিজের নাকের ডগা তাই দিয়ে ছুঁতে চাইছিল। চেষ্টা করছিল।

ঘোব কেটে যাওয়া মানুষের গলায়— অভিষেক জানতে চাইল, কী কবছিলে একা একা বলো তো? খালি বাড়িতে বসে।

কী আবাব করব। — বলতে বলতে পদ্মাসন থেকে দুই হাঁটু খুলে নিয়ে ইরা সাধারণভাবে বসল। তারপর বলল, তাঁর কথা ভাবছিলাম। তাঁকে মনে জানতে চাইছিলাম।

কে? তোমাব বাবা?

বাবা কেন হবেন? আমি ভগবানেব কথা ভাবছিলাম। তাঁকে আমার মনে এনে বসাতে চাইছিলাম। কিন্তু কিছুতেই পাবছিলাম না।

তোমার বাবার কোনও খবর এল?

নাঃ! সেই জন্যেই তো ভগবানকে এনে রামদুয়ারে বসাতে চেষ্টা করছিলাম।

রামদুয়ার?

ইরা নিজের দুই ভ্রূর মাঝে ছোট্ট জায়গাটায় একটা টোকা দিয়ে বলল, এখানেই আমাদের মন। এখানেই তাঁর চেয়ার। মন থেকে ঝেঁটিয়ে সব কিছু বের করে দেওয়া খুব কঠিন। একবার মন শূন্য করে নিয়ে মনকে ওখানে বসাতে পারলে নিজের সঙ্গে আমার দেখা হবে। সেই আমিই তিনি। তিনিই চৈতন্য। দেখা হলে জানতে চাইব— আমার বাবা কোথায়? বলে দাও ভগবান আমার বাবা সব কিছু ফেলে দিয়ে কেন নিরসায় গিয়ে পড়ে আছে? নিরসায় তার এত কীসের টান?

হাসি হাসি মুখে অভিষেক তার বউয়ের মুখে তাকাল। স্কুল গোয়িং দুটি ছেলেমেয়ের মা। বসার ভঙ্গি যেন বা কোনও বালিকা বসে আছে। চোখে মুখে সরল বিশ্বাস। প্রায় ষোল বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমি তখন প্রায় ছ'ফুট লম্বা ছিলাম। এখন সেই তুলনায় কিছু কুঁজো হয়ে গেছি। ওজন বেড়ে যাওয়ায় এই দশা। এক্ষুনি শঙ্কু আর চিনি স্কুল থেকে ফিরবে। বাইরে যা গরম। অভিষেক বলল, তোমার রুক্মিণী মা তো বলে দিতে পারেন— আমার শ্বশুরমশাই কোথায়?

বড় বড় কবিরা তো সব লিখে রেখে গেছেন। তবু তুমি লেখ কেন?

ইরার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল— যাতে ফিরে তাকাতে হল অভিষেককে। দালির উপন্যাসখানি খুঁজতে খুঁজতে অভিষেক বলল, কবিতার আত্মাকে— ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না ইরা— বলই না। বেশ বলছিলে। আমি বুঝতে পারব।

কবিতার আত্মাকে সব কবিরই একবার নিজের মত করে খুঁজে বের করতে হয়। সে বড় রহস্যময় খুঁজে বেড়ানো। জেগে থেকে খুঁজি। স্বপ্নে খুঁজি। খোঁজার জন্যে স্বপ্ন তৈরি করে নিয়ে খুঁজি। তোমায় বলতে পারি— স্বপ্ন আর জেগে থাকার ভেতর এ সব ব্যাপার যাতায়াত করে এক এক সময়। তখন স্বপ্নে মনে হয় জেগে আছি। জেগে থেকে ভাবি— স্বপ্ন দেখছি।

এ সব তো কোনও নতুন কথা নয়।

ইরার এ কথায় কেমন অবাক হয়ে গেল অভিষেক। এ কোন গলায় কথা বলছে ইরা?

আমিও তো আমার মত করে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেই আমিই তিনি। আমারই দুই ভ্রূর মাঝখানের বিন্দুতে সেই রামদুয়ারে আমাদের দেখা হবে। মন থেকে সব চিন্তা-ভাবনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবে না মনকে রামদুয়ারে তুলে দিতে পারি। ওখানে ওঠা বড় শক্ত। কবিতার মত কবিতা লিখতে পারলে তোমার যেমন হয়— ঠিক তেমনি। তেমন লেখা হলে তুমি খানিকটা উঠে যাও না? যেন এ জায়গা থেকে আরেকটু অন্য জায়গায়— আরেকটু ওপরে?

মুখে কোনও কথা সরল না অভিষেকের। একটু আগে নিজের বউকে বালিকা মনে হয়েছিল তার। ঠিক যেন আমার মেয়ে চিনির মতই আরেকটি স্কুল গোয়িং গার্ল। এখন ইরাকে তার মনে হল— স্কুল গোয়িং গার্ল। স্কুল গোয়িং জ্ঞানী গার্ল। নতুন বিয়ের পর এই ইরাই আমার প্রথম কবিতার বই ছাপতে হাতের একটা বালা খুলে দিয়েছিল।

ইরার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না অভিষেক। অথচ এক্ষুনি কাল রাতের কবিতাটা খুঁজে পাওয়া দরকার। আসলে দালির উপন্যাসখানি পাওয়া দরকার। তা হলেই কবিতাটা

পাওয়া যাবে। অভিষেক মনে মনে— মনে করার চেষ্টা করল—

একদিন জেগে উঠি অজানা শহরে
নিজ রঙ্গভূমি থেকে হয়েছি ফেরার
মাধুরীকে হত্যা করে এসেছি এখানে
নৌকোয় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হাওয়ার দাপট
এখানে নৌকোও মেলে খুব

মনে মনেই অভিষেক বারবার বলতে লাগল— এখানে নৌকোও মেলে খুব— কী যেন নাম রেখেছি কবিতার— হ্যাঁ। মাধুরীর মুখ।

খাট থেকে নেমে ইরা বলল, কী ভাবছ?

কবিতার লাইনগুলো হারিয়ে ফেলছি। অথচ আজই সন্ধ্যায় বিজন আসবে। ওর কাগজে কবিতাটা দেব ভেবেছি। কিন্তু কোথায় গেল দালির উপন্যাসখানা? ওর একমাত্র ফিল্মের যা গতি হয়েছে— তাই হবে নাকি আমার কবিতার?

কী হয়েছে দালির ফিল্মের?

চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। কোনও চিহ্ন নেই।

কোনও—চিহ্ন—নেই?

নাঃ ইরা। তবে, দালির বন্ধু পিকাসোর ডায়েরিতে সেই ফিল্মের কথা বারবার আছে। তাতে যেটুকু জানা যায়— যেটুকু পাওয়া যায়— শুধু সেই টুকু।

আমার জলজ্যান্ত বাবা যে হারিয়ে গেল— বলতে গিয়ে আর কোনও কথা ফুটল না ইরার মুখে। গলা বুজে এসেছে।

দালির উপন্যাসখানি খোঁজা বন্ধ করে অভিষেক এগিয়ে এল। ইরার কাঁধে হাত রেখে বলল, তিনি হারিয়ে যাননি। নিজের ইচ্ছেয় রয়ে গেছেন— কিংবা কোথাও গেছেন।

কান্না চাপতে চাপতে ইরা বলল, আমার বাবা খুব ভাল ছেলে। যা ভাবে তাই করে—

বলো— ভাল লোক। তিনি আর ছেলেটি নেই। — বলতে বলতে অভিষেক জানলার তাক থেকে বইগুলো পেড়ে ফেলল মেঝেতে।

ইরা কিছু না বলে পাশেই রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানেই সিঙ্কে নাকেমুখে জলের ঝাপটা দিতে সুবিধে পায় ইরা। অভিষেক অস্থির হয়ে পড়ল। সত্তর আশিখানা বইয়ের ছড়ানো টাল। তার ভেতর অনেক বইয়ের পুট ছিঁড়ে গেছে ঘাঁটাঘাঁটিতে। স্বপ্ন নিয়ে দু'খানি বই। ড্রিম। ড্রিম অ্যাণ্ড সিকোয়েন্সেস। কিন্তু কোথায় গেল দালি? 'সালভাদর দালি!' যিনি তাঁর স্বপ্নকে বার বার এঁকেছেন। রঙ দিয়ে। ফিল্মে। উপন্যাসে।

কে বলে, কবিতা আসে?
কবিতার আগে আসে
স্বপ্নের তুলতুলে থাবা,
রুদ্ধশ্বাস বোবা অনিদ্রায়
গেরস্থের ধর্মশীলা হুতুশে মার্জারী
তুলে ধরে তার চিরবিষমাখা নখর।

বইয়ের ওই ঢিবিতে অভিষেক দালিকে পেল না। সে ভীষণ করে কাঁপতে শুরু করেছে ভেতর থেকে। একটি করে লাইন যেন মাথার ভেতরে কোনও মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

মাথায় ধরে রাখা যায় না। এত গরম। বেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটা হবে। বাইরে রীতিমত রোদ। এটা আমারই ফ্ল্যাটবাড়ি। এর ভেতর অভিষেকের নিজেকে ভুতুড়ে লাগল। কেমন যেন ছন্নদশা। ভেতর থেকে জলের তোড় হয়ে কী ফেটে বেরতে চাইছে। তাতে একবার তার ঠোঁট বন্ধ করা মুখ ফটাস ক'রে খুলে গেল। ঠোঁটের দুই কষাড় যেন ছিঁড়ে গিয়ে খুলে যাচ্ছে। অভিষেক বিড় বিড় করে বলতে লাগল—

কবিতা আসে না, তাকে ছুটি দিতে চাইলে সে কি নেবে?
নাকি থেকে থেকে

আধো আলো চান্দ্ররাতে কুহকী ঝোপঝাড় থেকে প্রেতকণ্ঠে শুধুই শাসাবে।

হঠাৎ অভিষেক হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ডটপেন— শঙ্কুর একটা খাতা নিল। নিয়েই এলোমেলো করে লিখতে লাগল। লিখে যেতে থাকল। লাইন বেঁকে যাচ্ছে। ক একদম ব হয়ে যাচ্ছে। তবু। তবু তার ডটপেন থামতে পারল না—

ডনের বালিকা চাই,
এদিকে আয়লো সই, এলাটিন বেলাটিন,
সবিতা, ববিতা!
নগ্ন নর্তকীর দুই বুকে দুই লেলিহান চোখ,
ওষ্ঠে চেপে বসা ললিপপ ;
কাছেই হাতছানি দিচ্ছে পপকর্নশপ।

কোথায় কবিতা, ফুঃ, কোথায় কবিতা! লিখতে লিখতে পাতার শেষে এসে পড়ল অভিষেক। পাশের পাতায় হাত যে উঠে যাবে ডটপেন সমেত— সে জোরটুকুও পেল না অভিষেক।

নাও। ধরো। — বলে চায়ের কাপ ঠক করে মেঝেতে নামিয়ে দিল ইরা। চা খেয়ে আমি চিনিকে আনতে যাব।

না ই বা গেলে। ও তো শঙ্কুর সঙ্গে চলে আসবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে ইরা অভিষেকের কাছাকাছি বসল। একবার চোখ বুজে মনে মনে নিজের দুই ভ্রূর মাঝামাঝি রামদুয়ার দেখতে পাচ্ছে ভাবল। তারপর চোখ খুলে অভিষেকের সামনে খাতায় তাকিয়ে তাকতে থাকতে অভিষেকের কথাগুলো কানে গেল। না আমায় যেতে হবে। আজ শঙ্কুর এক ক্লাস আগে ওর ছুটি। — তারপর খোলা খাতাখানি টেনে নিয়ে বলল, এই তো বেশ লিখছ। মনে পড়েছে হারানো কবিতাটা?

না। এটা এই এল।

নতুন কবিতা তা হলে? কিন্তু হারানোটার কী হবে?

ইরার বড় বড় সরল চোখে তাকিয়ে অভিষেক বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না— এর ভেতর কাল রাতের কবিতাটা মিশে আছে কি না।

এ রকম মিশে থাকে নাকি?

হারানো কবিতা কখনও কখনও নতুন কবিতার সঙ্গে খানিক খানিক মিশে থাকে। সবার নাও থাকে। এখানে আমি ঠিক করে বলতে পারছি না ইরা।

ইরা হঠাৎ অভিষেকের মুখে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা। বাবা কি তা হলে ইচ্ছে করে হারিয়ে গেল? আমাদের এত বড় দেশে নিজেকে কোথায় ইচ্ছে করে হারিয়ে রেখেছে— কে বলবে।

কিন্তু কেন বাবা হারিয়ে যাবে? কীসের দুঃখ ছিল বাবার?

হো হো করে হেসে উঠল অভিষেক। তার চা খাওয়া শেষ। কাপ প্লেট টেবিলে তুলে দিয়ে সে কথা বলতে বলতেই টেবিলের নিচের বইগুলো হাটকাতে লাগল। আর সেই সঙ্গেও বলে উঠল, তা হয় নাকি ইরা! তা কখনও হয়? ইচ্ছে করে কেউ হারিয়ে যেতে পারে না।

হ্যাঁ। হারিয়ে যাওয়া যায়— যদি নিজেকে ভুলে যাওয়া যায়। নিজের কথা যদি কিছুই মনে না থাকে তা হলে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব। নিজের নাম, ধাম, কাম সব ভুলে গেলে হারিয়ে যাওয়া যায়। নয়ত নয়।

নিজেকে ভুলবে কী করে একজন লোক? আমি তো বুঝতে পারছি না।

আমরা ভয় পেয়ে খানিকক্ষণের জন্যে সব ভুলে যাই। তখন প্রাণের ভয়ে শেলটার চাই। সে সময় নিজের নামধাম সব ভুলে যাই। পাগল হয়ে গেলেও তাই হয়। তাই পাগলরা নিজেদের অজান্তে নিজেরাই হারিয়ে বসে আছে। আর বোধহয় সত্যিকারের সাধু হলে আগের সবই খুব সহজে ভুলে যাওয়া যায়।

ইরার এ কথাটা যেন অভিষেকের চোখের সামনে একটা নতুন দরজা খুলে দিল। সে বলল, তবু খাঁটি সাধুরা কিন্তু হারিয়ে যান না। দিনকে দিন তাঁরা নিজের আসলে ফিরে আসেন। ফিরতে থাকেন।

ঘোলাটে, ছন্ন দৃষ্টিতে — বড় বড় চোখ করে ইরা অভিষেকের মুখে তাকাল। নিজের আসল বলে কি কিছু আছে! শুধু এখনটাই দেখতে পাই। তার আগের জন্মে? তারও আগের জন্মে?

অভিষেকের মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। ইরা মেঝেতে বসে পড়ে খুব শান্ত গলায় বলল, বাবা কীসের খোঁজে ওখানে গিয়ে রয়ে গেল। কেন ওখানে গিয়ে হারিয়ে গেল? মাকেই বা অমন চিঠি লিখল কেন?

শ্বশুরমশাই এক কালের জার্নালিস্ট। তিনি হারিয়ে যাবার মানুষ নন। জার্নালিস্ট কখনও নিজের নাম-ধাম ভুলতে পারে না ইরা। তাই হারিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অভিষেকের সব কথা ইরা শুনল কিনা বোঝা গেল না। সে নিজে নিজেই বলতে থাকল। বাবা শুধু জার্নালিস্ট নয়। জানো— একসময়— বাবা কবিতা লিখত।

কবিতা?

হ্যাঁ। আমি ছোট থাকতে দেখেছি। দু-একটা গল্পও ছাপা হয়েছিল বাবার।

এ সব কথা তো কোনওদিন বলনি।

ইরা নিজের থেকেই বলতে থাকল। আমার সব সময়েই মনে হয়েছে— বাবা কিছুটা পাগল। কিছুটা সাধু। তাই হয়ত তার নিজের কথা সব ভুলে গিয়ে একেবারেই হারিয়ে গেছে।

৯

অজয় আর দামোদরের মাঝখানে লম্বা-ফালি মাইল কে মাইল এই টানা জমিজায়গার নিচে কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে গাছের পর গাছ মাটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর ওলোটপালটের সে সময়টা খনি বিশারদরা হিসেব কষে বের করেছেন। কালের হিসেবে তা এতই আগের — ভাবতে গিয়ে রজত পালিত কোনও থই পায় না।

ওপেন কাস্ট খনির কয়লা খুঁড়ে নেওয়া ফাঁকা বুকে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে খনির চাকা লাগানো কপিকলের চালক অন্ধকার আকাশে ঠেলে উঠে আছে। তাতে ওই আগুনের আলো। মারুতি জিপসির ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে রজতের মনে হল — অন্ধকারে সারা পৃথিবীতে আগুন ধরে গেছে। তার ভেতর দিয়ে কোনও রকমে গাড়িটা পথ করে এগোচ্ছে। তার জাপানি ইঞ্জিনটা রাগে গরগর করছে।

অ্যাম্বুলেন্স বানিয়ে নেওয়া গাড়িটার ভেতরে কাঠের বাক্সে চাঁই চাঁই বরফের ভেতর রামটহল শুয়ে। তার একপাশে মোতিয়া দুসাদ। আরেক পাশে চামেলী দুসাদ। তারাও শুয়ে। গাড়ি একাত ওকাত হচ্ছে মাঝে মাঝে। রাস্তার জন্যে।

জিপসির জানলার কাচ সরিয়ে দেওয়ায় গাড়ির অন্ধকার ভেতরটায় হাওয়ার ঝাপটা। এইভাবেই নিরসা খনি তাদের লাশের রিস্তেদারদের ডেডবডি সমেত যার যার দেশের গাঁয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যে যার দেশের বাড়িতে গিয়ে পোড়াও। ভাল করে সৎকার কর। টাকার অভাব নেই। যাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। ফিরে এলেই চাকরি। যদি ফিরতে না চাও — দেশে বসেই পেনশন পাবে। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? কিন্তু লাশ নিয়ে ঝুটমুট কোনও ঝামেলা পাকানো চলবে না। একজন যে চিরকালের মত চলে গেল — সেটা মেনে নাও। দোষ কার? তার বিচার হবে পরে। আগে খনি-পাতালে আগুন নিভুক। তারপর দেখা হবে— কেবল খারাপ ছিল কিনা? কিংবা আগে থেকেই কার্বন মনোক্সাইড জমা হয়েছিল কিনা ওখানে — যা যাচাই হবে পরে। আগুন নিভিয়ে বন্ধ খনি ঠাণ্ডা করে তবে চালু করা হবে। করতেই হবে। প্রায় দু'হাজার লোকের ভাত-রুটির জায়গা এটা।

গাড়ির হেডলাইটের আলো গিয়ে পড়ছে রাস্তার গায়ে দাঁড়ানো পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার গুঁড়িতে। একটা মহুয়া গাছতলায় দু'টি মোষ গম্ভীর হয়ে দাঁড়ানো। রজত লক্ষ্য করে দেখেছে — এদিকে মহিষের জাবে মহুয়া ফল মিশিয়ে দেওয়া হয়। দিনের বেলায় এসব জায়গায় ছাগল চরে। কোথাও কোথাও ওপেন কাস্ট খনির ফাঁকা বুকে বর্ষার জল জমে এখনও এখানে-সেখানে দিঘি-বিল-বাঁওড়ের চেহারা।

মাঝে মাঝে আলো-ঝলমল লাক্সারি বাস গান বাজিয়ে জি টি রোডের দিকে চলেছে। চামেলী কি গুনগুন করে গাইছে? না, কাঁদছে? তার পাশেই স্বামীর বরফচাপা ডেডবডি। কাঁদতেও পারে। ড্যাশবোর্ডে একটা নীল কাঁটা কেঁপে কেঁপে কিলোমিটার দেখাচ্ছে।

নিয়ামতপুরের মোড় পেছনে ফেলে রানীতলায় আসতেই একপাল মেয়ে রজতদের গাড়িটা ছেঁকে ধরল। ড্রাইভার বলল, ইয়ে রেন্ডিমহল্লা সাহাব। আগাড়ি লরিওয়ালোকো ধাবা। কুছু খাবেন?

নেহি।

ঘুমিয়েপড়া চামেলী উঠে বসে জানতে চাইল, ক্যা হুয়া বাবুজি?

কুছ নেহি। লেট যাও।

এ সব আওরাতিয়া কাহানি?

ক্যা মালুম। লেট যাও।

ড্রাইভার জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। পেছনে পড়ে থাকা মেয়েগুলো ধাবার চেরা আলোয় হি হি করে হেসে উঠল। সে হাসি শুনে শুয়ে পড়া চামেলী যেন কেঁপে কেঁপে উঠল।

সন্ধ্যে রাতে মোতিয়া দুসাদ তের নম্বর ধাওড়ার কোয়ার্টারের তালাচাবি ঝোলাবার আগে ঘুঁটের আঁচে মুচমুচে করে লিট্টি পুড়িয়েছিল। লাল আটার ভেতরে ভাজা ভাজা কুঁদরির পুর। তাই দু'খানি আর এক লোটা ডিপ টিউবওয়েলের জল। ব্যস। খিদের কোনও বালাই নেই।

ড্রাইভারকে রজত বলল, সারে রাত ছুটকারি করকে হামলোগ যিতনে সফর করপায়ে উতনেহি আচ্ছা।

হ্যাঁ যাব। দিনমে ধূপ বড়ি কড়াসা—

তাই কোথাও থামার ইচ্ছে নেই রজতের। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এখন যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। তারপর তো সারাটা দিন সামনেই পড়ে আছে। তার ওপর সঙ্গে এতগুলো টাকা রয়েছে। কোথাও থামা একদম ঠিক হবে না।

গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। হেডলাইটের আলোর বাইরে সবসময় খানিকটা করে রাস্তা থেকে যায়। ফুরোবার কোনও নাম নেই। যতই এগোয়—ততই রাস্তা। হঠাৎ মোতিয়া দুসাদ খুনখুনে গলায় কেঁদে উঠল, মেরি রামটহলিয়া রে — অব্ কভি নেহি আওবে —

আকাশের নিচে বিশাল অন্ধকারের চাপে গাড়িটা না থেঁতলে গুঁড়িয়ে যায়। তার ভেতর কেঁদে ওঠা 'রামটহলিয়া' ডাকটা সুপারফাইন মিহি হয়ে বাতাসে মিশে গেল।

কোনও কথা না বলে ঘুরে বসে রজত পালিত তার ডান হাতখানি মোতিয়ার মাথায় রাখল। মোতিয়া তার চেয়ে ছোট হতে পারে। বড়ও হতে পারে। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সে বলল, সব ঠিক হো যায়ে গা --

মোতিয়া দুসাদ রুখে একদম উঠে বসল, ক্যা ঠিক হো যায়েগা বাবুজি? মেরি বেটা তো কভি নেহি লওটেগা। নিরসা ফিন চালু হোগা। লেকিন রামটহল কভি নেহি আয়েগা। মেরা আউর কৌন হ্যায়?

কিঁউ! চামেলী হ্যায়।

রজত দেখল চামেলী চোখ খুলে তাকিয়ে আছে। সে শুয়ে শুয়ে তার শাশুড়িকে দেখছে। তার চোখে ঘুম নেই। কান্না নেই। শুধু জেগে থাকা আছে। যেমন গাড়িটার কপালে আছে শুধুই দৌড়নো।

সবার অজান্তে গাড়ি ওদের নিয়ে বরাকরের ওপর ব্রিজ দিয়ে নদীটা পেরিয়ে এল। ড্রাইভার শুধু একবার বলল, বেগুলিয়া —

বেগুলিয়া কি ব্রিজটার নাম? না, জায়গার নাম? এপারে খানিক এসে এক জায়গায় এক দোকানঘরের মাথায় ইংরেজি সাইনবোর্ডে রজত দেখল — লেখা আছে চিরকুণ্ডা। এই তাহলে চিরকুণ্ডা। জায়গাটা দেখা হয়ে গেল। অবশ্য সারা চিরকুণ্ডা এখন ঘুমোচ্ছে। এবার যতই গাড়ি এগোয়, ততই রাস্তার দু'ধারে জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে।

একসময় রামটহলের কাঠের বাক্সটা পেরিয়ে মোতিয়া চামেলীর মাথায় হাত রাখল। নিদ

যা চামেলী — নিদ যা —

চামেলী কোন কথা বলল না। গাড়ির ভেতরের ফিকে আলোয় সে চোখ চেয়েই থাকল।

ভুখ্ লাগি? কুছ খাওগি?

শাশুড়ির এ কথায় কোনও জবাব দিল না চামেলী।

পিয়াসি হো? পানি পিওগি?

এবারও কোনও জবাব দিল না চামেলী।

সামনের সিটে বসে রজত মনে মনে বলল, এই ভাল। শাশুড়ি-বউয়ে কথা হোক। তাহলে দু'জনেই কিছু হাল্কা হবে। দু'জনেই খানিকটা করে জুড়োবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ পেছন থেকে কোনও কথা শুনতে না পেয়ে রজত ঘুরে তাকাল। মোতিয়া বসে। চোখে জল। বয়সে ভাঙা মুখখানি তার এখন সে দেখতে পেল। রামটহলের বাক্সের ওপারে চামেলী সেইভাবেই শুয়ে। তার খোলা দুই চোখের জল একহাতে গড়িয়ে পড়ছে। গাড়ির বাইরে অন্ধকার। মাঝে মধ্যে উল্টোদিক থেকে হেডলাইট জ্বালানো লরি নয়ত বাস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। জি টি রোড মানেই স্পিড্।

গোবিন্দপুর ফাঁড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, বাঁয়ে ধানবাদ। ঝরিয়া এরিয়া সাহাব—

আকাশের ঘন কালো ঘোর একটু একটু কাটছে। রজত পালিত বলল, হামলোগ তো সিধা যায়েঙ্গে —

হাঁ সাহাব।

হাত-ঘড়িতে পৌনে চারটে নাগাদ রজত লক্ষ্য করল, অন্ধকার ফিকে হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের খানিক জুড়ে কালোমত ঢিবি। সেদিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইল, কাঁহা আয়া?

ওঁহা পাহাড় হ্যায় সাহাব। তোপচাঁচি আউর ছে কিলোমিটার। গাড়ি যতই এগোয় উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে ততই কালো রঙের পাহাড় জেগে ওঠে। দু'পাশের জঙ্গল বেশ ঘন। সুখী বাতাসে গাছপালার গা থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। শেষ রাতের বাতাস কিছু ঠাণ্ডা হয়। মোতিয়া দুসাদ পেছন থেকে রজত পালিতের পিঠে হাত রাখল। রজত তো অবাক। সে হাসিমুখে পেছন ফিরে তাকাল। কা মোতিয়া? কুছ বলবনি? — মোতিয়ার কাছাকাছি হবার জন্যে — কলকাতার বাঙালিবাবুকে ঘিরে যে দ্বিধা, তা কাটিয়ে দিতেই রজত খুব অন্তরঙ্গ হয়ে জানতে চায়। বলিয়ে না কেয়া বাত?

অ্যায়সাহি। বড়ে কোহি বাত নেহি। সিরিফ এক ছোটিমোটি বাত বাবুজি।

ওদের কথা-বার্তার ভেতরেই রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে একটা পাখি ডেকে উঠল। অজানা পাখির অজানা ডাক।

বোল দিজিয়ে —

বাবুজি। আপ তো বিন বুলায়ে মেহমান হামারি।

সো তো সহি। পরশু রোজ ভি ম্যায় আপলোগোকো হিসাবসে এক আজনবি ইনসান হুঁ। মেরে বারে মে আপকি কোই পতা হি নেহি থা।

বাবুজি। আজ ভি ম্যায় আপকে বারে কুছ নেহি জানতি। — বলে খানিক লজ্জায় মাথা নিচু করল মোতিয়া দুসাদ। হিন্দিটা তত রপ্ত নয় বলে রজত কখনও কখনও মোতিয়া দুসাদকে আপ বলে ফেলছে।

মোতিয়া আবছা অন্ধকারে মাথা তুলল। লেকিন বাবুজি। আভি তো আপ রিস্তেদারোসে বড়ি রিস্তেদার।

আসলি বাত বোলো মোতিয়া —

রামটহলকা বাপুজিকা টেইম পর বাজা হুয়া থা —

টেইম? কিস টাইমকা বারে মে বোলতি হুঁ?

রামটহলকা বাপুজি যব চলবসে — তব তো ব্যাণ্ড বাজা, ফালানা ফালানা সবকিছু হুয়া থা। সারে জেন্দাহা গাঁওকি সবলোক গণ্ডক শমশান মে সামিল হুয়ে —

জেন্দাহা গাঁও মোতিয়া দুসাদের স্বামীর দেশ। রামটহলদের বাড়ি। চামেলীর শ্বশুরাল। গাঁও জেন্দাহা। জিলা : হাজিপুর। এই ক'দিনে এই দুই আওরতের মুখে রজত বহুবার জেন্দাহা গাঁওয়ের নামটি শুনেছে।

কেয়া চাহতি হুঁ। রুপৈয়া তো কুছ কম নেহি মোতিয়া।

রামটহলকা মুর্দা লেকর যব গণ্ডক শমশানপর সারে জেন্দাহা হাজির হোগে — উস্ বখত্ ব্যাণ্ড বাজা চাহিয়ে —

নেহি। নে-হি-ই-বলে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠে বসল চামেলী। কভি নেহি। কভি নেহি—

মোতিয়া দুসাদ তো বটেই — রজত পালিতও ঘাবড়ে গিয়ে চামেলীর দিকে ঘুরে বসল। ড্রাইভার এই চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে ব্রেক কষল। সেই ঝাঁকুনিতে গাড়ির সবাই খানিক চলকে টলকে গেল।

মোতিয়ার মুখে কোনও কথা নেই। চামেলীরও তাই। সামনেই তোপচাঁচির আকাশ জুড়ে কালচে পাহাড়ের ঢিবি। বাতাসে সামান্য শীত। এখনও মানুষজন জেগে ওঠেনি।

কেয়া হুয়া চামেলী?

চামেলী কোনও জবাব দিল না।

ফের জানতে চাইল রজত, কেয়া বোলনা চাহাতি হো?

মুখে রাগের ভাব। চোখে জলের ফোঁটা। চারদিকে এখন ভোর হয় হয়। জি টি রোডের ওপর চায়ের চটিগুলো জেগে উঠেছে। এক এক করে। ভোরের আকাশে অসময়ের মেঘ। ঘরবাড়ি দোকানপাটের বাইরেই পাখির ডাক। কিচিরমিচির।

মেরি যো গ্যয়ি তো সো গ্যয়ি। উহ্-বারা হাজার রুপৈয়া মেরি। মেরি সহিসে রুপৈয়া নিকালা।

মোতিয়া দুসাদ এবার তেজে ফেটে পড়ল। হাঁ হাঁ উহ্ রুপৈয়া তেরি হি! লেকিন রামটহল কিসকি? কিসকি বেটা রামটহল? তেরি?

নেহি। উহ্-মেরি মরদ। আভি মুরদা। লেকিন মেরি মরদ। উসকো লাশ লেকর শমশান পর ব্যাণ্ড বাজানা — সারে জেন্দাহা গাঁওকো লেক্র জুলুস নিকালনা — সারে জেন্দাহাকো শমশানমে হাজির করকে ফুর্তি মাচানা — এ নেহি চলেগি। কভি নেহি চলেগি।

রজত দেখল, মোতিয়া দুসাদের মুখখানি কালো হয়ে গেল। ছেলে তার। সেই ছেলে বাবদে বারো হাজার টাকা। কিন্তু টাকাটায় শুধু চামেলীরই হক। কেননা সে যে রামটহলের আওরত। আজিবসি কানুন। মনে মনে একথা আওড়ে নিয়ে মোতিয়া দুসাদ অনেক কষ্টে বলল, ইয়ে ফুর্তি

মাচানা নেহি চামেলী। মুর্দাকো সাথ সাথ ব্যান্ড বাজানা ইয়ে দুসাদ টোলাকি রীতি অউর রিওয়াজ! রামটহলকা বাপকি টেইমপর অ্যায়সাহি হুয়া থা —

ড্রাইভার এগোবে কি না বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে। রজত তাকে চোখের ইশারায় স্টার্ট নিতে বলল।

ঠিক এই সময় চামেলী প্রায় ককিয়ে উঠল, বাবুজি। কেয়া ম্যায় সামনামে বৈঠ সাকতি? জায়গা হোগি?

কিঁউ নেহি। কিঁউ নেহি। ম্যায় থোড়া থাকা হুঁ। পিছাড়ি যাকে লেট যাউঙ্গা। — বলতে বলতে রজত বুঝল, সত্যিই তার খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।

মোতিয়া দুসাদ চামেলীর কথায় রীতিমত অবাক হল। বেশরম! বদচলন! বাবুজি কো উঠাকে ওহিপর বৈঠনা চাহাতি। তু কেয়া রে চামেলী? তু কেয়া?

উঠে বসে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করল। করেও পারল না। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলতে গেল। সেই সময় চামেলী ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, ম্যায় চামেলী। সিরিফ চামেলী। মুর্দা কা পাশ লেট যানা, নেহি আতি মেরি।

মোতিয়া তেরিয়া হয়ে বলে উঠল, ই ক্যায়সি আদত? ই ক্যায়সি আদত!

ততক্ষণে চামেলী, রজত পালিত — দু'জনই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। চামেলী গিয়ে বসল সামনের সিটে। ভোর এসে গেছে। রজত এসে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল চামেলীর জায়গায়। ঘুম তখন তার চোখ ফুটো করে ঢুকে পড়েছে। রজতের খেয়ালও থাকল না — তার পাশেই কাঠের বাক্সে বরফ গায়ে দিয়ে রামটহল দুসাদ শুয়ে আছে।

গাড়িতে ওঠার আগে ড্রাইভার দেখল — রাস্তার পাশে দেহাতী ছোকরারা ক্ষেত থেকে তুলে আনা সবুজ ছোলা ডালা সাজিয়ে বসেছে। নেবে কি না ভাবছে ড্রাইভার। নুন মাখানো কচি ছোলা। সঙ্গে হরা মরিচ এক কামড়।

ঠিক এইসময় চামেলী এক ছোকরাকে ডেকে বসল। এক রুপেয়াকো দো —

রামটহলের ডেডবডির বাঁ পাশে বসে থাকা মোতিয়া দুসাদ ফের বিড়বিড় করে বলে উঠল, এ ক্যায়সি আদত? ঘরকি বহুকা এ ক্যায়সি আদত?

কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই চামেলীর। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে জানলা দিয়ে রাস্তার দু'ধারে সবে ফুটে ওঠা পৃথিবী সে কচি ছোলা চিবোতে চিবোতে চোখ ভরে দেখে চলেছে। বড় বড় গাছ। কাঁটা লতা। তার ওপর মুনিয়া পাখির ঝাঁক। ভোরের প্রথম রোদ্দুরে জঙ্গল এফোঁড়-ওফোঁড়। চামেলী ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না—সবই কেন অ্যাতো ভাল লাগছে। তার হাতের হাড় আর চামড়ার মাঝখান দিয়ে এক অজানা আহ্লাদ ঢেউ তুলে যাতায়াত করছে যেন। সে আহ্লাদ যখন যায়—তখন কবজি থেকে কনুই অবধি হাত কী একভাবে পাথর একদম।

মোতিয়ার মুখে কোনও কথা ফুটছে না। চামেলী তো এমন ছিল না কোনওদিন। আজ এ কী হল চামেলীর। রামটহল চলবসে তো চামেলী বদল চুকে। মাথাটা খারাপ হয়ে যায়নি তো। বাবুজি যে ঘুমিয়ে পড়ল।

তোপচাঁচি ফেলে গাড়ি ঈশারী বাজারে এসে গেল। পথে কয়েকটা সরু সরু নদী পড়েছিল। সব ক'টাকেই সামনের সিটে বসে দেখেছে চামেলী। এখন চড়চড় করে রোদ উঠছে। আর অগুনতি লরি। যাতায়াত করছে তো করছেই। নিরসায় এমন ঘন ঘন লরি—চারদিকে লোকজন, দোকানপাট চামেলী দেখেনি কখনও।

বেলা দশটা নাগাদ ঘুম ভেঙে উঠে বসল রজত। গাড়ি তখন বরহী মোড় থেকে জি টি রোড পেছনে ফেলে কোডারমার রাস্তা ধরছে। জানলা দিয়ে মাইলফলক চোখে পড়ল রজতের। জিরো মাইল—জি টি রোড। সাদা চুনের ওপর আলকাতরা রঙে লেখা।

মাঠঘাট আকাশ জুড়ে একটা খ্যাপা রোদ। দোকানপাট, ঘরবাড়ি পেরতেই জঙ্গলের ভেতর থেকে টিলা জেগে আছে। রজত দেখল জায়গায় জায়গায়—রাস্তার কাছাকাছি জঙ্গলের ভেতর কেমন চিকচিক করছে। যেন বা সেসব জায়গায় রোদ পড়েই আয়নার মত ফেরত আসছে।

কী ব্যাপার?—বলেই রজত পালিত ধড়মড় করে উঠে বসল। সঙ্গে হাতব্যাগ। তাতে রামটহলের সৎকারের বারো হাজার টাকা। সামলে-সুমলে বসেই সে ফের বলে উঠল, কী ব্যাপার? একদম ঝকঝক করছে মাঝে মাঝে?

ড্রাইভার ছোট করে হো হো হাসল। তারপর স্টিয়ারিংয়ে দু'হাত রেখে বলল, এটা সাহাব মাইকা মাইন মহল্লা। মিট্টিমে ইধার উধার মাইকা টুকরা পড়ে হ্যায়।

হঠাৎ মোতিয়া দুসাদ বলে উঠল, বাবুজি। বাকসা কিঁউ ভিগ গিয়া?

খেয়াল হয়নি রজতের এতক্ষণ। এবার সে ভাল করে দেখল। সাত তাড়াতাড়িতে কাঁচা সেগুনের বাক্স বানিয়ে তাতে বরফচাঁই পেতে রামটহলকে শোয়ানো হয়েছে। শুইয়ে পাশে-ওপরে-সবদিকে সাইজমত বরফচাঁই বসানো। ফাঁকে ফোকরে স'মিলের কাঠের গুঁড়ো ঠেসে দেওয়া। কিন্তু বাক্সের নিচের দিকটা যে ভিজে উঠেছে। বাইরে থেকে বাক্সের গা যেন ঘেমে ওঠা।

তাই তো।—বলেই মনে মনে রজত বলল, চড়া রোদে বরফ গলতে শুরু করেনি তো? তাহলে তো কেলেঙ্কারি। এখনও অর্ধেকের বেশি রাস্তা বাকি।

ড্রাইভার—

জি সাহাব—

গাড়ি রোকো।

গাড়ি থামল। বাক্সের পায়ের কাছে দু'বস্তা কাঠগুঁড়ো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রজত পালিত ডাবায় করে সেই গুঁড়ো তুলছে দেখে মোতিয়া চেঁচিয়ে বলল, এই চামেলী। তেরি মরদকো বাকসা খোল। বাবুজি মেহনত কর রহা হ্যায়—

চামেলী কোনও জবাবই দিল না গোড়ায়। একাজে ড্রাইভার হাত লাগাবে না কিছুতেই। যাদের মুর্দা—যাদের লাশ—তারাই হাত লাগাক—এমন একটা ভঙ্গি করে মাঝবয়সী মানুষটি গাড়ির খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। খোলা প্রান্তর উঁচু নিচু ডাঙা জায়গা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে রোদে পুড়ছে। মহুয়া গাছতলায় কার ঘোড়া বাঁধা। চামেলীর যেন এসবে কোনও যোগই নেই। সে মন দিয়ে আশপাশের মাঠ দেখছে।

মোতিয়া ফের চেঁচিয়ে উঠল, কেয়ারে চামেলী? বাবুজি মেহনত করতে রহঙ্গে? আ ইধার। বাক্সাকো ডালা খোল দে—তেরাহি মরদ—তেরিকো ডালি খুলনা চাহিয়ে—

পেছনে না তাকিয়েই চামেলী ঝামরে উঠল। ম্যায় নেহি সাকুঙ্গি। তেরি বেটাকো লাশ—তেরিকো দেখনা চাহিয়ে—

চোখ ফেটে জল এসে গেল মোতিয়া দুসাদের। একথা সত্যি—এ লাশ তারই ছেলের লাশ। কিন্তু তাহলে রীতি রেওয়াজ মত গণ্ডক শ্মশানে রামটহলের লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার বাপদাদাদের মতই ব্যান্ড বাজিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথায় ফুর্তির খোঁটাটা দেওয়া কেন? আইন

মোতাবেক সৎকারের ওই সরকারি বারো হাজার টাকার তুই মালকিন বলে?

বাইরে গরম। গাড়ির ভেতর তো আরও গরম। শুধু কাঁচা কাঠের বাক্সর গা ভেতরের বরফ খানিক গলে যাওয়ায় ঠাণ্ডা। মাথা উঁচু করতে পারছে না রজত। তাহলে সিলিংয়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যাবে। কাঠের গুঁড়ো বোঝাই ডাবা হাতে সে মোতিয়াকে বলল, রহনে দেও। ডালা খোলনা চাহিয়ে আভি—

মোতিয়া দুসাদই ডালার এক পাল্লা তুলল। বরফ-ঢাকা রামটহলের শুধু কপালের খানিকটা উঁকি দিচ্ছে। খাওয়া-খাওয়া-পোড়া মত। কোনওদিকে না তাকিয়ে সেখানেই পরপর দু ডাবা কাঠগুঁড়ো ঢেলে দিল রজত পালিত। তারপর যেখানেই বরফ গলে গর্ত মত হয়েছে—সেখানেই রজত ডাবায় করে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে লাগল। তার সারা গা ঘামে নেয়ে গেছে। গাড়ি চললে তবু হাওয়ার একটা ছোঁয়া পাওয়া যায়।

হঠাৎ চামেলী চেঁচিয়ে উঠল। মাই-ই গ—কি হল? বলে রজত তাকাল। তাকিয়ে চুপ করে গেল। কোত্থেকে একটা হাড়গিলে শকুন এসে হাজির। গাড়ি থেকে দূরে—আনাড়ি পায়ে রাস্তার গা ধরে চলেছে। গাড়িটাকে নজরে রেখে—একদম পাশে পাশে। কখন থেকে ফলো করছে কে জানে? খবরই বা পেল কোত্থেকে? শান্ত গলায় মোতিয়াকে বলল, ডালা বন্ধ কর।

১০

ছিঃ ছিঃ! আমায় প্রণাম করছেন কেন?—বলে কয়েক পা পিছিয়ে এল যে মানুষটি—তাকে এখন ভোররাতের আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দেশপ্রিয় পার্কের ভেতরটা কয়েকটা নিওন আলোর স্ট্যান্ড সবটা আলো করতে পারেনি। পার্কের বাইরে ভোররাতের ফার্স্ট বাস ল্যান্সডাউন রোড ধরে বাঁক নিল। পার্কের ভেতর মর্নিংওয়াকারের দল রীতিমত ঘাম ঝরিয়ে হেঁটে চলেছে। তাদের ভেতর দুই মহিলা—আবছা অন্ধকারে তাদের বয়স বুঝতে পারল না সুদেব ভৌমিক—একজনের চোখে চশমা—দু'জনই ঝুঁকে পড়ে মর্নিংওয়াকের কেডসে ঢাকা সুদেবের পা খুঁজছে। প্রণাম করবে।

এ কী করছেন? অ্যাঁ?—বলে অনেকটা পিছিয়ে এসেও সুদেব নিস্তার পেল না।

আহা! একটু দাঁড়ান আপনি। আপনাকে প্রণাম করব না তো কাকে করব?

ছিঃ ছিঃ!—বলে প্রায় লাফিয়ে উঠল সুদেব। তার চওড়া কাঁধ, ঠেলে-ওঠা গলা—সারা গা হাঁটতে হাঁটতে ঘেমে উঠেছে। এই সময়টায় নিজের শরীরকে একটা সাইকেলের মত লাগে। যেন প্যাডেল করলেই সে ফুর ফুর করে পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলে যাবে। জল বা সাইকেল যেমন যায়।

এখন ঘাসে বিশেষ শিশির পড়ে না। ফাল্গুন চলে যেতেই ভোররাতের দিকে কিছু কোকিল সাজানো বাড়িঘরের গাছপালায় এসে জোটে। গান গায় বা চেঁচায়। এই সময়টা সারাদিনের ভেতর সবচেয়ে ভাল লাগে সুদেবের।

আর ঠিক এই সময়টাতেই! সুদেব লাফিয়ে ওঠাতে মহিলা দুজন একটুও ভড়কালো না। এবার সে ওদের ভাল করে দেখতে পেল। একজন এই বছর চল্লিশ—তার চেয়ে চার-পাঁচ

বছরের বড়ই হবে। তারই চোখে চশমা। মাথাটি বয়েজ কাট। বোধহয় অফিস-কাছারি করেন। অন্যজন কম করেও বত্রিশ-তেত্রিশ। তার ডান হাতে কালো ডায়ালের বড়সড় পুরুষালি ঘড়ি। কাঁধে এলোখোঁপা ভেঙে পড়েছে। দুজনই পরেছে হালকা আকাশী নীল শাড়ি। পায়ে কালো সোয়েডের ওয়াকমাস্টার।

আশপাশের হাঁটিয়েরা সাঁই সাঁই করে চলে যাচ্ছে। সবাই চায়—তাজা থাকি। শরীরটা চাবুক হয়ে উঠুক। খানিক বাদে প্রিয়া সিনেমা হলের পেছন থেকে লাল করে সূর্য উঠে আসবে। চশমা চোখে এগিয়ে এসে বলল, আমি চিত্রা কর। দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজে ফিজিক্স পড়াই—

এ কথায় আরও অবাক হল সুদেব। মনে মনে বলল, তাতে আমার কী?

চিত্রার পাশের মেয়েটি খুব সুন্দর করে হেসে বলল, আমি ঋতু বসু। ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট। আমরা দুজনই একই জায়গায় থাকি।

এসব কথায় আমার কী যোগ?—ভেবেও বের করতে পারল না সুদেব ভৌমিক। সে শুধু বলতে পারল, তাই—?

ঋতু সুদেবের চেয়ে বছর দু-তিনের ছোটই হবে। ম্যানেজমেন্টের মেয়ে—বেশ তুখোড়-তুখোড় ভাব। আসলে দুজনই ওয়ার্কিং গার্ল—চেহারায়, পোশাকে, কথাবার্তায় দুনিয়াদারির ভঙ্গিটা বেরিয়ে পড়েছে। যাকে বলে ম্যান অব দ্যা ওয়ার্ল্ড। থুড়ি! ওম্যান অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড। স্বচ্ছন্দ। কোনও মিনমিনে ভাব নেই কথাবার্তায়। একজন কলেজে ফিজিক্স পড়ায়। অন্যজন ম্যানেজমেন্টে শলাপরামর্শ দেয়। সুদেব ভৌমিক ওদের সামনে থ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী বলবে?

অন্ধকার এবার ফিকে হবে হবে। চিত্রা বলল, গার্লস স্কুলের ডান পাশেই যে দোতলা বাড়িটা দেখছেন—

সুদেব চোখ তুলে দেখল। কালীধন স্কুলের গায়ে সেকেলে একটা বাড়ি। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে—ইদানীং কলি ফিরিয়ে বাড়িটার ভোল পাল্টানো চলছে।

ঋতু বলল, ওই সরকারি ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে আমরা থাকি। চিত্রাদি আমার রুমমেট।

চিত্রা করকে সুদেবের মনে হল, রীতিমত ফর্সা। ভোরের আলো ফুটলে বোঝা যাবে—কতটা ফর্সা। চিত্রা বলল, আসলে আমিই ঋতুর রুমমেট। আমি অনেক পরে এসেছি এখানে। ঋতু আছে ওখানে প্রায় ছ' বছর।

এসব কথা আমাকে গায়ে পড়ে বলা কেন? মনে মনে এ কথা আউড়ে নিয়ে সুদেব ফস করে বলেই বসল, আমাকে আপনারা চেনেন?

চিত্রা কর প্রায় আগেকার মাসি-পিসির মত জিভ কেটে বলে উঠল, ও মা! তা চিনব না কেন? আপনি এস ভৌমিক। ইঞ্জিনিয়ার। ইস্টার্ন রেলের ওয়ার্কশপে আছেন।

সে তো আমাদের বাড়ির গায়ে আমার নেমপ্লেটে লেখাই আছে সব।

ঋতু বসু বলে উঠল, আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার নেমপ্লেট পড়ে মুখস্থ করিনি কিন্তু। আমরা যে আপনাদের বাড়িতে যাই।

সুদেব মনে মনে বলল, সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি। নইলে কি প্রণামের এত ঘটা থাকত!

চিত্রা কর বলল, আপনি মহাভাগ্যবান। নয়ত অমন মহাসাধিকার স্বামী হয়ে কেউ জন্মায়?

মাফ করবেন। আমার কথায় কোনও দোষ ধরবেন না।

না, না। দোষ ধরব কেন?

আমি কারও স্বামী হয়ে জন্মায়নি। আর পাঁচজন মায়ের ছেলের মতই মায়ের ছেলে হয়ে জন্মেছিলাম।

ঋতু বসু গম্ভীর হয়ে বলল, সে তো বটেই। সে তো বটেই। তবে কি না এটা তো স্বীকার করতেই হয়—মায়ের ছেলেদের ভেতর কোটিতে ক'জনের জগজ্জনীর সঙ্গে বিয়ে হয় বলুন?—বলতে বলতে ঋতু বসু প্রথমে—তার দেখাদেখি চিত্রা করও একরকম গদগদ হয়ে সুদেবকে ফের প্রণাম করবে বলে একসঙ্গে দু'জনই এগিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

এবারও সুদেব ভৌমিক যেন কোনও ছোবল খেয়ে লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে এল। কী হচ্ছে শুনি? আপনারা দু'জনই না রীতিমত শিক্ষিতা। হায়ার এডুকেশন পেয়ে এ আপনাদের কী দশা? ছিঃ ছিঃ!

সুদেবের গলায় ছিঃ! ছিঃ! সকালের বাতাস কেটে রীতিমত ভারি জিনিসের মতই মাঠের ঘাসে গিয়ে পড়ল। সুদেব নিজেও তার গলার ঝাঁজ টের পেল। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, তার এ সব কথায় চিত্রা কর কিংবা ঋতু বসু—কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। দু'জনই বেশ ভাবে ভাসা চোখে তার মুখে তাকিয়ে। চোখের পলক না ফেলে। ভোর হচ্ছে এখন খুব তাড়াতাড়ি। সুদেবের মনে হল—ওরা দু'জন যেন এমন ভাবেই তার মুখে তাকিয়ে—যাতে মনে হতে পারে সে—মানে সুদেব ভৌমিক এখনই এমন কিছু করে বসবে—যা কিনা শুধু অবতাররাই করে থাকেন—শর্টে যার নাম লীলা।

সুদেব একবার ভাবল—তার মুখের দিকে এমন তাকিয়ে থাকা এই দু'জনের ছন্নদশা চোখের একটানা চেয়ে থাকার অদৃশ্য সুতোটা ছিঁড়ে দিতে সে ওদের আর তার মাঝখানে হাত নেড়ে সব ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

ঋতু বসু বলল, কীসের শিক্ষা! কীসের হায়ার এডুকেশন! রুক্মিণী মায়ের দয়ায় একবার আত্মসাক্ষাতের পর সব যে মুছে যায়। সারা জগৎসংসার টলে ওঠে। তখন শিক্ষা দিয়ে কী করব? গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য—সব যে দুলে ওঠে। তিনিই তো জগজ্জননী। তাঁরই মায়ায় এ সবের সৃষ্টি।

সুদেব ভৌমিক রেলের ওয়ার্কশপের ইঞ্জিনিয়ার। সে অ্যাকসেল বোঝে। হুইল বোঝে। তাকে ঠিক বেলা দশটায় আজ ফেয়ারলি প্লেসে একবার কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে। রেলের সদর অফিসে, আগেভাগে খেয়ে নিয়ে খোকাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তবে সে ফেয়ারলি প্লেসে যাবে! বিড় বিড় করে নিজেই বলল, ইনকরিজেবল!—তারপর হন হন করে হাঁটা ধরল। রোজ সে সারাটা পার্ক আটবার পাক দেয়। এখনও তিনটে পাক বাকি। আর দেওয়া হবে না। ছবির মত তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চিত্রা কর—ঋতু বসুকে পেছনে ফেলে সুদেব এগিয়ে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে চিত্রা কর যেন বলে উঠল, আপনি মহাভাগ্যবান!

ভোরের বাতাসে ভাগ্যবান কথাটা সুদেবের পিঠে আলপিন হয়ে ফুটে গেল। সে হাঁটতে হাঁটতে খানিক এগিয়ে শরৎ ব্যানার্জি রোডে পড়ল। বাঁ হাতে থার্ড গলির মাথায় চা আর কচুরির বিখ্যাত ঠেক। সেই ভিড় কাটিয়ে সে এগোতে পারল না। দোকানি পাঁড়েজি নিজে বিরাট খুরিতে চা নিয়ে তার জন্যে দাঁড়িয়ে। সেবা লাগে মহারাজ!

কেন রোজ আমার জন্যে চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো?

সিরিফ এক খুরি চা মহারাজ। সেবা লাগে—

এমনভাবেই চা নিয়ে দাঁড়ায় লোকটা রোজ সকালে যাতে সে চা না খেয়ে কোনও উপায় থাকে না সুদেবের। মুখে শুধু একটি কথা— সেবা লাগে মহারাজ—

এই পাঁড়েজিই এক একদিন সন্ধ্যেবেলা গাদাগুচ্ছের ফুল দিয়ে সাজানো বিশাল এক তোড়া নিয়ে হাজির হয়। এসেই বাইরে থেকে চেঁচাবে, রুক্মিণী মাইজি—

তখন পাঁড়েজিকে সামলাতে সুদেব নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। নয়ত তার বউ রুক্মিণীর নামে জয়ধ্বনিতে পাঁড়েজি চারদিক ফাটিয়ে ফেলবে।

আজ এই ভোরবেলায় ভাগ্যবান কথাটা সুদেবের পিঠে দেশপ্রিয় পার্ক থেকেই বিঁধে আছে। পাঁড়েজির চা প্রায় এক চুমুকে শেষ করে সুদেব যতীন বাগচি ধরল। ঢুকেই ডান মোড়ে।

বছরে একটা দিন এখানকার দু'দিকের ফুটপাথ ধূপকাঠি, ফুল, মালার পসরায় ভরে যায়। সেদিনটা হল রুক্মিণীর জন্মদিন। এখন ফুটপাথ প্রায় শুনশান। শুধু পূর্ণ দাস রোডের রেশন শপের সামনে বসে থাকা ধর্মের ষাঁড়টা এদিক-ওদিক শুঁকে বেড়াচ্ছে। এই সময় রুক্মিণীকে দেওয়া রোজের রোজ ফুল, ফুলের মালা ঢিবি করে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। কর্পোরেশনের কলের বাঁ দিকে। আজ হয়ত ফেলা হয়নি এখনও। ধর্মের ষাঁড়ের সেটাই ব্রেকফাস্ট।

নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদেব ভৌমিক। একটি সাবেক-কেতার চারতলা বাড়ির একতলা। এগার বছর আগে সুদেব আর রুক্মিণী এ বাড়িতে ভাড়া এসেছিল। সবে বিয়ে হয়েছে তখন। তার পরের বছরই খোকন পেটে এল রুক্মিণীর। সে বাড়ি এখন চেনা যায় না। বাড়িটার ওপরের তিনতলা থেকে একতলা একদম আলাদা। রঙ, কাঠের কাজ, ফুলেল লতার ওপরমুখো উঠে যাওয়া— তার ভেতর চোরা মার্কারি ল্যাম্প—ঢুকতেই পার্মানেন্ট মঙ্গল কলস।

সদর এখন বন্ধ। নিজের বাড়িতে সুদেব একটা সাইড দরজা দিয়ে ঢুকল। ঢুকেই তার নজরে পড়ল—রুক্মিণী মায়ের দুজন বিখ্যাত ভক্ত বসে। দু'জনই ঢোলা হাতার আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছে। দু'জনেরই মাথায় কলপ। দু'জনেরই পায়ে কালো পাম্পশু চিক চিক করছে।

এই যে সুদেববাবু। মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না আমাদের?

তা তো বলতে পারব না। যদি ক্রিয়ায় বসে থাকেন তো দর্শন দিতে পারবেন না এখন।

ওদের একজন বলল, বড্ড দরকার ছিল।

ক্রিয়ায় বসে থাকলে তো আজ দেখা দেবেন না।

দেখুন না একটু।—অধীর হয়ে আরেক ভক্ত বলল, আজ বড্ড দরকার ছিল ওঁকে।

এই তো ক'দিন আগে দেখা করে গেলেন আপনারা। দু'জনই তো একসঙ্গে এসেছিলেন। তাই না?

দুই ভক্তই একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনার দেখছি সুদেববাবু সব মনে থাকে। দেখুন না একবারটি—।

এত কীসের দরকার পড়ল আবার?

বেলা এগারটায় আমাদের দু'জনেরই ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার কথা। আলিপুরে এগার ডেসিম্যাল জায়গা নিয়ে আমাদের দু'জনের ভেতর দীর্ঘদিনের মামলা। ট্রাইব্যুনালে যাবার আগে মা নিজেই যদি আমাদের ভেতরে একটা ফয়সালা করে দিতেন তো আর আমাদের

ট্রাইব্যুনালে যেতে হত না।

ওখানে এখন কাঠা কত করে?

ফ্যানসি প্রাইস। দেখুন না একবার সুদেববাবু—

বাড়ির লিভিংরুমটাই এখন ভক্তদের, শিষ্যদের বসার জায়গা। রুক্মিণীর জন্মদিনে ওখানেই সে বেদিতে বসে। তখন সদর দরজার কপাট মিস্ত্রি ডেকে আগের দিনই খুলে ফেলা হয়। তাতে দর্শন দিতে সুবিধে হয় রুক্মিণীর। লোকও তো হয় অনেক। সুদেবদের আগেকার শোবার ঘরেই রুক্মিণী মা বেশি সময় থাকেন এখন। সেদিকে যেতে যেতে নিজেকে ভীষণ ছোট লাগল সুদেবের। যেন বা ব্যারিস্টার রুক্মিণী ভৌমিকের মক্কেল এসেছে। তাই মুহুরি হয়ে সে ভেতরে খবর দিতে চলেছে।

ভারি পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই থমকে দাঁড়াল সুদেব। মির্জাপুরি কার্পেটের ফুলকারি জুড়ে রুক্মিণী বসে। পদ্মাসনে। শিরদাঁড়া সিধে। চোখের মণি দুটি সাদা, জমি থেকে ওপরমুখো। সেই সঙ্গে নিজের জিভের ডগা দিয়ে রুক্মিণী নাকের ডগা ছুঁয়ে ফেলেছে।

সুদেব আর তাকাতে পারল না। অমন সুন্দর মুখের মানুষ যদি ভোরবেলাতেই জিভ বের করে নাকের ডগা ছুঁয়ে পদ্মাসনে বসে থাকে—তা কি দেখতে খুব ভাল। সারা ঘর চন্দন, গুগ্‌গুলের গন্ধে ভরে গেছে। সুদেব ফিরে আসছিল।

কি হল? চলে যাচ্ছ কেন?

ফিরে তাকাল সুদেব। রুক্মিণীকে দেখে চোখ ফেরাতে পারল না। খোকনের বয়স দশ হতে চলল। অথচ রুক্মিণী যেন আগের চেয়েও সুন্দরী হয়ে উঠেছে। খোলা একঢাল চুল কমলা ডুরে শাড়ির ওপর এসে পড়েছে। হাতে শাঁখা, কপালে বড় করে সিঁদুর, পায়ে আলতা—এয়োতির সব চিহ্নই বজায় রেখেছে। প্রায় কিছুই না খেয়ে থাকতে থাকতে রুক্মিণী ভক্তজনের জগজ্জননী হয়েও দেখতে এখনও একদম ছিপছিপে—বুঝি বা কুমারী বয়সের চেহারাটি ফিরে পেয়েছে। তকতকে, তাজা। মুখখানি আগের চেয়ে আরও সুন্দর লাগল সুদেবের। সেই মুখে দুটি বড় বড় কালো চোখ ভেসে আছে। সে চোখে কোনও পলক পড়ছে না। মুগ্ধ সুদেব ভুলেই গেল—কেন সে এ-ঘরে এসেছে।

ফিক করে হাসল রুক্মিণী মা। যেন সুদেবের মনের দশা বুঝতে পেরেছে। হয়ত জগজ্জননী হয়ে ওঠার পর রুক্মিণী অন্তর্যামীর মতই সব আগাম জানতে পারে। ছোট্ট করে রুক্মিণী বলল, বোসো। সারা ঘরে দামি ধূপের গন্ধ। সেই সঙ্গে কাল রাতের ফুল। কোশাকুশি। কার্পেটের আসন। একখানি বড় বাঁধানো ছবিতে সিঁদুর দিয়ে লেখা ওঁ। এর ভেতর কোথায় বসবে সুদেব বুঝতে পারছে না। অনেকদিন, তার এ ঘরে আসা হয় না।

চোখের ইশারায় তাকে কার্পেটের ফুলকারির বাইরেই কাছাকাছি বসতে বলে রুক্মিণী জানতে চাইল, কোনও গন্ধ পাচ্ছ?

গন্ধ? কই? না তো।

ভাল করে ভেবে দেখো তো।

হেসে ফেলল সুদেব, গন্ধ কি ভেবে টের পাওয়া যায়! সে তো এমনিই নাকে আসবে।

কিছুই জানলে না এই পৃথিবীর। যা কিছু আমরা পাই—সবই আমরা ভেবে পাই। ভাবলেই ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ পায়। সুবাস পায়। দ্যাখো তো এবার—

আজ ভোরবেলায় সুদেব ভৌমিক কিছুতেই রুক্মিণীর সামনে তার পায়ের নিচের মাটি

হারাবে না। সে প্রায় আপত্তি করে বলে উঠল গন্ধ কি দেখাও যায় নাকি?

শান্ত গলায় সামান্য হেসে রুক্মিণী বলল, যায়। গন্ধ শোনা যায়। কোনও গন্ধ যে আসছে—তা তুমি টের পাও না?

পাই। যখন সে গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে। কিংবা বাতাস যখন কোনও গন্ধকে বয়ে আনে তখন তা আমরা টের পাই।

গন্ধের পায়ের শব্দ আছে। ভাল করে কান পেতে শুনে দেখো। এখন এ ঘরে শুধু মধুর গন্ধ। মধু এল কোত্থেকে?

এসেছে! বলে হাসল রুক্মিণী। তারপর বলল, এতক্ষণ আমি মুখের ভেতর শুধুই মধুর স্বাদ পাচ্ছিলাম।

মধু খেয়েছ?

না। কাল নিশুতি রাত থেকে পদ্মাসনে বসে আছি। মধুক্রিয়ায় বসে থাকতে থাকতে দেখি সারা মুখ মধুতে ভরে গেছে।

স্কুলে পড়ার সময় তোমার মত জিভের ডগা দিয়ে আমিও নাক ছুঁতে পারতাম।

রুক্মিণী বলল, জিভের ডগা দিয়ে এ শুধু নাক ছোঁয়া নয়। এটাকে তুমি শুধু একটা ব্যায়াম ভেবে থাকলে ভুল করবে। এর ভেতর ক্রিয়া আছে একটা। যে ক্রিয়া সারা মনকে এক জায়গায় নিয়ে আসে। ক্রিয়া ছাড়া কোনও বীজমন্ত্রই কাজের হয় না। আমি তো সারা ঘরে মধুর গন্ধ পাচ্ছি। মধুর গন্ধ ভুর ভুর করছে।

কাল থেকে কিছুই খাওনি তুমি।

মধু খেয়ে আমার পেট ভরে আছে।

সুদেব বলল, এটা কি ঠিক হচ্ছে? শেষে একটা বড় অসুখ বাধাবে। গ্যাসট্রিক না হয়ে যায়। আলসারও হয়ে যেতে পারে।

কেন হবে!—বলে এমন করেই হাসল রুক্মিণী—যার ভেতর একটা সুখও ধরা পড়ল। এই যে সুদেব তার জন্যে ভাবে, এই চিন্তাটাই বোধহয় রুক্মিণীকে সুখ দিল।

১১

পাটনা শহরকে পেছনে ফেলে গাড়ি গঙ্গার ওপর গান্ধী সেতুতে উঠতেই মোতিয়া দুসাদ চেঁচিয়ে বলল, মুঠিয়া কেলা! বাবুজি মুঠিয়া কেলা!!

গরমের ধু ধু বিকেল পেরিয়ে-আসা মারুতি জিপসির সারা গা তেতে আগুন। ওরই ভেতর মোতিয়ার মুখে একগাল হাসি। সে ফের চেঁচিয়ে উঠল, গঙ্গা মাইকি কিনারে কিনারে মুঠিয়া কেলে কি বাগিচা—

মোতিয়ার হাত বরাবর গাড়ির জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে রজত দেখল, বিকেলের শেষে বাতাস উঠে গঙ্গার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো কলাবাগানের পর বাগানে মাঝের পাতাগুলো হেলেদুলে চিরে যাবার দশা। মাথায় ধুলো। গায়ে ধুলো। চোখের পাতার ওপর আঙুল দিলে ধুলো উঠে আসে। উল্টোদিক থেকে দশ চাকার লরি সাউথ বিহারের মাল নিয়ে ফুল স্পিডে পাটনায়

ঢুকছে। একদল লোক বাসের ছাদে তালি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে অন্ধকার-হয়ে-আসা পাটনায় চলে গেল। চামেলী উঠে বসেছে। সে হেসে বলল, মুঠিয়া কেলা ছট পরবসে গঙ্গা মাইকি চঢ়াইব।

রজত পালিত সারাটা দিন মারুতি জিপসির ভেতর ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়েছে। সে অবাক হয়ে দেখল, চেনা কলাবাগান দেখে যে-দুই আওরত এখন উঠে বসেছে—তাদের মাঝখানে কাঠের বাক্সে একজনের ছেলে—আর অন্যজনের মরদের ডেডবডি বরফ মেখে শুয়ে।

গঙ্গা ব্রিজ থেকে নেমেই বাঁয়ের রাস্তা ধরল জিপসি। ড্রাইভার জানতে চাইল, অউর কিতনা রাস্তা?

মোতিয়া দুসাদের গলায় কোত্থেকে আহ্লাদ ফিরে এসেছে। সে বলল, গণ্ডক পুলকি উসপার—

অন্ধকারে গঙ্গা মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে অনেক নিচে একটা স্টিমারে আলো জ্বলে উঠল। তার সার্চলাইট সামনের ধু ধু নদীবুকে কোনও থই পাচ্ছে না। রজতের মনে পড়ল—বহু বছর আগে একবার যেন সে এদিকে রিপোর্টিং করতে এসেছিল। বোধহয় শোনপুরের মেলায়। তখন এ ব্রিজ হয়নি। রেলের ভাড়া-করা স্টিমারেই এপারে আসতে হত। সে যেন প্রায় গত জন্মের কথা। তখন কি জানতাম—চামেলী নামে একটি দেহাতি মেয়ের স্বামীর ডেডবডি নিয়ে আবার আমাকে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে আসতে হবে।

গঙ্গা এখন বাঁয়ে। সেখান থেকে সন্ধ্যের বাতাস উঠে আসছে। সারাদিন গরমে বেগুন পোড়া হওয়ার পর এ বাতাস বড় আরামের। রজত দেখল—সে আর মোতিয়া দুসাদ সম্ভবত কাছাকাছি বয়েসের মানুষ। আমাদের জীবনের পেছন দিকে তাকালে কত হাসিকান্নার ব্যাপার পড়ে আছে। সুখের। দুঃখের। আমাদের জীবনের সামনে এই চামেলীর জীবন তো প্রায় চড়াইপাখির জীবন। এই এতটুকু এখনও শুরুই হয়নি। এর ভেতরেই মেয়েটা বেওয়া বনে গেল। কোনও কোনও চড়াইপাখি নির্জন দুপুরবেলায় শিউলি গাছতলায় ডানা ঝাপটে ধুলো খেলতে নামে। সে জানেও না—গাছতলায় কখন এক কেউটে এসে বিঁড়ে পাকিয়ে বসে আছে।

ড্রাইভার গাড়ির স্পিড কমাল। রাস্তায় আগে আগে মোষের পাল চলেছে। এইমাত্র চাঁদ উঠল। তার আলো কালো কালো মোষের পিঠে পিছলে যাচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে ক্ষেতখামার। চাঁদের আবছা আলোয় ছায়া মাখানো মাঠঘাট দেখে বোঝার উপায় নেই সেখানে কোন্ ফসল? কী ফসল? মোষের গাড়ি সিধে মাঠ থেকে খাড়াই রাস্তায় উঠতে দেখে রজত বুঝল, মাঠ থেকে কাটা আখের বোঝা নিয়ে আসছে।

এক জায়গায় এসে গাড়ি একদম অন্ধকারে পড়ে গেল। রাস্তার দু'দিক থেকে ঝুপসি করে আমগাছের ডাল নেমে এসেছে। সেই অন্ধকার থেকে কোকিল ডেকে উঠল। সে ডাক নকল করে চামেলীও ডেকে উঠল। উঠেই সে ঠা ঠা করে হেসে পড়ল।

তাই দেখে মোতিয়া রীতিমত ঝামরে উঠল, বেশরম!

তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই চামেলীর। সে গাড়ি একটু থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল।

কোথায় যাচ্ছ?— বলে ভয়ে ভয়ে রজতও রাস্তায় নামল। চামেলী কোনও কথা না বলে একদম অন্ধকারে চলে গেল।

এ তো মহাবিপদ! — এ রকম ভাবতে ভাবতেই রজত মোটা গুঁড়ির আমগাছগুলোর নেমে-আসা ঝাঁকড়া ডালপালার অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। রাস্তার অনেকটা জুড়ে ডালপালার

ঝুপসি। সেই ঝুপসির ভেতর থেকে ফের কোকিল ডেকে উঠল। রজতের মনে হল দূরে উল্টো দিক থেকে একটা কুপির আলো দুলে দুলে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয় গো-গাড়ি — নয়ত মোষের গাড়ির নিচে ঝোলানো লণ্ঠন দুলছে।

বাবুজি—

চমকে ফিরে তাকাল রজত। তার পাশেই দাঁড়িয়ে চামেলী — দু'হাত ভর্তি কী যেন মেলে ধরেছে তার সামনে।

ভীষণ বিরক্ত রজত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, এ সব কী হচ্ছে?

কুছু না বাবুজি। আম। আম খাবে?

ওঠ। গাড়িতে ওঠ আগে।

গাড়ি স্টার্ট নিতে কোঁচড়-ভর্তি আম মেলে ধরল চামেলী। অন্তত আট-দশটা।

কোত্থেকে পেলে?

কোয়েল যব বোলে তব তো জরুর আম পাওয়া যাবে বাবুজি।

মোতিয়া বুঝিয়ে বলল। সন্ধ্যের বাতাসে অনেক সময় কাঁচা আম বোঁটা থেকে খসে পড়ে। এ সব রাস্তাঘাট চামেলীর জান-পহেচান আছে। শ্বশুরালে এসেছিল চামেলী খুব বাচপনি উমরে। তখন এ সব তল্লাট ঘুরে ঘেঁটে দেখা মেয়েটার। শেষে বলল, আভি তক্ বাচপনি নেহি ছোড়ি চামেলী।

চামেলীর হাবভাব, চালচলন এমনই যেন রামটহলের কিছুই হয়নি। যেন রামটহল আদপেই মারা যায়নি। তার মরার খবর যা শোনা গিয়েছিল তা একদম বানানো। নয়তো সে কী করে এখন রামটহলের লাশ কাঠের বাক্সের একদম পাশেই অমন পা ছড়িয়ে বসে? জানলার কাচ সরিয়ে বাইরের আলো-আধাঁরিতে তাকাতে তাকাতে বলে উঠল, ইধার বহুত লিচি গাছ ভি আছে বাবুজি।

মোতিয়া যোগ করল, তম্বাকু, মিরচি— সব কুছ চাষ হোতি ইধার।

বাইরে তাকাতে তাকাতে চামেলী বলল, ইস মুলুকমে সব কুছ মিলতি হ্যায় বাবুজি। মছলি, দহি, গুড় — সব কুছ মিলবে আপনার।

রজতের একসময় মনে হল — এই দুই আওরত কি তাকে দেশ দেখাবে বলে বেড়াতে নিয়ে বেরিয়েছে?

রাস্তা গণ্ডকের ওপর ব্রিজের মুখে এসে পড়ল। গাড়ি এক ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রিজে উঠতেই এক ঝাপটা ঠাণ্ডা বাতাস। এই রাস্তা দিয়েই আমি বহুদিন আগে শোনপুর মেলায় এসেছি।

মোতিয়া বলল, বচপনহামে রামটহল ভি ইধার-উধার ঘুমতে থে। কভি তম্বাকু ক্ষেত — কভি খলিহানমে — কভি কেলা বাগিচামে — গঙ্গা মাইকি কিনারে কিনারে —

খলিহান কথাটার মানে বুঝতে পারল না রজত। সে জানতে চাইল, রামটহল বচপন ক্যা ইধার বিতে?

নেহি বাবুজি। রামটহল পয়দা হুয়া সাকতোড়িয়া সেন্ট্রল হসপিটালমে। যব উহ্-ছোটা থা, উসকা পিতাজি হর সল মুলুকমে আতা থা—

বলতে বলতে থেমে গেল মোতিয়া। রজত পরিষ্কার দেখল — তার চেয়ে-থাকা-চোখে আম-লিচু গাছের ঝুঁকে-পড়া ডালপালার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা গণ্ডক ব্রিজে গিয়ে উঠছে — তারই ছায়া। দূরে দূরে হরা মরিচ ফলে-থাকা লঙ্কার চৌখুপি চাষ। তম্বাকু বাগ।

গাড়ি থামাল ড্রাইভার। উল্টো দিক থেকে একদল লোকের একটা মিছিল। গণ্ডকের ওপর ব্রিজ বেশ পুরনো আর সরু।

উৎসাহে সিধে হয়ে গুছিয়ে বসল চামেলী। জুলুস্! লেকিন কোই বাজা নেহি?

রজত পালিত মনে মনে বলল, সব মিছিলে কি বাজনদার থাকে?

বেশ বড় জুলুস। একদল লোক হেঁটে পার হল। তারপর তিন তিনখানা ডুলি। তাদের সাজোয়ান সব চেহারা। একখানা ডুলির খোলা মুখে ভেতরে বসে-থাকা জেনানার এগিয়ে-রাখা পায়ের পাঁয়জোড় চিক চিক করে উঠল চাঁদের আলোয়। ডুলি-পিছু একজন করে ঘোড়সওয়ার। পেছন পেছন। তারপর লোকজন। হৈ হল্লা। একেবারে শেষে জনা চারেক লোক। মাথায় হ্যাজাক বাতি। কী ব্যাপার? কোই রাজবাড়ি কা —

মোতিয়া দুসাদের মুখে একেই কোনও রেখার অভাব নেই। তার ওপর চামড়া কুঁচকে গিয়ে অনেক আঁকিবুঁকি। নিরসা খনির জীবনে বহু ঝড়ঝাপটার দাগ। জুলুস দেখে সেই মুখে গর্বের, আনন্দের চিহ্ন একদম আভা হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে হ্যাজাক বাতির আলো যাবার সময় গাড়ির ভেতর সবকিছু স্পষ্ট করে তোলায় কিছুই চোখ এড়াল না রজত পালিতের।

নেহি নেহি বাবুজি। রাজা ইধার কাঁহা মিলবে? ভূমিহার ঘরকি বিটিয়া শ্বশুরাল যা রহি হ্যায়—

গঙ্গা পেরিয়ে গণ্ডক ব্রিজ পেছনে ফেলে গাড়ি যখন জেন্দাহা গাঁয়ে পৌঁছল — তখন মোতিয়া গাড়ি থেকে নেমেই মাটিতে পড়ে লুটোপুটি করে কান্না জুড়ল। সেই সঙ্গে বুক চাপড়ানি। কান্নার সব কথা বোঝা যায় না। তার ভেতরে খানিকটা এ রকম — ওরে রামটহলিয়া —

শেষে কান্নার ভেতর থেকে শুধু 'টহলিয়া' কথাটি বেরিয়ে আসতে লাগল। বড় রাস্তা থেকে এবড়োখেবড়ো ইট বসানো রাস্তায় নেমে বড় একটা পিপুল গাছ ফেলে এগোতেই জেন্দাহা গাঁ। ইলেকট্রিক আসেনি। তবে দেখা যায়— দূরে জিলার পাক্কি সড়কের মোড়ে বিজলি খুঁটিতে আলো জ্বলছে। তার নিচে মানুষজনের মাথা — দোকানঘরের ছত্রে-ঢাকা টঙ। কোথা থেকে চিবনো জাবরকাটা গলায় একটা মোষ ডেকে উঠল।

মোতিয়ার কান্নায় চামেলী সামিল হল না। সে শুধু তার শাশুড়ির পাশে গিয়ে বসল। বসে গালে হাত দিয়ে শুকনো মুখে চুপ করে থাকল। ততক্ষণে জেন্দাহার মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে। ছোটরা এসেই প্রথমে মারুতি জিপসিটা ঘিরে ফেলল। একটি বছর দশেকের ল্যাংটো ছেলে গাড়ির ছাদে উঠতেই ড্রাইভার রে রে করে এগিয়ে গেল। অমনি ছেলেটি এক লাফে নিচে নেমে দে দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে কাচ্চাবাচ্চাদের হাসির হররা।

বড়রা গম্ভীর। তারা মোতিয়া আর চামেলীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। দুজন ঘোমটা-টানা মেয়েলোক মোতিয়ার পাশে বসে একই সুরে কাঁদতে শুরু করে দিল।

ততক্ষণে— যাকে বলে পূর্ণচন্দ্র— সে রকম একখানি গোল হলুদ চাঁদ জেন্দাহা গাঁয়ের মাথায় এসে দাঁড়াল। তাতে সারা গাঁ একদম ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নায় দিনের আলোয় যেমন তেমনি স্পষ্ট ফুটে উঠল।

একটা তেঁতুল গাছের সামনে রামটহলদের ঘর। মোটা করে মাটির দেওয়াল। তার মাথায় দুই ভাঁজে খাপরা টালি। বহুদিন লোকজন না থাকায় সে টালি লতানে গাছপালায় ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়। উঠোনেও জঙ্গল। কী গাছপালার জঙ্গল তা চেনা যাচ্ছে না।

মোতিয়াদের জ্ঞাতিগুষ্টির লোকজন হবে — তাদেরই দুজন তাগড়ামত লোক এসে প্রথমে গাড়ি থেকে রামটহলসমেত কাঠের বাক্সটা নামাল। তারপল তারা কোত্থেকে একটা টর্চ এনে সেই রাতেই বন্ধ ঘরের দরজা খুলে ফেলল। হাতে লাঠি আরও দু'চারজন তাদের সঙ্গী হয়ে সেই ঘরে কী সব তাড়া করতেই— খটাশ বা সে রকমই কিছু দুদ্দাড় করে ঝোপে গিয়ে সেঁধলো। বাচ্চারা সেইসব ঝোপে লাঠিপেটা শুরু করে দিল। ততক্ষণে মোতিয়ার কান্নাকাটি কিছু কমে এসেছে।

আশপাশ থেকে খান দুই চারপাই এসে গেল। ভিড়ের ভেতর থেকে দুজন এসে ড্রাইভারকে বলল, আপ লেট যাইয়ে। খানা আওতি—

রজতকেও অমন বলায় সে জানাল, মুঝে ছোড়ো। পহেলে রামটহলকা মাই কো — বহু কো থোড়া পানি পিলাও।

পোশাকে মেলে না। চেহারায় মেলে না। শহুরে হাবভাবের রজতকে ওরা বড় থালায় করে খানা বলতে গরমাগরম চারখানি লিট্টি আর লঙ্কার আচার এগিয়ে দিল। আর লোটা করে খাবার জল। সেই সঙ্গে ভাল করে মাজা একটি গ্লাস।

ওদের কান্নাকাটি, হৈ হল্লা, কথাবার্তা থেকে রজত বুঝতেই পারছিল — জেন্দাহার এই দুসাদ টোলা — আর তার আশপাশের দুসাদ, পাসোয়ানরা বছরে পর বছর বঙ্গালের কয়লাখনি এলাকায় কাজ করতে যায়। কেননা কারও কারও কথায় 'আসানসুল', 'সাকতোড়িয়া' — সব জায়গার নাম প্রায়ই জ্যোৎস্নার ভেতর ভেসে উঠছে।

দু'খানি লিট্টি আর জল খেয়ে চারপাইতে বসল রজত। পায়ের জুতো খুলল। আশপাশের ঝোপঝাড়ে জোনাকি নেমেছে। এই রাতেই বড় লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘর — তার সামনের ঢাকা সেঝতলামত বারান্দা — পাশের রান্নাঘর — একসময় রামটহলদের গরু-মোষ ছিল নিশ্চয় — পাঁচ ছ'জন মিলে সেই গোহাল— আগাপাশতলা ঝাড়াঝাপটা করে পরিষ্কার করতে নেমে পড়েছে। লাঠি, আলো, শাবল — কিছুরই অভাব নেই। বিহারের গাঁ এইখানেই বাংলাদেশের গাঁ থেকে একদম আলাদা। এখন এখানে যা ঘটছে — তা কি বর্ধমান কিংবা নদীয়ার গাঁয়ে আশা করা যেত? এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই রজত চারপাইতে ঢলে পড়ল।

ঘুমিয়েই সে দেখতে পেল — একটার পর একটা লরি ফুল স্পিডে ছুটছে। কেউ কাউকে রাস্তা দিচ্ছে না। দিন কী রাত বোঝা যায় না। ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজে রাস্তার দু'ধারের শালবন থেকে পাখি ডেকে উঠছে ভয় পেয়ে।

সেরকম এক পাখির ডাকেই ঘুম ভেঙে গেল রজত পালিতের। কোথায় পাখি! প্রায় সুনসান উঠোন। বেশিরাতের জ্যোৎস্নার হলুদে এখন এই শেষরাতে আশপাশের ঝোপঝাড়ের, লতাপাতার সবুজ মিশে গিয়ে জ্যোৎস্নাটা কেমন যেন নীলচেপানা। তাতে মোতিয়ার মুখ নীল হয়ে গেছে। সে রামটহলের কাঠের বাক্সটায় ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে মুখ কখন হাঁ হয়ে গেছে টেরও পায়নি মোতিয়া।

দূরে মাটিতে টানটান হয়ে পড়ে হাতপা মেলে একদম আকাশের নিচে কে শুয়ে। তার সারাটা শরীর এই জ্যোৎস্নায় একদম নীল হয়ে গেছে। এমনকি রামটহলসমেত যে কাঠের বাক্সটায় মোতিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার গা অবধি নীল হয়ে উঠেছে।

একজন লোক বেশ দূরে চাঁদের দিকে পিঠ ফিরে কেন যে এই শেষরাতে শাবল দিয়ে গর্ত

খুঁড়ে চলেছে নাগাড়ে — সদ্য ঘুম-ভেঙে-ওঠা রজত তা বুঝে উঠতে পারল না। তার পিঠও নীল হয়ে উঠেছে। সেই নীল পিঠে যেন নীল নীল ঘামের ফোঁটা।

মাটিতে এই টান টান হয়ে শুয়ে-পড়ে-থাকা উঠোনটাকে আরও খাঁ খাঁ করে তুলেছে। হঠাৎ সে দিকে তাকিয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল রজত। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, ইরা — ইরা— রে—

সে চিৎকারে মোতিয়া জেগে গেল। শাবল দিয়ে যে লোকটি গর্ত খুঁড়ছিল — সেও শাবল থামিয়ে ঘুরে তাকাল। ততক্ষণে রজত পালিত ছুটে ওখানটায় চলে গেছে। চামেলী সারা উঠোনের ধুলো সারা গায়ে মেখে লুটোপুটি খেয়ে খুব চাপা গলায় একা একা কাঁদছিল। প্রায় গুনগুন করে। সবাই চলে যাওয়ার পর থেকেই। তার যে একদম কাঁদাই হয়নি। পিঁপড়ে কামড়াতেই সে সবে পাশ ফিরেছে — আর অমনি ওই চিৎকার —

ইরা — ইরা— রে—

একদম চোখের সামনে রজতকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে চমকে কান্না গিলে ফেলল চামেলী। রজতের সামনের চুল কপালে এসে পড়েছে। চোখ দুটো তার দিকে তাকিয়ে। একদম ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন।

ফস করে উঠে বসল চামেলী, ক্যা হুয়া বাবুজি? রজত দু'হাতে চামেলীকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর খুব মন দিয়ে চামেলীর মুখে তাকাল। তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল।

মোতিয়া দুসাদ উঠে এসেছে। কা হুইল্ চামেলী?

কুছ নেহি। ম্যায় সিরিফ করবট বদলি — আউর বাবুজি — আইসন—

মোতিয়া এবার রজতের মুখে তাকাল। কা হইল্ বাবুজি?

রজত সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিতে পারল না। সে চামেলীকে ছেড়ে দিল।

১২

বর্ষার দেখা নেই। বেলা নটা বাজতে না বাজতে সাদা রোদে সারা কলকাতা ঝকঝক করে ওঠে এখন। চারদিক তেতে-পুড়ে রীতিমত টিনের খাপরা যেন। রজনী সেন রোডের সামনে বিরাট ফ্ল্যাট বাড়িটার তেতলা ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ইরা ডাকল, শঙ্কু? চিনি?

ওরা দু'জন দু'কামরায় এই ফ্ল্যাটের পাশের ঘরেই এটা-ওটা করছিল। শঙ্কু খানিক খানিক অবন ঠাকুরের বুড়ো আংলা নাড়ে-চাড়ে (বাবা পড়তে বলে গেছে) — আবার বই বন্ধ করে টক করে টিভি খুলে শারজায় ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের ওয়ান ডে দেখে। দুটোই তার ভাল লাগে। আবার দুটোই তার একঘেয়ে লাগে। কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না শঙ্কু এখন। চিনি এখন ভরতনাট্যমের স্কুলে একদম প্রিলিমিনারিতে। তার হাতের আঙুল দিয়ে মুদ্রা আনতে গিয়ে সে সুবিধা করতে পারছে না ক্লাসে। নাচের স্কুলের দিদি বলেছে, খেতে বসে খিদে রেখে উঠে পড়বে। তাহলে শরীরটা হালকা হবে। দিব্যি মুদ্রা ফুটবে হাতের আঙুলে। চিনি পড়েছে মুশকিলে। সে সব কিছু খেতে ভালবাসে। খেয়ে হজম করতে পারে। গুছিয়ে খায়। তার দাদা শঙ্কুর মত নয় সে। শঙ্কু খেতে বসে সব ছড়ায়। এ জন্যে দাদার সঙ্গে খেতে বসে চিনির একটা

গর্ব হয়। সেই চিনি একা একা হাতের আঙুলে মুদ্রা ফোটাতে চেষ্টা করছে।

মায়ের ডাকে দু'জনই সামনের ঘরে ছুটে এল।

শোন। তোমাদের নতুন ক্লাসে প্রোমোশন হয়েছে। স্কুল খুলতে এখনও দশদিন। একবার খুলে গেলে তোমরা আর রেস্ট পাবে না। আমি একটু ঘুরে আসছি। সেই ফাঁকে তোমরা কোনওরকম ঝগড়া না করে যার যার মত চান করে নেবে। চান সেরে টিভি দেখতে পার। পড়তে পার। ঘুমতেও পার। কিন্তু ঘরের বাইরে বেরবে না।

শঙ্কু মন দিয়ে ইরাকে দেখছিল। মাকে তার ভারি সুন্দর লাগছে। চান হয়ে গেছে মায়ের। সুন্দর করে মাথা আচড়েছে। লাল ব্লাউজের সঙ্গে লালপেড়ে শাড়ি। সে যখন ফাইভ-সিক্সে পড়ত, তখন মা তাকে প্রায়ই স্কুল থেকে আনতে যেত। তখন মা আরও সুন্দরী ছিল। তাই মনে হয় শঙ্কুর। তখন যখন বিকেলের দিকে মা স্কুলের দিকে আসত তখন শঙ্কুর ক্লাস ফ্রেন্ডদের মায়েদের মাঝখানে তার নিজের মা জ্বলজ্বল করে উঠত।

শঙ্কু না বলে পারল না, মা এত সেজেছ কেন?

কোথায় সেজেছিরে পাগল! বাইরে বেরব। মাথাটা আচড়ে শাড়িটা পাল্টেট নেব না?

কোথায় যাচ্ছ মা? আমি সঙ্গে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে চিনিও নাক কুঁচকে কান্না এনে বলল, আমিও যাব মা তোমার সঙ্গে—

কেউ যাবে না। আমি যাব আর আসব। তোমরা ভাল হয়ে বাড়িতে থাকবে। লক্ষ্মী হয়ে থাকবে।

শঙ্কু লম্বা হয়ে উঠেছে। কিছুদিন হল গলার কণ্ঠধ্বনি জেগে উঠে গলাটি ভেঙেছে তার। স্কুল মাঠে সে এখন স্পিন বোলার। শঙ্কু ঘড় ঘড় করে বলল, জানি জানি — তুমি এখন কোথায় যাবে তা আমরা জানি।

কোথায় বল তো?

তোমার সেই রুক্মিণী মায়ের কাছে।

তোমাদেরও তিনি রুক্মিণী মা।

না। মা তো তুমি।

ছিঃ! বাবা। ওভাবে বলতে নেই। তিনি সবার মা। আমি তো সাধারণ মা।

ধাঁধায় পড়ে গেল শঙ্কু। দুইরকম মায়ের কথা শুনে। সে জানতে চাইল, সাধারণ মা কী জিনিস মা?

হাসি পাচ্ছে — আবার রাগও হচ্ছে ইরার। বাইরে পোড়া গরম। ভেতরে দুই অবুঝ ছেলেমেয়ে। বেরবার তাড়া মাথায়। ইরা অনেক কষ্টে মুখে হাসি এনে বলল, এই আমার মত মা সব বাড়িতে একজন করে আছে। এদের বলে সাধারণ মা।

শঙ্কু আরও অবাক হয়ে বলল, কিন্তু তোমাকে তো আমরা শুধু মা বলেই ডাকি। আমাদের ক্লাসের সনৎ তো তার মাকে শুধু মা বলেই ডাকে।

উঃ! পারা যাচ্ছে না। রুক্মিণী মা হলেন গিয়ে জগৎজননী। এখন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। যাব আর আসব।

শঙ্কু খুব বিচক্ষণ মানুষের ভঙ্গিতে বলল, না গেলে হয় না মা?

কেনরে? এ কথা বলছিস কেন? আমার কি কোনও ইচ্ছে — কোনও কাজ থাকতে নেই?

এই তো ভোরবেলা আসন করে বসে ধ্যান করলে মা। তারপর আবার যাবার দরকার কি?

তুই কখন আমায় ধ্যান করতে দেখলি শঙ্কু?

বাঃ! সব ভুলে যাও তুমি আজকাল। আমি ভোরে ক্রিকেটের কোচিং নিতে যাবার সময় দেখলাম -- তুমি আসন করে বসে আছ বিছানায়। দুই হাত মেলে ধরে রেখেছ দুই হাঁটুতে। বাবা তখন ঘুমোচ্ছিল।

কথা বলতে বলতে শঙ্কু লক্ষ্য করল, তার মায়ের দুই চোখ ছলছল করে উঠেছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে মা? ও মা? চুপ করে থাকছ কেন?

তোমরা দু'জনই জানো — কিছুদিন হল আমার বাবা হারিয়ে গেছেন। সারাদিন তোমাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আমি কি আমার বাবার জন্যে কিছু করতে পারব না?

চিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল, দাদু কোথায় গেছে মা?

জানি না।

শঙ্কু বলল, দাদু নাকি দিদিমাকে চিঠি লিখেছে।

তুই জানলি কোত্থেকে?

তুমিই তো বাবাকে সে কথা বলছিলে সেদিন। যাও তুমি ঘুরে এস মা যতীন বাগচী রোড থেকে। কিচ্ছু চিন্তা কোর না। আমরা ভাল হয়েই থাকব।

ট্রাম থেকে নেমে যতীন বাগচী রোডে গলে-আসা পিচে ইরার পায়ের স্যান্ডেল বন্দী হয় হয়। কোনওমতে সদর দরজায় এসে বেল টিপতেই কাজের মেয়েটি দোর খুলে দিল।

বাইরে এত গরম। ঘাম। ধুলো। একটু ছায়া নেই। হাওয়া নেই। ভেতরে ঠাণ্ডা বাতাসে দামি ধূপের গন্ধ। ভেতরে ঢুকে প্রথমে কিছু দেখতেই পেল না ইরা। চোখ তার অন্ধকার হয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে সে আন্দাজে এগতে গিয়ে পেতলের বড় ফ্লাওয়ার ভাসে ধাক্কা খেল। ভাগ্যিস পড়ে যায়নি।

এবার চোখ সয়ে এসেছে ইরার। বাঁ হাতে ভিজে মত কি লাগল। অন্ধকারের ভেতরে টাটকা — ভিজে রজনীগন্ধার স্টিক। প্যানেল করা দরজাটা চোখে পড়ল। আস্তে ঠেলতেই চমৎকার একটা গন্ধ এসে লাগল।

কে? এসেছিস তাহলে!

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ইরা বলল, কেন? তুমি জানতে না আমি আসব।

আমি নিজেই তোকে মনে মনে ডাকছিলাম ইরা।

এখন ইরা সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। এ যেন অনেকটা দিব্যদৃষ্টি। এখন সারা ঘর — ঘরের দেওয়াল — সুগন্ধী ধূপকাঠির পাথরদানী — রুক্মিণী মায়ের ঢল ঢল সুন্দর মুখখানি — সেই মুখে বড় বড় দুটি চোখ — সবই দেখতে পাচ্ছে ইরা।

রুক্মিণী এখন তাঁর আসনে বসে আছেন। আসনের সামনে ঘট। ঘটের ওপারের দেওয়ালে ম্যাজেন্টা রং দিয়ে বড় করে লেখা ওঁ। পদ্মাসনা রুক্মিণী মায়ের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ইরা। গায়ে একটুও মেদ নেই। ওপর দিকটা গরদে ঢাকা। ঢাকা পা অবধি। মাথার চুলটি ছাড়া। দুই ভ্রূর মাঝখানে — যাকে বলে ক্রিয়ার ভাষায় রামদুয়ার — সেই সেখানে কে যেন ছুরি দিয়ে চিরে দিয়েছে। নয়ত চিনে সিঁদুর কি অতটা গাঢ় লাল হয়? ধূপের সুগন্ধী ধোঁয়া দু'ভাগ হয়ে মায়ের শরীর ঘিরে মেঝে থেকে সিলিংয়ে উঠে যাচ্ছে। এ যেন আরেক ছবি রুক্মিণী মায়ের।

ক্রিয়ায় বসে থাকতে হয় রুক্মিণী মাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভক্তের দল এসে কত কি যে

চায়। তাদের সব চাওয়া — সব আকাঙ্ক্ষা — সব কিছু নিজের ভেতর নিতে হয় রুক্মিণী মাকে। এক এক সময় ক্লান্ত হয়েই পাশে রাখা সিঙ্গল বেডের পালঙ্কে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেন মা। সেই পালঙ্কে এখন ইরা বসে। খুব কম লোকই ওখানে বসে। বসতে পারে।

ইরা বলেই বসল, তোমার এত রূপ রুক্মিণী মা। এই রূপ না হলে কী জগজ্জননীকে মানায়!

রূপ কোথায় দেখলি! তাও যদি তোদের সুদেবদাকে আটকাতে পারতাম!

সুদেবদা সেই অফিসে গেছে?

হ্যাঁ। সে-ই অফিসে রোজ যেমন যায় -- দশটা পাঁচটা — সেখানেই রোজকার মত আজও গেছে।

তুমি জগজ্জননী। তোমার কীসের অভাব! তবু সুদেবদা কেন অফিসে যান রোজ বুঝি না।

ওই যে বললি — আমার নাকি এত রূপ — তা সে রূপ কিসের কাজে এল বলত? ধরে রাখতে পারলাম কোথায় ইরা —

ইরা একটু অবাক হল। আবার সেই সঙ্গে তার দুঃখও হল রুক্মিণী মায়ের জন্যে। সারা বাড়ি খাঁখাঁ করছে। সুদেবদা আর পাঁচজন গেরস্থ-বাড়ির কর্তার মতই রোজ দাড়ি কামান — প্যান্ট-শার্ট-জুতো-জামা পরে অফিসে যান। যার ঘরনী খোদ জগজ্জননী — সে কি বোঝে না, এই অফিস-কাছারিতে যাওয়া — খোদ অফিস-কাছারিই ভুয়ো। মায়া মাত্র।

রুক্মিণী মা-ই তো আমায় বলেছে — যা দেখছিস তুই চোখ মেলে — জানবি ইরা তা তুই দেখছিস বলেই আছে — নয়ত নেই। মিথ্যে! একদম মায়া।

সুদেবদা কি এসব একদম বোঝেন না? দু' একবার যেতে-আসতে যখন রুক্মিণী মা ক্রিয়ায় মজে থাকেন — তখন তাঁকে রিক্ত করার সাহস হয়নি ইরার — সেই সব সময় সে সুদেবদাকে বলে দেখেছে — কেন আপনি মিছিমিছি রোজ রোজ অফিসে যান সুদেবদা? আপনি কি কিছু বোঝেন না? না, বুঝতে চান না?

কী বুঝব বলতো ইরা? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। শুধু এটা বুঝি যে — অফিসে যাওয়ার ব্যাপারটা বিয়ে করার আগে থেকেই শুরু করেছিলাম। এখন যদি বন্ধ করে দিই তো অভ্যেসটা খারাপ হয়ে যাবে। ফের যদি যাবার দরকার পড়ে, তো তখন আর পারব না ইরা। তাই অভ্যেসটা রেখে চলেছি।

হাসালেন সুদেবদা। যিনি জগৎ সংসার চালান — দেখেন — যার খেলায় এই পৃথিবী খেলে— পৃথিবী ঢলে — তার সঙ্গে অভ্যেস-অনভ্যেসের ব্যাপার কি আর থাকে! জগতের ভার যার ওপর —

কার ওপর জানি না ইরা। তবে আমি তো কারও হাত-তোলা হয়ে থাকতে পারি না। ভরসা করি না।

যিনি ভরসা দেন সবাইকে — যাঁর ওপর সারা জগতের ভরসা — তাঁর পাশে থেকেও ভরসা পান না?

কী করে পাব বল। কাল রাতে ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ে আমাদের এ রাস্তার ইলেকট্রিকের ফেজটা জ্বলে গেল। সারা রাত লোডশেডিং। গরম মশা। গল গল করে ঘামছি। ফোন করলাম সি ই এস সি-র জোনাল স্টেশন ম্যানেজারকে। তো লাইন পেলাম না। তিনিই একমাত্র ভরসা। আজ সকালে তাকে আনিয়ে তবে কারেন্ট ফিরে পেলাম পাড়ার সবাই। তারপর জল এল।

তবে মুখ ধুই। বাথরুমে যাই।

এ তো তুচ্ছ ব্যাপার সুদেবদা।

সুদেব ভৌমিক ইরা বসুর মুখে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন। কোনও কথা বলেননি।

সাত-পাঁচ ভাবনা ইরাকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল। রুক্মিণী মায়ের মুখখানি দেখে সে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন এক ঝাঁকুনিতে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

রুক্মিণী মায়ের কাঁধ থেকে গরদ খসে পড়েছে।

বয়সে ইরা তার চেয়ে কয়েকদিনের বড়ই। কিন্তু ইরা মনে মনে এ কথা ভাল করেই জানে — রুক্মিণী মায়ের এই শরীরটা সামান্য। তিনি অনন্তকাল ধরে আছেন। ছিলেন। থাকবেন। এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে তিনিই ফিরে ফিরে আসেন।

রুক্মিণী মায়ের দুই চোখের তারা তাঁর নাকের ওপর দুই ভ্রূর ঠিক মাঝখানটিতে তাকিয়ে। স্থির। হাঁসের মত লম্বা গলাটি তার মাথাটি ধরে আছে। মাথার ছড়িয়ে পড়া চুল খোলা পিঠের শিরদাঁড়াটি ঢেকে রেখেছে। ঢাকা থাকলেও ইরা বুঝতে পারছে — উপোসে — বসে থাকতে থাকতে — সবার আশা-আকাঙক্ষা পুরিয়ে ক্ষীণ হয়ে আসা কোমর থেকে ওপরের সারাটি শরীর এখন পুজোর সলতে-শিখার মতই সিধে, স্থির — যেন বা যে কোনও মুহূর্তে ফণা তোলা সাপ হয়ে দুলে উঠবে। পদ্মাসনে বসা রুক্মিণী মা তার দু'খানি হাত মেলে ধরে দুই হাঁটু ছুঁয়ে রেখেছেন। দুই হাতের পাতাই খোলা। মেলে ধরা। ঘরের আবছা আলোয় হাতের 'কর-রেখা' পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ইরা।

ঠিক এই সময় রুক্মিণী মায়ের গলা দিয়ে একটি খরখরে আওয়াজ বেরিয়ে এল। এইসব সময় চেনে ইরা। আগেও তার সামনে রুক্মিণী মা দু'একবার এমনটি হয়ে পড়েছেন। এ সব সময় রুক্মিণী মা কথা বললে ইরার মনে হয়েছে — গলার নিচে রুক্মিণী মায়ের বুঝিবা অদৃশ্য কোনও গল-কম্বল আছে। কোনও থলের মত। মাংসের থলে। যার ভেতর জল আছে। পাথর আছে। সেই সব পেরিয়ে তবে গলার ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে।

তুই কী চাস ইরা?

ইরা থতমত খেয়ে গেল। আমি—

হ্যাঁ তুই। কী চাস আমার কাছে?

আমি আবার কী চাইবো!

কী জানতে চাস? বল? কোনও ভয় নেই।

ভয়ের কথা নয় মা। আমার বাবা হারিয়ে গেছেন।

তিনি হারাননি। এই বয়সে কেউ হারায় না ইরা। যদি না তার স্মৃতি হারিয়ে থাকে।

স্মৃতি টনটনে বাবার। মাকে তো দিব্যি চিঠিও লিখেছেন। একদম পয়েন্ট-বাই-পয়েন্ট যুক্তি দিয়ে। রীতিমত চিন্তার —

যদি কেউ নিজেকে ভুলে যায়, তো সে এই বিরাট পৃথিবীতে হারিয়ে যেতে পারে। নিজেকে ভুলে গেলে সে আর নিজেকে খুঁজে পায় না ইরা।

না না। নিজেকে ভুলে যাবার মত ছেলে নয় আমার বাবা। — বলতে বলতে ইরার একসময় খেয়াল হল — রুক্মিণী মায়ের চোখের দুই তারাই হারিয়ে গেছে। চোখের শুধু সাদা জায়গা দেখা যাচ্ছে। ঠোঁট জুড়ে সে কী এক অদ্ভুত হাসি।

ভাল করে মনে করে দ্যাখ ইরা — তোর বাবা মানুষটি কেমন?

ভীষণ ভাল মানুষ। আমাকে খুব ভালবাসতেন। এক সময় তো দু'খানি গাড়ি ছিল বাবার। আমি মা আর বাবা সেই সব গাড়ি করে ওয়ালটেয়ার, এলাহাবাদে বেড়াতে গেছি। ড্রাইভার থাকলেও বাবা নিজেই চালাতেন। আমি বাবার পাশে সামনের সিটে। মা পেছনে। — নিজের বাবার কথা বলতে গিয়ে ইরার এক সঙ্গে হুড়হুড় করে অনেক কথা মনে এসে যাচ্ছে।

সে কোনও কথাই বলতে পারছে না। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সেই দশাতেই কোনওরকমে বলল, খুব ছেলে বেলায় বাড়ির বেড়ালের মুখে মুখ দিয়ে চুমু খেয়েছিলাম মা। বাবার সে কি মার। পরে নাকি আমি বলেছিলাম — আমি কী কয়েছি বাবা? আমি কী কয়েছি? স্পষ্ট করে 'করেছি' বলতে পারতাম না। বাবা সে কথা মনে রেখে প্রায়ই বলতেন — কি 'কয়েছি' বাবা!

তোর বাবা হারিয়ে যাননি ইরা।

তবে বাবা ফিরছেন না কেন? কেন ফিরে আসছেন না। ফিরে না আসায় আমার বুকের ভেতর যন্ত্রণা হয় মা। খুব কম বয়সে আমি নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করেছিলাম — তা তো তুমি জানো মা।

হ্যাঁ। জানি। ইরার মনে হল, রুক্মিণী মা যেন অনেক দূর থেকে কোনও হাঁড়ির ভেতর মুখ ঢুকিয়ে কথা বলছেন। ভারি গলা। সে গলার স্বর দেওয়ালে লেগে ফিরে আসছে।

বাবারও আমার বিয়েতে সায় ছিল। তোমাকে তো বলেছি — বাবা অভিষেককেও ভালবাসেন। পছন্দ করেন। আমার এক এক সময় কী মনে হয় জানো মা?

কী? আমার কাছে বল। কোনও লজ্জা রাখিস না।

আমি অল্প বয়সে বিয়ে করে চলে আসায় বাবা একদম খালি হয়ে গেছেন। কেমন একটা খা খা ভাব সব সময় তার চোখেমুখে। যখন আমার কাছে আসতেন — তখন চুপ করে বসে থাকতেন। কোনও কথা বলতেন না। আমি সব বুঝতে পারতাম মা। কিন্তু আমি যে নতুন একটা সংসারে জড়িয়ে গেছি ততদিনে। শঙ্কু। চিনি। অভিষেক।

সবই মিথ্যে ইরা! সবই মায়া!

এ সব কথা তো সবাই বলতে পারে না। আমার বাবা কি হারিয়েই যাবেন? ফিরবেন না কোনওদিন?

তোর বাবা হারাননি। ফিরবেন রে — ফিরবেন। তিনি তার রামদুয়ারে যাত্রা করেছেন। সময় মত ফিরে আসবেন।

তার মানে কী মা? আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা।

তোর বাবা তার নিজের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। একে বলে ব্রাহ্মীস্মৃতি।

১৩

জেন্দাহা গাঁয়ের দুসাদটোলায় রামটহলদের বাস্তুভিটে মানে বেশ বড়সড় একটি মহুয়া গাছতলার ছায়া ঘেঁষে কাঠা ছয়-সাতের একটি পুকুরের পাড়ে লম্বা মত একখানি ঘর। তার মাথায় খাপরা টালি। দেওয়াল মাটির। চওড়া বারান্দা। বারান্দার নিচেই একটেরে রসুইঘর। তার উল্টোদিকে এক সময়কার গোহাল ঘর। এখন শূন্য।

যোগাড়যন্ত্র করে রামটহলের লাশে আগুন দিতে এখনও দেরি আছে। এদিকে দিন যতই তেতে উঠছে — লাশ সমেত কাঠের বাক্সটি ততই ভেতর থেকে ভিজে উঠছে। তার মানে ভেতরের বরফ গলে উঠছে।

রজত অবশ্য দেখেছে — লাশের নিচে ওপরে, পাশে বরফ চাপানোর পর ভাল করে থার্মোকলের সিট বসানো আছে — যাতে কিনা বাইরের গরম ঢুকে পড়ে বরফকে গলাতে না পারে।

পাশের পুকুর তেমন গভীর নয়। তাতে টোকাপানা বোঝাই। সেদিকে তাকিয়ে রজত পালিত বলল, ব্যান্ড বাজা হোগা — ক্যা নেহি হোগা — ও তো ফয়সালা হোনা চাহিয়ে। তব তক রামটহলকা বাক্সা তোলাও কি ঠাণ্ডি মে রাখনা সবসে আচ্ছা —

এখন আকাশ থেকে সূর্যটা টুপ করে ডুবে যাবে। দূরে উঁচু উঁচু জমিতে লঙ্কা চাষের ক্ষেতগুলো অন্ধকার নেমে এসে মুছে দেবে। মহুয়া গাছের একটা বড় ডাল পুকুরের মাঝ বরাবর শূন্যে এগিয়ে। তারই ছায়া ঠাসা টোকাপানার ভেতর থেকে বুড়বুড়ি উঠল। জায়গাটা ঠাণ্ডা। বোধহয় মাছ আছে। রজত লক্ষ্য করল — তার এ কথায় মোতিয়া বা চামেলীর — কারও কোনও হুঁস নেই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেই সেই একই ব্যাপারে দু'জনে ঠোকাঠুকি চলছে।

মোতিয়া দুসাদের কথা একটিই। সরকার নে সৎকারকে লিয়ে রুপৈয়া মঞ্জুর কিয়া। মেরি বেটা কি সৎকার ভিখারোন কা মাফিক হোনে নেহি দুঙ্গি।

এক একটা কথা বলে মোতিয়া — আর তার যুক্তির জোর বোঝাতে তার শুকনো কাঠি কাঠি পা দিয়ে খটখটে উঠোনে দমক দিয়ে লাথি মারে। রজত ভাবে — পায়ে ব্যথা পায় না মোতিয়া?

চামেলী দুসাদের কোনও তেজ বা তেরিয়া ভাব নেই। সে আস্তে আস্তে কেমন ঝিমিয়ে গেছে। শান্ত গলায় শাশুড়ির কথার পিঠে সে শুধু একটি কথাই বলে চলেছে। মওত কো-ই মজাক নেহি। আভি জুলুস নিকালনেকা ওয়াক্ত নেহি মাইজি —

মোতিয়া দুসাদ ঠেলে ওঠে। মেরা রামটহল ক্যা কোই বেওয়ারিশ লাশ হ্যায়? বাজা নেহি বাজেগি? শাহনাই নেহি বাজেগি?

মেরি মরদ চলবসে। আউর তু উসকা মা হো কর ফুর্তি মচানে চাহতি?

রজত দেখে। শোনে। আর তার চোখের সামনে সন্ধ্যা হয় হয়। পৃথিবীর এক কোণে এই জেন্দাহা গাঁয়ে এ কী নাটক চলছে? মানুষের জীবন কোথাও একটুও থেমে নেই। লাশ হয়ে বাক্সে শুয়ে থাকা রামটহল জানেও না তার মা আর বউ তারই শ্মশানযাত্রায় ব্যান্ড পার্টিভাড়া করা নিয়ে তুমুল ঝগড়া করে চলেছে — যে ব্যান্ডপার্টি তার শবযাত্রায় স্রেফ কোনও হিন্দি ফিল্মের গান বাজাতে বাজাতে শ্মশান অবধি যাবে।

আকাশ নীল হয়ে অন্ধকার হয়ে এল। জেন্দাহার চাষবাসের খলিহানে খলিহানে, মুঠিয়া কলার বোঁটার জায়গাগুলো এবার অন্ধকার হয়ে উঠবে। তামাক বাগানে ডাঁটালো পাতায় পাতায় নাম না জানা কুচো কুচো পাখি সারাদিন ধরে বসবার চেষ্টা করে পিছলে পিছলে পড়েছে। এবার তারা দিগন্ত পার করে দিয়ে কোনও বুড়ো গাছের কোটরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়বে। তাদের জেগে ওঠা আবার সেই কাল ভোর বেলায়। বাঁকে দইয়ের কাঁড়া ঝুলিয়ে এক দল লোক পাটনার দিকে চলল। গণ্ডকের তীর বরাবর গুড়ের নাগরি নিয়ে যাবে বলে ডিঙি নৌকোর ভিড় এখন। ওরা সারা রাত ধরে বৈঠা মেরে তবে গঞ্জের ঘাটে গিয়ে থামবে।

সরকারি টাকাটা রজতের হাতব্যাগে। সে সেটা খুব সাবধানে খাপরা টালির চালার আড়ায় বিচুলির তড়পার ভেতর গুঁজে রেখেছে।

চামেলীর শেষ কথায় মোতিয়া ফোঁস করে উঠল। ক্যা ম্যায় তালিয়া বাজায়া? তব তো লোগ মুঝে গালিয়া দেঙ্গে। ম্যায় চাহা মেরি বেটাকা সৎকার থোড়ি বহুত শানসে হো যায়। এ মেরি আখেরি তমান্না। এ মেরি খায়েস। স্রিফ এক হি চাহত। বাজা বাজেগি। আউর জরুর বাজেগি —

কভি নেহি বাজেগি — বলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল চামেলী।

মোতিয়ার বয়স হয়েছে। সে রামটহলের মা। প্রায় করুণ গলায় বলল, কেয়া রুপৈয়া তো কম নেহি। মেরি এক খায়েস পুরি নেহি হোগি বাবুজি?

রজতের বলার ইচ্ছে ছিল — এখন তোমাদের টাকার দরকার। সরকারের দেওয়া টাকাগুলো তোমাদের দু'জনেরই কাজে লাগবে। ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে সে টাকা উড়িয়ে লাভ কি? চামেলী তো ঠিক বলেছে।

কিন্তু সে কথা মোতিয়ার মুখের ওপর বলতে পারল না। মায়ের অধিকারে ছেলের মৃত্যু বাবদে পাওয়া টাকার খরচায় সেও যে তার ইচ্ছে চাপাতে চায়। এখানে দুঃখের কোনও জায়গা নেই। এখানে আছে ছেলের মৃত্যুকে ব্যান্ড বাজিয়ে গৌরবের আলোয় তুলে ধরার চেষ্টা।

রজত বলল, আভি এ বাক্সা তালাও কি ঠাণ্ডি মে রাখনা জরুরি মোতিয়া। নেহি তো সব বরফ পানি বরাবর হো যায়েগা

তার এ কথায় রাজি হল। বাক্সের একদিক ধরল রজত। আরেক দিক ধরল মোতিয়া আর চামেলী। যে করেই হোক পুকুরের পাড় ঘেষে টোকাপানার দামে বাক্সটাকে ধরাধরি করে খানিক চুবিয়ে রেখে দিয়ে — মহুয়া গাছের শেকড়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে রাতটা কাটিয়ে দিলে কাল সারা গাঁওকে খবর করে সৎকারে বেরনো যাবে ভোর ভোর। এ রকমই ভেবে নিয়েছে রজত।

পুকুরের পাড় ঘেঁষে পাতিঘাস। বাক্স খানিক জলে ধরল ওরা দু'পাশ থেকে। এবার এগোবে।

হঠাৎ সন্ধ্যে রাতের আকাশ চিরে দিয়ে বিকট চিৎকার। গলা ফাটানো চিৎকার।

মোতিয়াদের দিকে বাক্সটা হাত থেকে খসে পড়ল। রজত তার দিকে সামলে নিল। বেশ ভারি বাক্স। তার পা টলে গিয়েছিল। আরেকটু হলেই বাক্স সমেত রামটহলের লাশ পুকুরে পড়ে তলিয়ে যেতে পারত।

বাক্সের উল্টোদিকে মোতিয়া, চামেলী — দু'জনই মাটিতে বসে পড়েছে। সবে ওঠা চাঁদের আলোয় ওদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। সেই অন্ধকার থেকেই মোতিয়া বলে উঠল, পাগলা

হাথি—

তাই তো। এ তো হাতির চিৎকাব। ফের সেই চিৎকারে জেন্দাহার সারা আকাশ চিরে গেল। রজতের খেয়াল হল, আশপাশের লোকজনও এই অন্ধকারে মহুয়া গাছতলায় এসে জড়ো হল।

কী ব্যাপার?

রজতের এ কথায় গাঁয়ের একজন তড়বড় করে যা বলল, — তা সাজালে এ রকম দাঁড়ায়।

আশপাশের চার-পাঁচ গাঁয়ের ভেতর মহাবিয়া নামে এক গুণ্ডা বছর দুই হল এম এল এ হয়েছে। এখন সে শোনপুরের মেলা থেকে মেলা ভেঙে যাবার পর খুব সস্তায় পাগলা হাতি কিনে এনেছে একটা। এই হাতিকে ডাঙশের খোঁচা দিয়ে যখন তখন চেঁচাতে বাধ্য করে। সেই চিৎকার শুনে গাঁয়ের মানুষের বুকে রক্ত থেমে যাওয়ার দশা।

আরেকজন বলল, যব যব ডাকাইতি করনোকে লিয়ে ও মহাবিয়া গুণ্ডো বাহার হোতা,

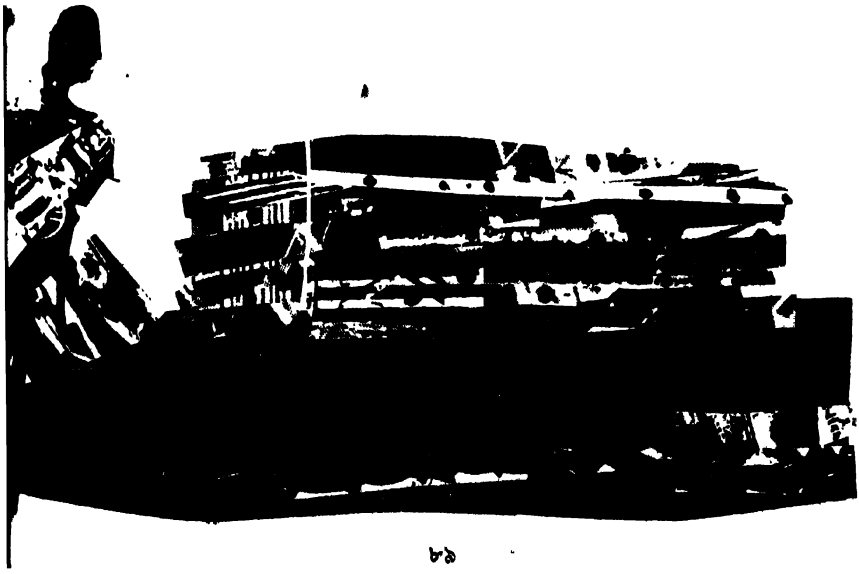

তব উসকা হাথি অ্যায়সা ডাক লেতা।

রজত জানতে চাইল, কিঁউ?

পাগলা হাথিকা ডাক শুন কর সারে গাঁও ডরকে মারে যাতে হ্যায়। গাঁও ওয়ালেকো ডরানে কা ইয়ে এক ধান্দা বাবুজি। পাগলা হাতি কা ডাক মহাবিয়াকা ডাকাইতিমে সুবিস্তা কর দেতা—

লোকটির কথা শেষ না হতেই ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ বাড়তে লাগল। যেন এদিকেই কয়েকটা ঘোড়া ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত মহুয়া গাছতলায় জড়ো হওয়া গাঁয়ের মানুষ নিমেষে উধাও। যে যেদিকে পারে মিলিয়ে গেল।

উঠোনে রামটহলের বাক্স তেরছা হয়ে পড়ে আছে। তার একদিকে মোতিয়া আর চামেলী রীতিমত আতঙ্কে মাটিতে বসে। তাদের মুখে কোনও কথা নেই।

এ কোন দুনিয়া? রজত কোনও কুলকিনারা করতে পারে না। অনেকটা কলকাতায় কানাগলিতে ভোটের সময় ভোটারদের ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে গলির মুখ আটকে খোলা তলোয়ার হাতে মস্তানদের ঘোরাফেরা — বোমা ফাটানোর মতই।

একেবারে অন্ধকার উঠোনে এসে ঘোড়ারা পায়ের ঠকাঠক করে থামল। অন্তত চার পাঁচটা ঘোড়া তো হবেই। তার কোনও একটার উঁচু পিঠে বসা একজন লোহা-কাটাইয়ের গলায় ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল। কাহারে ও বদ চলন —? কথা শেষ না হতেই পাঁচ ব্যাটারির টর্চের ফোকাস এসে রজত পালিতের মুখে পড়ল।

রজত কিছুতেই চোখের পলক ফেলবে না। সে অনেক কষ্টে ফোকাসের মুখোমুখি তাকাল। তাকিয়ে সিধে বলে উঠল, দো বেওয়া — বে-সাহারা আওরতকো জরানেমে লাজ নেহি আতা? না-লায়েক আওরতকি উপর জুলুমবাজি? গুন্ডেবাজি?

ঘোড়ার ওপর থেকে সেই গলা হো হো করে হেসে উঠল। আরে! দেখো দেখো। ইয়ে মহাবলী তো বিলকুল বুঢঢা হ্যায় —।

মুখের ওপর বুড়ো বলায় একটুও ঘাবড়ালো না রজত। সত্যিই তো তার বয়স হয়েছে। মাথায় পাক ধরেছে। সে এগিয়ে গিয়ে কী যেন বলতে যাবে। সামনে এগিয়ে আসা লোকটার ঠ্যাং সে ঘোড়ার পিঠের দু'দিকে দেখতে পাচ্ছে। ঠিক এমন সময় চামেলী ছুটে এসে পয়লা ঘোড়সওয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। কিঁউরে ডরপোক! এম এল এ বন কর দাদাগিরি তেরা আসলি আদত হো চুকা?

ঘোড়ার পিঠ থেকেই পায়ের এক ঠোক্করে মহাবিয়া চামেলীকে মেঝেতে ফেলে দিল। মেঝেতে পড়ে চামেলী ব্যথায় উঃ! — বলে কাতরে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে রজত আন্দাজে অন্ধকারে সেই পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উরু অব্দি খামচে ধরল। চামেলীর মুখ থেকে বাবা গ — বেরিয়ে আসতেই রজতের মাথা খারাপ হয়ে গেল। দু' হাতে সে অনেকটা জড়িয়ে ধরল। তাতে ঘোড়া চমকে গিয়ে এদিক এদিক ঘুরতে লাগল। সেই সঙ্গে রজতও সারা উঠোন হেঁচড়ে ঘুরে যেতে লাগল। তবু সে মহাবিয়ার পা ছাড়ল না।

আবছা অন্ধকার উঠোন ঘোড়ার দাপাদাপিতে একদম তছনছ। ওরই ভেতর ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা মহাবিয়া তার পা ছাড়িয়ে নিতে ছিপটি দিয়ে রজতের গায়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল। তবু রজত লোকটার পা ছাড়ল না। তার পরনের ধুতি ঘোড়ার পায়ে জড়িয়ে গিয়ে ফালাফালা। আর মোতিয়া দুসাদ কোত্থেকে একটা বাঁশ এনে অন্ধকারে ঘোড়ার পিঠে বেদম

জোরে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া লাফিয়ে উঠে রামটহলের বাক্সে ঠোক্কর খেয়ে টলে পড়ল। বাকি ঘোড়াগুলোর সওয়ার এতটা ঘটতে পারে বুঝতে পারেনি। তাদের ঘোড়া পা দাপায় — আবার এগোয় — আবার পেছোয়।

ফের হাতের বাঁশ তুলে মোতিয়া চেঁচিয়ে উঠল। মক্কার! বদমাশ!

মহাবিয়া মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল। গাঁওকা ইজ্জত লুটেরা বাহার কা আদমি — তেরে ইতনে ফুর্তি মাচানা বরদাস্ত নেহি — বলতে বলতে মহাবিয়া এগিয়ে আসছিল।

রজতের পা নিজেরই খসে যাওয়া ধুতিতে জড়িয়ে যাওয়ায় সে অন্ধকারেই টলমলে ঘোড়ার গায়ে ঝুলে পড়ল। অমনি ঘোড়াটা টাল সামলাতে না পেরে তার সওয়ার মহাবিয়ার গায়ে গিয়ে ধাক্কা মারল। সেই ধাক্কায় মহাবিয়া চেঁচিয়ে উঠল। বাবা গ! হয়ত তার পা মাড়িয়ে দিয়ে থাকবে ঘোড়াটা।

ঠিক এই সময় জেন্দাহা গাঁয়ের মানুষজন তাদের একপাল মোষ তাড়াতে তাড়াতে একদম রামটহলদের অন্ধকার তছনচ উঠোনে ঢুকিয়ে দিল। এজন্যে মহাবিয়ার সাকরেদরা একদমই তৈরি ছিল না। বেশির ভাগই পুরুষ মোষ। তারা ভয়ে, গুঁতোগাঁতা খেতে খেতে চাপা থ্যাঁতলানো গলায় চেঁচিয়ে গুঁতিয়ে ঘোড়াগুলোকে বেসামাল করে তুলল। একটা ঘোড়া লম্বা লম্বা পা তুলে মহুয়া গাছটার গুঁড়িতে গিয়ে ছেঁচড়ে পড়েই চিঁহিঁ চিঁহিঁ করে চেঁচিয়ে উঠতেই মহাবিয়ার দলটা ভড়কে গিয়ে পিছু হটল। ততক্ষণে সারা গাঁ ঢ্যাঁড়রা পিটতে পিটতে এগিয়ে আসছে। একজনের মাথায় আবার হ্যাজাক বাতি। যেন বা মেলা বসে গেছে। তবে সে মেলা এক লণ্ডভণ্ড মেলা। মহাবিয়ারা পালাচ্ছে। বিশেষ কর এম এল এ হয়েও এমন জুলুম জবরদস্তির পর মহাবিয়াকে এমন খোঁড়াতে খোঁড়াতে কখনও পালাতে হয়নি। কচুবন, আশশ্যাওড়ার জঞ্জাল ভেঙে।

ওরই ভেতর — মোতিয়া দুসাদের কাপড় প্রায় খুলে গেছে — শিং দুলিয়ে মোষের দল ভয়ের চোটে ঘোড়ার দঙ্গল চিরে পুকুরপাড় ধরে ওপারের দিকে ছুটছে। আকাশের চাঁদটি শুধু স্থির। তার ভেতর পুরুষ মোষদের গলায় ভয় পাওয়া থ্যাঁতা চিৎকার। অন্ধকার খাবলে খাবলে খেয়ে নিচ্ছে হ্যাজাকের আলো। পাড়াপড়শনের খুশির হল্লা।

মোতিয়া গিয়ে রামটহলের ভাঙা বাক্সটার ওপর আছড়ে পড়ল। রামটহলিয়া। রামটহলিয়ারে—

মোষ আর ঘোড়ার এলোমেলো দাপাদপিতে চামেলী দুসাদ মহুয়া গাছটার মোটাগুঁড়ির আড়ালে পড়ে গিয়ে বেঁচে গেছে। থ্যাঁতলায়নি। চিড়ে চ্যাপ্টাও হয়নি।

সে কোনও রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই কেঁদে উঠল। বাবুজি? বাবুজি মর গিয়া হোগা — বলেই সে খোলা চুলে প্রায় পাগলির মতই হ্যাজাকটার কাছে ছুটে এল। তারপর এক লাফে হ্যাজাকের আঙটা লুফে নিয়ে আলোটা উঁচু করে ফের চেঁচিয়ে উঠল, বাবুজি কাঁহা? কাঁহা গায়ে বাবুজি? মহাবিয়ানে লে গয়া হোগা? তব তো মার ডালেগা উনকো। লাশ ভি গায়েব কর দেঙ্গে — বলতে বলতে হ্যাজাকটা শূন্যে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আলোটা কাত হয়ে মাটিতে পড়েই দপ করে নিভে গেল।

সেই অন্ধকারেই একজন চেঁচিয়ে উঠল, মিল গয়ে। বাবুজিকো মিল গয়ে —

তখন রজত পালিত কোনও কথা বলার অবস্থায় নেই। খুলে যাওয়া ধুতির অনেকটাই মোষ

আর ঘোড়ার দাপটে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার। মোষের শিং আর ঘোড়ার ক্ষুর কোনওটাই অন্ধকার বলে থেমে থাকেনি। ডান উরু দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ছেঁড়া ধুতিও ভিজে গেছে। খোলা শার্টের বোতাম ঘর থেকে শার্ট নিচের দিকে ছিঁড়ে গিয়ে প্রায় বুশশার্ট। ডান হাত তুলতে পারল না রজত। মাথা ঝিম ঝিম করছে। মহাবিয়ার ছপটির বাড়িতে বাড়িতে পিঠের দিকেও শার্ট ছিঁড়ে গেছে। অনেকটা সেই দশাতেই সে কোনও রকমে চেঁচিয়ে উঠল, ম্যায় জিন্দা হুঁ ইরা — ম্যায় জিন্দা হুঁ ইরারে -— আর কথা বলতে পারল না রজত পালিত। চামেলী ছুটে এসে তার কোলে রজতের মাথাটি নিয়ে বাবুজি! — বলে চেঁচিয়ে উঠে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। চোট লাগি? কাঁহা লাগি বাবুজি? কাঁ হা? বলে ফের সে রজতের বুকে হাত রেখেই কেঁদে উঠল।

মোতিয়া দুসাদ পুকুরে আঁচল ডুবিয়ে এনে পাশে বসল। বসে বলল, পানি লাগি —

জলের ঝাপটা দিয়েও রজতের চোখ খোলানো গেল না। পড়শি দুটি বউ লোটায় করে জল এনে রজত পালিতের ঠোঁট ফাঁক করে জল ঢেলে দিল।

বাবুজি?

কোনও জবাব নেই রজতের মুখে। চোখ বোজা। চাঁদের আলোতেও বোঝা যাচ্ছে — তার সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে। মুখখানি কালশিটেতে দাগানো। তাকানো যায় না। মাথার চুল খানিক উঠে গেছে। সারা জেন্দাহা গাঁ এখন রামটহলদের উঠোনে। খোদ রামটহল তার বাক্সে শুয়ে। বাক্সটা জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধু চামেলী বলল, ব্যান্ড বাজেগি বাবুজি। বাজা বাজেগি।

১৪

মরসুমের প্রথম বর্ষায় পুব দিক থেকে গঙ্গা পেরিয়ে উড়ে এসে জলভরা মেঘ জেন্দাহার মাঠে মাঠে প্রচুব জল ঝবায়। তখন ঘাসে ঘাসে মাঠ ঢেকে যায়। সেই ঘাসসমেত লাঙলের ফলা সারা মাঠের মাটি ওলোটপালোট করে মাখন করে তোলে। তাতে পাসোয়ান, দুসাদরা বাদে সবাই বীজতলা ভেঙে ধান রোয়। লোকাল লোক বলে — রোপা। সবাই মানে কৈরি, কুর্মি, খাতাড়িয়া দল। যে-সব ডাঙায় ধানচারা ধরানো যায় না — সে-সব জায়গার মাটি জল-খাওয়া ঘাসে পুরু হয়ে ঢেকে যায়। এই ঘাস খেয়ে জেন্দাহার গরু-মোষ গম্ভীর, গোলগাল হয়ে খুব ঘন দুধ দেয়। গরু-মোষ কিন্তু দুসাদদেব। পাসোয়ানদের। তারা আসানসোল, রানীগঞ্জ, ঝরিয়ার কয়লাখনিতে কাজ করে যে টাকা পাঠায় তাই দিয়ে দেখে থাকা মানুষরা শোনপুর মেলা থেকে বেছে বেছে গাই গরু. দুধেল মোষ কেনে। সেই দুধের দই পাটনা, সমস্তিপুর, আরা অবধি জেন্দাহা দহি নাম নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই ক'দিনে জেন্দাহার অনেক কিছুর ভেতর এই দইও রজত পালিতের চোখে পড়েছে।

এখন ভোরবেলা। সেই দইয়েব আস্ত একটি ভাঁড় মাথায় চামেলী সবার আগে আগে হেঁটে চলেছে। তার পেছনে বাঁশের ভারায় রামটহলের লাশ চলেছে জেন্দাহার চার-বেহারার কাঁধে।

রাম নাম সৎ হ্যায়। রাম নাম সৎ হ্যায়। চাল গম্ভীর গলা গণ্ডক ব্রিজ পেরিয়ে পাক্কি সড়কের দুধারের কচু বনে ছড়িয়ে পডছে। ওদের পেছনে পেছনে মোতিয়া দুসাদের হাতে পাটকাঠির

গোছা, কাঁধে নতুন গামছা। মোতিয়ার পাশাপাশি হাঁটতে পারছে না রজত পালিত। মহাবিয়ার হামলার পর তাকে পা টেনে টেনে চলতে হচ্ছে। মাথায় পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে পট্টি বেঁধে দিয়েছিল চামেলী। তাই সই। তাতে রক্তের শুকনো ছোপ। হাতে তিনখানি আখ। জেন্দাহার আখ। হাজিপুর থেকে সৎকারের জন্যে দাওয়াত দিয়ে আনা পণ্ডত্ দয়ানাথ কাল রাতেই বিধান দিয়ে রেখেছে — পরলোক পর কেয়া মিলেগা রামটহলকো? উহা খায়েগা কেয়া? তো সহি জেন্দাহাকা আখ কামিয়াব হো যায়। তাই মোতিয়া দুসাদ রজতের হাতে তিনখানা বাছাই আখ তুলে দিয়েছে। নিজেই রাত থাকতে বেরিয়ে ক্ষেত থেকে ওই আখ কেটে এনেছে।

রজতদের পেছন পেছন জেন্দাহার গুটি তিনেক বউ। তাদের ছেলেমেয়ে। লাঠি হাতে গাঁয়ের সরপঞ্চের ভাইপো। তার আবার কেরোসিনের গুমটিও আছে পাক্কি সড়কে।

সবাই চলেছে। খানিক দূরেই গণ্ডক গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। গাছপালার আড়ালে সেখানকার ফাঁকা আকাশের আভাস ভোরবেলার রোদে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আর সব শেষে আটজনের এক ব্যান্ডপার্টি। মাথায় মাড় দেওয়া মলমলের সাদা পাগড়ি তাদের। বুকে ঝোলানো বিগ ড্রাম। দু' জনের মুখে কর্নেট। একজনের হাতে তাসা। সব বাজনার নাম জানে না রজত। ভোরবেলার অদৃশ্য ঠাণ্ডা বাতাসে ফুর্তির আমেজ চারিয়ে দিয়ে ওরা চড়া মাত্রায় যে ফিল্মি গানটি বাজিয়ে চলেছে তার কয়েক কলি রজতের চেনা —

বোম্বাইসে আয়া এক দোস্ত
দোস্তকো সালাম করো —

সেই খুশির গানে বউ তিনটির সঙ্গী তাদের ছেলেমেয়েরা নেচে নেচে রামটহলের লাশের পেছন ছুটছে। আর রাস্তায় পড়ে থাকা ছড়ানো খই খুঁটে খুঁটে ঠোঁটে তুলতে পেরে জেন্দাহার কয়েকটা কাকও যেন ওই গানের সঙ্গে তালে তালে নেচে উঠছে।

রজত দেখল, এমন শানদার শবযাত্রায় মুগ্ধ, খুশি মোতিয়া দুসাদের মুখে গর্বের আলো ঠিকরে পড়ছে।

হাত ঘড়িটা সে-রাতের অন্ধকারে মোষে-ঘোড়ায়-মানুষে ঘষাঘষি, ঠেলাঠেলিতে কোথায় পড়েছে। খুঁজে পাওয়া যায়নি। রোদের ঝাঁঝ দেখে রজত বুঝল, এমন বেলা ন'টা সওয়া ন'টার বেশি নয়।

সাজানো কাঠে রামটহলের লাশ। সেদিকে তাকানো যায় না। সামনেই গণ্ডক। দূরে পশ্চিম পাড় ধরে গাছপালার কানাত ধরে নদীটি গিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। ব্যান্ডপার্টির দলের একজোড়া কর্নেট বাজিয়ে একটা হরিতকি গাছের তলায় রিড টিপে টিপে সেই একই 'বোম্বাইসে আয়া এক দোস্ত' বাজিয়ে চলেছে। কোথায় বোম্বাই! কোথায় দোস্ত!!

দই নাকি রামটহলের খুব প্রিয় ছিল। কালো করে পোড়ানো মাটির বড় ভাঁড়টি চামেলী মাথা থেকে নামিয়ে চিতার মুখোমুখি রাখল। দইয়ের ভাঁড়ের পাশাপাশি আখ তিনখানি সাজানো সারা। মোতিয়ার হাত থেকে গামছা আর পাটকাঠির গোছা নিয়ে পণ্ডত্ দয়ানাথ বালি বালি গণ্ডক-মাটির ওপরেই বসে গেল। বসেই গাঢ় গলায় এমনই মন্ত্র পড়া জুড়ে দিল যা কিনা 'বোম্বাইসে আয়া এ দোস্ত'কে ও ছাড়িয়ে যায় যায়। এক সময় ব্যান্ড বাজা একদম থেমে গেল। রামটহলের চিতার কাঁচাকাঠে বিষম ধোঁয়া। তার ভেতরেই দয়ানাথের গলা ধাপে ধাপে চড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রোদও চড়ছে। চামেলী যেন বা রামটহল নামে কোনও এক ভগবানের পুজোয় এসে চুপটি করে বসে পড়েছে।

দয়ানাথের মন্ত্র থেকে একটা কথা একদম আলাদা করে উঠে এসে হঠাৎ রজতের কানে বিঁধে গেল। সে রীতিমত চমকে গেল। ফের আবার সেই কথাটাই —

'দরায়ুস।'

আশ্চর্য! গঙ্গার এপারের কথাটা টানটোনে ভারি দয়ানাথের সংস্কৃত মন্ত্রে 'দরায়ুস' আসছে কোত্থেকে?

নিচে কাঠ — ওপরে কাঠ রামটহল তখন গনগনে আগুনে ঝলসে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোতিয়া দুসাদের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। চামেলী এক সময় উঠে গিয়ে হরিতকিতলায় ছায়ায় বসেছে। ব্যান্ড বাজার দল মাথার পাগড়ি-ফাগড়ি খুলে ফেলে ঢিলেঢালা হয়ে বসে।

রজত মোতিয়ার কাছাকাছি গিয়ে জানতে চাইল, পণ্ডতকা মন্তরমে এ 'দরায়ুস' কৌন হ্যায় জি?

কো-ই ভগবান-উগবান হোগা।

জবাবটা পছন্দ হল না রজতের। এ নামে তো কোনও ভগবান নেই।

বেলা পড়ে এলে পোড়া ছাইয়ের ভেতর থেকে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দয়ানাথ পণ্ডত্ রামটহলের আধপোড়া নাই-কুণ্ডুলিটা বের করল। তারপর নিজেই ঢালু পাড় ধরে নেমে গিয়ে গণ্ডকের খানিকটা পাঁকমাটি তুলে নিয়ে সেই মাটি দিয়ে নাই-কুণ্ডুলিটাকে একটা বড় বল করে চামেলীকে ডাকল, আওত্ — আওত্।

চামেলী এগিয়ে আসতে বলটা তার হাতে দিয়ে দয়ানাথ বলল, নদীমে ফেঁক দো —

চামেলীর চোখে কোনও জল নেই। ছাই হয়ে ধসে পড়া চিতায় তখনও আগুন। এবং আকাশের রোদ ঝিমিয়ে এসেছে।

চামেলী পাড়ে খানিকটা নেমে গিয়ে যত জোরে পারে মাটির বলটা ছুঁড়ে দিল। কিন্তু সেটা গিয়ে পড়ল জলের কাছাকাছি। জলে নয়। সঙ্গে সঙ্গে এক পাল কাক সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চামেলী আর সেদিকে না তাকিয়ে ছুট্টে ওপরে উঠে আসছে।

সেদিকে তাকিয়ে মোতিয়া দুসাদ আক্ষেপের গলায় বলল, না-কামিয়াব! রামটহলকা পানি নহি মিলল —

পুরো দলটার জেন্দাহা ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দূরে আখের ক্ষেতে শেয়াল ডেকে উঠল। সবার মুখে চোখে অন্ধকার মেখে যাচ্ছে। তার ভেতর পণ্ডত্ দয়ানাথ বড় মাথাটায় তার টিকি দুলিয়ে ইহলোক-পরলোক নিয়ে কথা বলে চলেছে।

তাল রেখে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে রজতের। তবু তার ভেতর গণ্ডকের বাতাস উঠে সারা গা জুড়িয়ে দিল। সে জানতে চাইল, এ দরায়ুস কৌন হোতা হ্যায়?

পরলোকের কথাবার্তার ভেতর একথা শুনে দয়ানাথ চমকে উঠল। সে জেন্দাহার মানুষজনকে তার কথাবার্তায় রীতিমত মুগ্ধ, আচ্ছন্ন করে নিয়ে গণ্ডক থেকে ফিরছে।

কৌন দরায়ুস?

মন্তরমে দমে দমে জিস্ দরায়ুসকা নাম কর রহতে আপ —

এক পলক থেমে থেকে অন্ধকার রাস্তাতেই দাড়িয়ে পড়ল দয়ানাথ। তারপর হো হো করে হেসে উঠে বলল, ইরানকা বাদশা!

ইরানকা বাদশা? — রীতিমত চমকে উঠল রজত।

কোথায় জেন্দাহা! গণ্ডক!! আর কোথায় ইরানের বাদশা!!! সে কিছুই মেলাতে পারল না।

দয়ানাথের দয়া হল। সে ফের হাঁটা শুরু করতেই দাঁড়িয়ে পড়া শবযাত্রীরা সবাই ফের হাঁটা ধরল। জেন্দাহা গাঁয়েরই কোনও পুরনো গল্প বলছে — এমন ঢঙে পণ্ডত্ দয়ানাথ শুরু করল, বাদশা শেরশাকা ফৌজমে বহুত ইরানি সিপাহি থা। শেরশা যব চলবসে — তবে উহ্-ইরানি লোক ইহাহি রহে গিয়া। ইধারই ও লোক সাদি-সুদা করকে ঘরগৃহস্থী বনাকে হিন্দুস্থানি বন গয়া। ইয়ে সদিয়োকি কাহানী। হমলোগ উস লোগোসে ইয়ে চেহারা পায়া। জেন্দাহা কা কুত্তা দেখিয়ে। উসকা রগমে ভি ইরানি খুন হ্যায়।

বাদশা শেরসাকো ফৌজমে ইরানি লশকরকা সাথ ইরানি কুত্তা ভি থা। জেন্দাহা অউর চারোপাশমে জ্যায়সা কুত্তা অউর আদমি মিলেগা উসকা বরাবর কুত্তা অউর আদমি বাবুজি আপকো সারে বিহারমে নেহি মিলেগা।

কথাগুলো এমন অনায়াসে বলে যাচ্ছে পণ্ডত্ দয়ানাথ — ভাবাই যায় না। যেন এ বছর কেমন বৃষ্টি হবে তাই নিয়ে জেন্দাহার চাষীদের আগাম বুঝিয়ে বলছে দয়ানাথ।

তো ইরানকা বাদশা দরায়ুস ক্যায়সে মন্তরমে আয়া?

অ্যায়সাহি বাবুজি! জেন্দাহাকা চেহারামে — খুনমে — কুত্তামে যব ইরান আ গয়া — তো কেয়া উনকো বাদশাকা নাম হমারা মন্তরমে নেহি আ সকতা?

অকাট্য যুক্তি। কত সহজে ইতিহাসের ফয়সালা। রজত মনে মনে ভেবেও দেখল —

এখানকার কুকুরগুলো রীতিমত ঢ্যাঙা। মানুষজনের মতই। চওড়া কাঁধ। কুকুরের গায়েও যেমন লোম — তেমনি মানুষজনের বুকে-পিঠেও বেশ লোম।

গায়ে ঢুকতে পিপুলতলায় সবার সঙ্গে রজতও খুব অবাক হল। সাকতোড়িয়ার সেন্ট্রাল হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্সখানা ফিরে এল নাকি? মারুতি জিপসিটা?

হেডলাইট নিভে যেতে চোখ সয়ে আসতেই রজত দেখল, মারুতি জিপসি নয় — একটি অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে। দু'পাশের চারখানি দরজাই হাট করে খোলা।

গাঁ-সুদ্ধু প্রায় সবাই গাড়িটা ঘিরে ফেলল। চামেলী, মোতিয়া দু'জনই দাঁড়িয়ে পড়ল। দূরে পাক্কি সড়কের ওপর লরির যে ধাবা দেখা যায় — সেখানেও ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠেছে। কে এলো রে বাবা! কিছুই কেউ বুঝতে পারছে না। মহাবিয়ার ডাকাইতির কোনও নয়া চাল নয় তো? হয়ত সে রাতের বদলা নিতে ফিরে এসেছে। রজত খোঁড়াতে খোঁড়াতে খানিক এগিয়ে নিজের অজান্তেই দুই চোয়াল শক্ত করে ফেলল।

ঠিক তখনই ভিড় ঠেলে বাইরে যে বেরিয়ে এল — সে বিশু।

রজতদা কোথায়? রজতদা — রজত পালিত? তার জন্যে পাটনা থেকে আমরা দুপুর দুপুর এসে বসে আছি। এটাই তো জেন্দাহা গাঁও?

পণ্ডত্ দয়ানাথ এগিয়ে এসে বলল, হাঁজি। আপ কৌন বাবুজিকে বারে মে পুছতাচ কর রহে হ্যায়?

তখনও রজত পালিত ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল না। এখন-এর ফটোগ্রাফার বিশুকে সে চিনতে পেরেছে। এও পরিষ্কার বুঝতে পারছে — নিরসা খনিতে গিয়ে খোঁজখবর করে তবে বিশু জেন্দাহায় এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু আমরা? আর কে এসেছে? সে তো সেই সে নিরসায় এসে অফিসেও আর ফিরে যায়নি। তবে কি অফিস থেকে আরও কেউ এল?

এরকম সাত-পাঁচ ভেবেও রজত ভিড় চিরে সামনে এগোতে পারল না। এখন সে কতদিন কলকাতা থেকে দূরে। খবরের কাগজের অফিসে কতদিন সে ডটপেন বাগিয়ে লিখতে বসে না। সে বুঝিবা দুসাদ টোলারই একজন হয়ে গেছে। মহাবিয়ার হামলার পর হাতঘড়ি গেছে। পায়ের জুতো গেছে। রামটহলের সৎকারের জন্যে কিনে আনা বাড়তি ধুতিখানি তার পরনে। একদম কোরা। তার ওপর ছেঁড়া শার্ট। মাথায় শাড়ি ছিঁড়ে বাঁধা ব্যান্ডেজের ওপর ছোপ ছোপ রক্তের ছাপ। সারাটা দুপুর কেটেছে গণ্ডকের তীরে — চড়া রোদে — কাঠের আঁচ আর ধোঁয়ার সামনে। রজত তখন তখনই এগিয়ে আসতে পারল না। দয়ানাথের কথায় ফটোগ্রাফার বিশু বলল, একহি বাবু —

বিশুর কথায় ভিড়ে অন্ধকারে সারাদিনের ধকলে ঝিমিয়ে থাকা চামেলী ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল। তারপর ভিড় ঠেলে ছুটে এসে রজতের হাত ধরল। কেয়া বাবুজি? ছুপনা কিঁউ চাহতা হ্যায়? আপকো ঢুঁন্ড রহে হ্যায় —

তবুও রজত কোনও জবাব দিল না। সে বুঝতেই পারছে না — বিশুর সঙ্গে কলকাতার অফিস থেকে আর কে — বা, কে কে এল — এসে থাকতে পারে — তা বুঝে উঠতে পারছে না রজত।

কলকাত্তাসে আয়া হোগা। দূর কী রাহি। আপ চুপ রহেগা তো ও লোক ঢুঁন্ডতে রহে যায়েগা—

এবার গাড়ির পেছনের সিট থেকে যে নামল তাকে দেখে সবাই চুপ। রজত পালিত তো

ভাবতেই পারেনি।

গাড়ি থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে নেমে দাঁড়িয়েই ছায়া পালিত যা দেখতে পেল — তা স্রেফ কয়েকটি মাথা। অন্ধকারে কালো কালো। কারও মুখ দেখা যায় না। কেউ বা খালি গায়ে। দু'চারজন মহিলা যে এর ভেতর আছে তাও সে বুঝতে পারল — অন্ধকারেই — বাতাসে দুলে ওঠা ঘাগরার আভাসে।

কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়িতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া মানুষ হিসেবে আকাশের নিচে হাইওয়ের পাশে বিহারের এই জেন্দাহা গাঁ ছায়া পালিতের কাছে একদম অন্য জগৎ। এখানকার সন্ধ্যেরাও, এখানকার মাটি, গাছপালা, কুকুর, মানুষ, কথাবার্তা — কোনও কিছুরই আন্দাজ নেই তার। বরং আছে এক অজানা ভয় — যেখানে এসে তার স্বামী আর বাড়ি ফিরে যায়নি। সে এখানে এখনও আছে কিনা — তা জানে না ছায়া। রজত বেঁচে আছে কিনা তাও সে জানে না। ছায়াকে ফোন করেই বিশু যোগাযোগ করেছিল। তার হিসেব — বউদি সঙ্গে থাকলে রজতদাকে লোকেট করতে — চাইকি ফিরিয়ে আনতেও সবচেয়ে সুবিধে। তিনিই রজতদাকে জানেন। তাই অফিসে পরাশরদার ধাতানির মুখে সবচেয়ে আগে বিশুর মনে ছায়া পালিতের কথাই ভেসে উঠেছিল। খবর করতে গিয়ে একজন মানুষ আর ফেরেননি — এটাই তো নিউজ — তিনিই যে এখন নিউজ — একথা সম্পাদকের মুখ থেকে বেরোনোর পর অফিসের টেবিলে টেবিলে রজত পালিত নামটিই দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। বিশুর পেছন পেছন কালই — নয়ত পরশুই একজন রিপোর্টার এসে এখানে পৌঁছল বলে।

কাল রাতে ছায়া বিশুর সঙ্গে হাওড়া থেকে দানাপুর এক্সপ্রেস ধরেছে। টু টায়ার স্লিপারে রাত দশটার পর সবাই আলো নিভিয়ে দিলে রেলের চাদর, বালিশ গুছিয়ে ছায়া নিজের বেড ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে নিয়েছিল। তারপর চোখে চশমা দিয়ে বারবার পড়া সেই চিঠিখানি আবারও চোখের সামনে মেলে ধরেছিল।

'এই নব্বই কোটি মানুষের দেশে একজন মানুষ তো হারিয়েও যেতে পারে ছায়া। সবাই তো একদিন মরে যায়। মানে চিরকালের মত হারিয়ে যায়। হারানো মানেও যা—মরে যাওয়ার মানেও তাই। একদিন যারা আমায় চিনত—আমায় না দেখলে তারা ভাববে রজত নেই। কিংবা ভাববে রজত চলে গেছে কোথাও। আবার এও ভাবতে পারে—রজত হারিয়ে গেছে। এই ভাববার মানুষজনও একদিন মরে গিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। তখন আমার কথা ভাববার মানুষও ফুরিয়ে যায়। তার মানে তারাও হারিয়ে যায়। আমরা সবাই হারিয়ে যাই। এই দুঃখ থেকে অনেকে অমর হওয়ার চেষ্টা করেন। সেই থেকেই অমরত্বের বাসনা। মানুষের জানা ইতিহাসে খুব অল্প মানুষই অমর হতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁরাও গঙ্গা কিংবা হিমালয়ের অমরত্বের পাশে পিঁপড়ে মাত্র। সিন্ধুর মত নদীও তো একদিন হারিয়ে যায়। যেমন গিয়েছে সরস্বতী নদী। এসব তো মানুষের জানা ইতিহাস। কিন্তু অজানা ইতিহাসের দিকে তাকালে ভয় হয়। সেখানকার অমরের দল কোথায় গেলেন? ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ এগিয়ে আসা মরুভূমি নয়ত মহামারী তাঁদের কথাই মুছে দিয়ে চলে গেছে। আজ আর তা জানার কোনও রাস্তা নেই।

এমন জগতে তোমার মায়া—কিংবা ইরার মায়া—জগৎ সংসারের কর্তব্য—বেঁচে থাকার দরকারে তোমাকে, ইরাকে—শঙ্কুকে—চিনিকে নিয়ে তো থেকে দেখছিলাম।

কিন্তু যখন জানলাম—তুমি আর আমার কেউ নয়— আমিও আর তোমার কেউ নয়—ইরা আমার কেউ নয়—আমিও ইরার আর কেউ নই—তখন শুধু আমার জন্যে বেঁচে

থাকায়—টিকে থাকায় আমার জিভে কোনও স্বাদ পাই না ছায়া। আমাদের শোবার ঘরে গরমকালে পাখার হাওয়া তোমার গায়ে কম লাগে বলে তুমি পাশের ঘরে গিয়ে ঠিক পাখার নিচে এক একদিন শুতে। এটাই স্বাভাবিক। তোমাদের হাওয়া আমার গায়ে আর লাগে না ছায়া। আমার সামনে আর পাশের ঘর কোথায়! কোথায় বা সেখানে ঠিক মাথার ওপরেই পাখা!! তাই আমি হারিয়ে যেতে চাই।

ইরা মেয়ে। আমি তার বাবা। কিন্তু—

১৫

চিঠিখানি পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা মনে নেই ছায়া পালিতের। বিয়ের পর রজত—নয়ত ইরা বড় হলে তার সঙ্গে ছাড়া আর কোথাও আর কারও সঙ্গে ছায়া কখনও ট্রেনে করে—বিশেষ করে রাতের জার্নি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাননি। ফটোগ্রাফার বিশু তার মুখ চেনা। দু'একবার রজতের সঙ্গে বাইরে কভার করতে গেছে বিশু—তা শুনেছে ছায়া। কিন্তু এবারই প্রথম সেইভাবে বিশুর সঙ্গে তার আলাপ।

বিশু এসে বলল, চলুন বৌদি। আমরা একসঙ্গে যাব। আপনি গেলে রজতদাকে ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব। আমাদের একজন রিপোর্টারও যাচ্ছে।

কিন্তু কি করে মনে একটা বাধো বাধো ভাব ছিল ছায়ার। হারিয়ে যাওয়া কিংবা ফিরে না আসা নিজের স্বামীর খোঁজে একা একা যেতে কোনও লজ্জা নেই ছায়ার। সে আর তিরিশ-বত্রিশ বছরের বউ নয়। দুটি নাতি-নাতনির দিদিমা সে। যদিও ছায়া এখনও ক্লাসিকাল অর্থে চেহারায়-স্বভাবে দিদিমা হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে শঙ্কু যখন বলে—দিদিমা তুমি যখন আস, আমি বকুল ফুলের গন্ধ পাই—তখন অল্পবয়সী মেয়েদের মতই তার মুখে একটা লজ্জা, আনন্দ ফুটে ওঠে।

বিশুর সঙ্গে এসেছিল তুহিন। রিপোর্টার। সে বিশেষ কোনও কথা বলেনি। শুধু বলেছিল, বৌদি! আমি অভিষেকের সঙ্গে একসময় একই লিটিল ম্যাগাজিনে কবিতা লিখেছি।

তাই! তুমি কবিতা লিখতে?

হ্যাঁ। গল্পও লিখেছিলাম দু-একটা।

আর লেখ না কেন?

হয়ে ওঠে না। এই তো সকাল সকাল 'এখন' অফিসে যাই—বেরতে এক একদিন রাত বারোটাও হয়ে যায়।

অভিষেক আর তুমি তাহলে বন্ধু।

হ্যাঁ। অভিষেক আপনাদের জামাই হবার আগে থেকেই আমরা বন্ধু।

তাড়াতাড়িতে চারখানা টু-টায়ার স্লিপারে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। তাই হাওড়া স্টেশনে এসে দুই বন্ধু অভিষেক আর তুহিন অর্ডিনারি সেকেন্ড ক্লাসে জায়গা পেয়েও অনেকক্ষণ ছায়াদের কম্পার্টমেন্টে বসে গল্প করছিল। গাড়ি ছাড়ার আগে অবধি দুই বন্ধু আর বিশুতে মিলে কথা বলছিল। ছায়ার কানে সবই যাচ্ছিল। তিনি কোনও কথা বলেননি।

তুহিন বলছিল, রজতদা এমনিতে রসিক মানুষ। পুরনো জার্নালিস্ট। অনেকদিনের এক্সপিরিয়েন্স। দু'একটা কথা বলতেন। এমন ড্রাই হিউমার। আমরা হেসেই অস্থির। নিজে কিন্তু গম্ভীর হয়ে থাকতেন।

রজতের ধাতটা ছায়ার জানা। এক একজন মানুষকে এক একজন লোক এক এক অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে তার নিজের মত করে ওপিনিয়ন ফর্ম করে। ছয় দিকে শির তোলা পেন্সিলের সব শির একসঙ্গে যদি দেখা যেত, তাহলেই শুধু রজত পালিতকে বোঝা যেত। মনে মনে খুবই অস্ফুটে ছায়ার মুখে এসে গিয়েছিল, নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!! এভাবে এই বয়সে কেউ ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে তার নাম দেয়—হারিয়ে যাওয়া?

তখন অভিষেক বলছিল, পিকাসো, কঁকতো, দালি ওঁদের যিনি গুরু—খুব অল্প বয়সেই তিনি মারা যান—ঠিক এখনি নামটা মনে পড়ছে না—একটা গভীর ট্রান্সের ভেতর থাকতে থাকতে কিছুদিনের জন্যে নিজের নামটাই ভুলে গিয়েছিলেন—সেই সময় দালি-পিকাসো-ককতোদের গুরু প্রায় বছর খানেকের জন্যে সাউদার্ন স্পেনে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সময়কার কবিতায় প্রচণ্ড মুর ইনফ্লুয়েন্স—মুররা তো প্রায় ছ'শো বছর স্পেনে রুল করেছে—

ট্রেনে তুলে দিতে আসার লোকজনের ভিড়। গায়ে ঘষাঘষি। কথাবার্তা। কুলি। ওরই ভেতর ছায়ার জন্যে অভিষেক আর বিশু মিলে গুছিয়ে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তুহিন রিপোর্টার মিনারেল ওয়াটারের দুটি বোতল ছায়ার হাতের কাছে সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, রজতদার এই হারিয়ে যাওয়াটাই ইউনিক! বিশেষ করে এই বয়সে। অভিষেক। এটাকে কি আমরা আইডেনটিটি ক্রাইসিস বলতে পারি?

সব কথার মানে ছায়া পালিত কালো রাতের দাঁড়িয়ে থাকা কামরায় বসে বুঝতে পারছিলেন না। তখনও হাওড়া থেকে দানাপুর এক্সপ্রেস ছাড়তে কিছু সময় বাকি ছিল। ছায়া মনে মনে বলছিলেন, কোথায় হারাল লোকটা! দিব্যি আমায় চিঠি লিখছে। আর চিঠিতে বলছে—আমি হারিয়ে গেছি।

অভিষেক বলল, আমি বলব—শ্বশুরমশায় এটা একটা ইউনিক কাজ করেছেন! এই হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কম কথা? হয়ত একদম হারিয়ে যেতে সাকসেসফুল হলেন—কিংবা হারাতে হারাতে ঠিক হারাতে পারলেন না—তবু বলব, সাহসী লোক।

ছায়া নিজের মনেই বললেন, কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড।

ভোর রাতে ট্রেনের ভেতর ঘুম ভেঙে যেতে ছায়া দেখলেন, চোখের চশমা খোলা হয়নি। ভাগ্যিস পাশ ফেরেননি। ফিরলে নাকের ওপর চশমার ফ্রেম চেপে বসে যেতে পারত। ডান হাতে রজতের চিঠিখানি বুকের সঙ্গে চেপে বসে আছে। মাথার কাছে রিডিং ল্যাম্পটা নেভানো হয়নি।

জানলার পাশের সিটে রেলের বেড্ রোলে শুয়ে থাকা বিশু চাপা গলায় বলল, বারাউনি পার হচ্ছি বৌদি —

ছায়া কোনও কথা বলতে পারলেন না। তিনি তার স্বামীর লেখা চিঠির শেষটা তখন পড়ছিলেন—

ইরা মেয়ে। আমি তার বাবা। কিন্তু এখন সে ইরা বসু। শঙ্কু আর চিনির মা। অভিষেকের বউ। অনেক দিন হল সে বিয়ে হয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তার যা কিছু তাকে এখন ফুটিয়ে তুলেছে — সে সবকিছুরই বীজে তার ছেলে, মেয়ে, স্বামী — তার ভেবে ভেবে বের

করা ভাবনাচিন্তা। সেখানে আমি কেউ নই — যদিও আমি তার কচি বয়সের কথাগুলো, মুখের ছিরিছাঁদ, দৌড়ঝাঁপ ভেবে নিয়ে ভাবি — সে আমার মেয়ে। আমি তার বাবা। আসলে তার কাছে আমি আর কেউ নয়। আমি ইরার কাছে গেলে আচমকা তার ব্যাপারের ভেতরে পড়ে তার অস্বস্তি হই। আসলে সে আমার আর কেউ নয়। আমিও আর তার কেউ নয়। আমি বড়জোর ইরার একটি পুরনো ঠিকানা মাত্র।

আর পড়তে পারেননি ছায়া পালিত। দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল। চিঠির অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

সকালে পাটনা সিটিতে নেমেই অনেকবার পাটনায় কভার করতে আসা তুহিন বলদেও পালিত রোডে তার চেনা হোটেলে চটপট দু'খানি ঘর বুক করে ফেলল। তারপর চানটান করে খেয়ে নিয়ে তুহিন আর অভিষেক চলে গেল পুলিসের সদর কোতোয়ালিতে। বিশু আগে থেকেই নিরসায় গিয়ে রজত পালিতকে না পেয়ে অনেক খোঁজখবর করে — তাছাড়া কলকাতায় কোল ইন্ডিয়ার সদরে ঘাঁটাঘাঁটি করে রামটহলদের দেশবাড়ি জেন্দাহা গাঁয়ের নামটি জোগাড় করে রেখেছিল।

তারপর তো সারাদিনের জন্যে গাড়ির বুকিং। গঙ্গার ওপর বিশাল গান্ধী ব্রিজ পেরিয়ে বাঁয়ে গাজিপুরের দিকে যেতে গণ্ডকের কাছাকাছি হাইওয়ে ছেড়ে ডাইনে নামলেই জেন্দাহা গাঁ — এখবর সামান্য পুছতাচেই বের করে ফেলেছে বিশু। সে তার ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছিল না। দুপুর থেকেই ভেবেছে — এতদিনে রজতদা দাড়ি না কামিয়ে মুখখানি কেমন করে ফেলেছেন — কেমন ছবি হতে পারে। পিপুলতলায় গাড়ির দু'দিকের সব দরজা খুলে রেখে গরমটা সামলাতে হয়েছে।

এখন এই সন্ধ্যেরাতের আঁধারে একদঙ্গল গাঁয়ের মানুষের ভেতর রজতদা কোথায়? শুধু শুধু কালো মাথা কতকগুলো। বিশু মনে মনে ভাবল — কোতোয়ালি হয়ে তুহিন আর অভিষেকবাবুর তো এতক্ষণে এসে হাজির হওয়া উচিত ছিল এখানে। আজ না পারলেও কাল তো তুহিনকে এখানে আসতেই হবে। নইলে রিপোর্ট হবে কোত্থেকে?

ওদেরই বা কী হল? এই ভিড়ের ভেতর রজতদাই বা কোথায়? জেন্দাহায় এসে কাউকেই প্রায় সে পায়নি — যার কাছে জানা যাবে — রজত পালিত — রামটহলের বউ, মা কোথায়? কোথায় যেতে পারে? দু'চারজন যাকে পেয়েছে — তারা বিশুর হিন্দি বোঝে না — বুঝলেও ঠেঁট হিন্দিতে যা জবাব দিয়েছে বিশু তার কোনও মানেই করতে পারেনি।

যেন বা মেলা কিংবা উৎসব থেকে ফিরে আসা একদল মানুষের সামনে বিশুর মনটা দপ করে নিভে গেল। এত দূরে এসে রজতদার সঙ্গে দেখা হল না? দেখা পাওয়া গেল না? মানুষটা এখান থেকে চলে যায়নি তো?

গাড়ির পেছনের সিট থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে কোনও কিছুর দিশাই পেলেন না ছায়া। আবছা মত চাঁদের আলো। পিপুল গাছটার ঝুপসি ছায়ায় কারও মুখ দেখা যায় না। একদল মানুষ তাকে দেখতে পেয়েই হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। সারাদিন গাড়ির দরজা খুলে রেখেও বিশেষ হাওয়া পাওয়া যায়নি। ছায়ারও প্রায় আধসেদ্ধ দশা। সে কোনও কথাই বলতে পারল না।

ভিড়ের ভেতর থেকে চামেলী এগিয়ে এসে ছায়ার হাত ধরতেই তিনি চমকে পিছিয়ে গেলেন।

ডরনে কি কোই বাত্ নেহি। কিসকি বারে আপ পরিসান হো রহি হ্যায়?

চামেলীর এ কথাতেও কিছু বলতে পারলেন না ছায়া পালিত। বিশু এগিয়ে এসে বলল, এক বঙ্গালিবাবু —

হ্যাঁ। বাবুজি তো মওজুদ হ্যায়। বাবুজি—?

এবার যিনি ভিড় ঠেলে ছায়া পালিতের সামনে এসে দাঁড়ালেন — তাকে দেখে তো ছায়া চমকে উঠলেন। কোনওদিন দাড়ি রাখেননি রজত পালিত। এখন আবছা অন্ধকারে একগাল দাড়ি। ছায়ার মনে হল — আলোতে নিশ্চয় কাঁচাপাকা দাড়ি চাপ বেঁধে মুখ ঢেকে ফেলেছে। মাথায় ব্যান্ডেজের বাইরে প্রায় জটা-ধরা খানিক চুল বেরিয়ে। শার্ট কি ছেঁড়া? বুকখোলা। অন্ধকারের সঙ্গে পরনের ধুতি মিশে আছে। পা দেখতে পাচ্ছেন না ছায়া।

তুমি? কী মনে করে?

ছায়া পালিত কোনও জবাব দিলেন না।

আমার চিঠি পাওনি?

এবারও ছায়া কোনও কথা বললেন না। মাথা নোয়াতেই চামেলী দুসাদ তাঁর দু'খানি হাত ধরে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, আপ তো মাইজি হোগি। জরুর আপ মাইজি—

বিশু কোনও কথা বলতে পারছিল না। সে তার রজতদাকে দেখেই চিনেছে। ও রজতদা! এ কী করেছেন?

রজত কোনও জবাব দিল না। ছায়ার হাত দু'খানি ধরে চামেলীর এই নেচে ওঠা — ফুর্তি— আতিশয্য— কোনওটাই ভাল লাগছে না তার। সে কড়া গলায় বলল, হাত ছোড়ো চামেলী—

চামেলী দুসাদ দমে যাবার পাত্রী নয়। সে তার নিজের আনন্দেই তেরিয়া হয়ে বলল, কিউ ছোড়েগি। মাইজি আয়া কলকাত্তাসে — কাঁহা উনকো বিঠাউ?— চলিয়ে মাইজি—

ছায়া এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন —

বিশুর কথামত এই তাহলে সেই চামেলী দুসাদ। রামটহল দুসাদের বউ। অল্পই বয়স মেয়েটির।

রজত পালিত চামেলীকে ধমকে উঠল। আভি আভি শ্মশান সে আ রহি হো। ঘর যাও। স্নান উন কর লো পহলে —

ছায়া চমকে উঠলেন। শ্মশান থেকে আসছে? এবার তার খেয়াল হল —

কয়েকটি বাচ্চার কাঁধে মাটির কলসি। অন্ধকারটা সয়ে এসেছে ছায়ার চোখে। বোধহয় দাহ কাজ সেরে নদীর জল নিয়ে ফিরছে। তাহলে রামটহলের দাহ এতদিনে হল? এত দেরি করে? কোথায় রেখেছিল সে মড়া? কি করে রেখেছিল?

চামেলী হেসে বলল, বাংলা বোলিয়ে। হামি বাংলা বুঝে — মাইজি হামাদের ঘরে যাবে। ইনকো পহেলে বইঠাইগি।

এর ভেতর সারা ভিড় একসঙ্গে মাথা নাড়ল। পণ্ডত্ দয়ানাথ বলে উঠল, ও তো সহি বাত।

মোতিয়া দুসাদ কোত্থেকে এক লোটা জল এনে এগিয়ে ধরল, লো পানি পি লো—

ছায়া এভাবে ঘটি উঁচু করে জল খেতে পারে না। সামনের মানুষগুলো, বাচ্চারা — কয়েকজন মহিলা — তাদের চোখ মুখের একটা আন্দাজ পাচ্ছেন ছায়া।

রজত বেশ রূঢ় গলায় মোতিয়াকে বাধা দিল।

নেহি। ওঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন — কলকাতায় ফিরে যাবেন এখুনি।

কভি নেহি — বলতে বলতে চামেলী ছায়ার হাতখানি ধরে হিড় হিড় করে নিজেদের ভিটেবাড়ির উঠোনের দিকে চলল। ইতনে লম্বা সফর করে এখুনি কলকাত্তা ফিরে চলবে? কভি নেহি মাইজি। বাবুজিকো বাত্ ছোড়িয়ে।

আরে! ছাড়ো ছাড়ো। পড়ে যাব যে—

ছায়ার একথায় দাঁড়িয়ে পড়ল চামেলী। চোট লাগি মাইজি?

জবাবে ছায়া কিছু বলে ওঠার আগেই বিশু এগিয়ে এসে বলল, আমরা পাটনায় হোটেলে উঠেছি রজতদা — আজই সকালে।

রজত পালিত চামেলীকে সামলাতে এগল। সারাদিন তোমার শ্মশানে বিতেছে। কুছ দানাপানি নেহি মিলা। তুমহারি শাস ভি ভুখি বিতে। যাও। যাও তুমলোগ। থোড়া আরাম করো।

কাঁহা আরাম বাবুজি! ইতনে দূর কি রাহি — জেন্দাহা তক্ আয়া — আউর তুরন্ত লওট যায়েগি? সো ক্যায়সে হোই বাবুজি?

অনেকদিন পরে রজত ছায়ার হাত ধরল। পড়ে যাচ্ছিলে— ছায়া কিছু না বলে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি চামেলীকে চেনেন না। কিন্তু আনন্দ করে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভেতর মেয়েটির টান ভালবাসায় ছোঁয়া তিনি পেয়েছেন। দেখলেন, চামেলীর মুখের আলো যেন দপ করে নিভে গেল। সারা দিনটা শ্মশানে কেটেছে। রামটহলকে কোনওদিন দেখেননি ছায়া। কিন্তু এত অল্প বয়সে স্বামী হারানো মেয়েটির ভেতর কোত্থেকে এত আনন্দ উঠে আসে তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

রজত গম্ভীর গলায় সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপ্ সব সারে দিনকা মেহনতিকা বাদ বহুত থাক গায় হোগা। থোড়া আরাম করিয়ে। ম্যায় ইন লোগোকো পাটনা তক্ ছোড় দেতা হুঁ—

ততক্ষণে পণ্ডত্ দয়ানাথ থেকে মোতিয়া দুসাদ — সবাই বুঝতে পেরেছে — গাড়ি থেকে নেমে আসা এই বঙ্গালি আওরত বঙ্গালি বাবুজির কৌন হোতি হ্যায়।

মোতিয়া যেন কি বলতে চাইছিল। কিন্তু সবই কয়েক পলকে ঘটে গেল। ছায়ার হাত ধরে খালি পায়েই রজত গিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে বসলেন। সামনে বিশু। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করাতে হিমশিম খাচ্ছে। ওরই ভেতর চামেলী ছুটে এসে গাড়ির জানলায় মুখ দিয়ে বলল, কিঁউ যাতা হ্যায় বাবুজি? উতারিয়ে -- আপকো ভি সারাদিন দানাপানি কুছ নাহি মিলল—

আমি খেয়ে নেবো 'খন। তুমি গিয়ে আরাম কর চামেলী—

কাঁহা আরাম! মৎ যাইয়ে বাবুজি। মাইজিকো লে কর উতারিয়ে। হেই বাবু — বলে চামেলী জানলা দিয়ে বিশুর কাঁধে হাত রাখল, মৎ যাইয়ে বাবু। ড্রাইভার সাব—

গাড়ি ততক্ষণে গিয়ার বদলে স্টার্ট নিল। সন্ধ্যেরাতের পাতলা ঠাণ্ডা বাতাস। অন্ধকারে বিহারের আর পাঁচটি গাঁয়ের মতই জেন্দাহা গাঁ আকাশের নিচে পড়ে থাকল। পড়ে থাকল শ্মশান ফেরত একদল মানুষ। পণ্ডত দয়ানাথ। বাতাসে তখনও বুঝিবা তার গল্প বলার ঢঙে বলা কথাগুলো রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে আছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে হু হু করে গাড়ি ছুটছে। ড্রাইভারের মুখে কোনও কথা নেই। গাড়ির এক জানালায় বাইরের দিকে মুখ করে ছায়া পালিত বসে। আরেক জানলায় বাইরের দিকে মুখ করে রজত পালিত বসে। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

শুধু বিশু একাই কথা বলে চলেছে। যেমন — সন্ধ্যের পর কিন্তু এখানে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা।

তাই না রজতদা?

বিশুর বলার ভঙ্গি এমন যেন --- সে আর রজত পালিত গাড়ি ভাড়া করে কোথাও কভার করতে বেরিয়েছে। যেন এতদিন মাঝে কোথাও কোনও অনিয়ম হয়নি — কোথাও কিছু ঘটে যায়নি। সবই স্বাভাবিক। আগের মতই তারা দু'জনে রিপোর্টিং করতে বেরিয়েছে।

রজত কোনও জবাব দিতে পারল না।

গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। উল্টোডিক থেকে হুস করে লরি, বড় ট্রাক, মাটাডোর বেরিয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি গাছপালা, লোকালয়ের আড়ালে গঙ্গা আছে বলে ডান দিকে দিগন্তের অনেকটাই কেমন ফাঁকা আর ফিকে। সেই ফিনফিনে আকাশে ফুটি ফুটি তারার ভারে আকাশটা যেন কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ছে। তাই মনে হচ্ছে রজতের। তার থেকে বেশ দূরে সরে বসা ছায়ার দিকে সে তাকাতে পারল না। মাত্র কিছুদিন আগে এই পথ দিয়েই কোল ইন্ডিয়ার সাকতোড়িয়া সেন্ট্রাল হসপিটালের মারুতি জিপসি করে সে, মোতিয়া আর চামেলী রামটহলের লাশ নিয়ে জেন্দাহা গাঁয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় রজতের মনে হয়েছিল — জেন্দাহা না জানি কি এক অদ্ভুত জায়গা — যেখানে, রামটহলদের ভিটেবাড়ি, গাঁওয়ালোরা থাকে। এখন রজতের মনে হচ্ছে — জেন্দাহা কী সাধারণ জায়গা — আর পাঁচটি সাধারণ জায়গার মতই সাধারণ। সেখানে সূর্য ওঠে। সূর্য ডোবে। সেখানে পণ্ডত দয়ানাথ শ্রাদ্ধশান্তির কাজ করে বেড়ায়। শবযাত্রায় ব্যান্ডপার্টি চলতি হিন্দিগানের সুর বাজিয়ে শ্মশান অবধি যায়.

বিশু ফস করে বলে বসল কী চেহারা করে বসে আছেন রজতদা? চেনাই যায় না —

রজত পালিত ভাবল, এক একজন মানুষের উৎসাহের কোনও শেষ, নেই। আমি জেন্দাহায় থাকতে থাকতে তো অন্যরকম হয়ে যাবই। রামটহল যখন নিরসায় ছিল—সে কি জেন্দাহার চোখে একদম অন্যরকম হয়ে যায়নি। বিশুর এই অনন্ত উৎসাহের রহস্য রর্জত খুঁজে পায় না। ও অনেকদিন জানে না— রেণু কেমন আছে।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি ছায়া পালিত। তিনি গাড়ির অন্ধকার ভেতরে বসে সামান্য চোখ তুলে রজতকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাতে যা দেখতে পেয়েছেন — তা হল — জটা ধরা একমাথা চুল নোংরা মত কাপড়ের ব্যান্ডেজ। মাথা ফাটল কোত্থেকে? কোনও আন্দাজ করতে পারলেন না ছায়া পালিত। মুখখানি শুকনো শুকনো। তা হবেই। সারাদিন শ্মশানে কেটেছে। কিন্তু গায়ের শার্টটি বোতাম ঘরের নিচেই ছিঁড়ে প্রায় দু'ফাঁক। পরনের ধুতিটি কোরা — তারওপর ভীষণ ময়লা। কোন জামাকাপড় পরে রজত কলকাতা থেকে নিরসায় রিপোর্ট করতে বেরিয়েছিল — তা মনে পড়ল না ছায়ার। কিন্তু পায়ে কোনও জুতো নেই কেন? মারধোর খেয়েছে কোথাও?

এসব কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না ছায়া পালিত। বেশ অনেককাল আর পাঁচজন স্বামীর মতই ছিল রজত তার চোখে। এখন কাগজে আসার আগে রজতদের কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। সেই অফিস বন্ধ হওয়ার বছর দুই আগে থেকেই রজত কেমন বদলে যাচ্ছিল।

ছায়া জানতেন, রজত ভাল করে লিখতে পারলে আর কিছু চায় না। কাগজের রোজকার লেখা তার কাছে রোজকার যুদ্ধ। যতক্ষণ না সে ঠিকমত লিখতে পারছে — ঠিক শব্দটি খুঁজে পাচ্ছে — লেখায় সে আর সবার লেখা থেকে অন্যরকম না হতে পারছে — ততক্ষণ তার কোনও শান্তি নেই। রেস্ট নেই।

রজতদের অফিস বন্ধ হওয়ার আগে থেকেই রজত অফিস থেকে ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে ফিরে

আসত। এসে বলত — অফিসটা একটা হাওড়া স্টেশন হয়ে উঠেছে। কে কী বলছে— কে কী করছে বুঝতে পারি না — শুনতেও পাই না ঠিকমত।

ছায়া বলতেন, তোমার লেখা লেখো লিখে যাও।

লিখে কি হবে ছায়া?

কেন?

জাহাজটা রোজ একটু একটু করে ডুবছে।

তার মানে?

কাগজ ছাপা হলে লোডাররা ঠিকমত ট্রেন ধরায় না। ছাপা কাগজ পড়ে থাকে। পাঠক পায় না কাগজ। সে কাগজে লিখে কি হবে ছায়া — যা পাঠকের কাছে পৌঁছয় না।

অন্য কাগজে জয়েন কর।

আমার মত বুড়ো লোককে নেবে কেন?

তুমি তো কাজ জান।

আমার মত অনেক লোক পাওয়া যায় বাজারে।

প্রায়ই দৌড়ঝাঁপ করে অফিসে গিয়ে দু'চার ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসত রজত। এসে চুপ করে বসে থাকত। এক একদিন ছায়া বলেছে — চল ইরাদের বাড়ি ঘুরে আসি।

গিয়ে কী হবে! ইরা — অভিষেক — ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ওদের জগৎ আলাদা।

ইরা তোমার মেয়ে। এ কী কথা বলছ?

একদিন আমার মেয়ে ছিল। এখন সে অভিষেকের বউ। শঙ্কু-চিনির মা। আমরা — আমি সেখানে রিডানডেন্ট! আমরা মনে মনে সেই ইরাকে ভাবি—যে ফ্রক পরে মাথার চুল দুলিয়ে ছুটে আসত — বাবা কী এনেছ দেখি — বলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে ইরা তো আর নেই। চিরকাল কি মানুষ একরকম থাকে!

কিন্তু আমি যে দিন কে দিন একা হয়ে গেলাম ছায়া। আমার কাজের জায়গা এক বিরাট শূন্য। বাড়ি ফিরে এসে সেই আনন্দ আর পাই না।

সেদিন ছায়া মুখ ফুটে আর বলতে পারেননি — কেন? আমি তো আছি রজত।

পারেননি। কারণ, লজ্জায়, অভিমানে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। দিন দিন রজত কেমন গম্ভীর — চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল। গোড়ায় গোড়ায় ছায়া সবটা বুঝতে পারেনি। 'এখন'-এ জয়েন করে ফের যেন রজতের ভেতর কাজের অনন্দ, আহ্লাদ ফিরে আসছিল।

১৬

বেশি রাতে জ্যোৎস্না উঠল ভাল করে। পাক্কি সড়কের নিচেই ডানহাতি জেন্দাহা গাঁয়ে যাবার রাস্তায় পিপুল গাছটার বড় মত ছায়াটা অনেকটা জায়গা অন্ধকার করে ফেলেছে। কিন্তু তার বাইরেই পায়ে চলা পাথুরে মাটির রাস্তা সাদা হয়ে জ্যোৎস্নার ভেতর জেগে। সেই পথ ধরে খানিকটা এগোলেই রামটহলদের ভিটে বাড়ি।

শ্মশান ফেরত যে যার বাড়ি ফিরে গেল। পণ্ডিত দয়ানাথ সারাদিন খাটাখাটুনির পর একা একাই লরি যাবার রাস্তা ধরে ধাবার দিকে এগোল। ওখানে এখন এই সন্ধ্যে রাতে দূরের রাহি লরি ড্রাইভারদের অনেক মজা শুরু হয়। লম্বা গ্লাসে চা। জিলা মধুবনীর কাঁচা মহুয়া। কত কি।

রামটহলদের উঠোনে উল্টোমুখ করে দু'টি ছায়া বসে। একজন মোতিয়া। আজ তার সুখের সীমা নেই। সৎকারের জন্যে কোল ইন্ডিয়া থেকে দেওয়া টাকার সামান্য খরচা করতেই সবচেয়ে সেরা ব্যান্ড বাজা আনা গিয়েছে। এমন শানদার শবযাত্রা জেন্দাহা গাঁ থেকে অনেকদিন বেরোয়নি।

অন্য ছায়াটি চামেলীর। চাঁদের আলোয় বসে সে শুকনো চিড়ে চিবচ্ছে। আর ভাবছে, এত খিদেতেও খেতে ভাল লাগছে না কেন? কী নেই? কী যেন নেই।

এভাবে ওরা কতক্ষণ বসে আছে তার হিসেব নেওয়ার কেউ নেই। রোজকার মত জেন্দাহা গাঁ ঘুমে ঢলে পড়েছে। আকাশে মাঝে মাঝে ঝাঁক বেঁধে রাতচরা টিয়ার দল চলে যায় — যেখানে গাছে কুশী আম, লিচু, জামরুলের ছড়া পড়ছে — সেখানে। নিচে দু-তিনটে রাতচরা মোষ। ডোবায় নেমে ভিজে ঘাস খোঁজে।

মোতিয়া বলল, বাবুজি লওটেগি কেয়া?

মুঝে কিউ পুছতি হো?

কিসকো পুছু?

ম্যায় ক্যায়সে জানু! উসকি বিবি বরাবর যো আওরত আয়ি থি — উসকে সঙ্গ সঙ্গ চলা গয়ে বাবুজি। কৌন জানে বাবুজি, লওটেগে কেয়া নেহি লওটেগে —

চামেলীর গলায় এই অবহেলা একদম বিশ্বাস হল না মোতিয়া দুসাদের। বাবুজি তাদের একজন লোক হয়ে গিয়েছিল। একদম নিজের লোক। তেমন লোক কি এমন হুট করে চলে যেতে পারে একদম। হঠাৎ মোতিয়া গলা নরম করে জানতে চাইল, হাঁরে চামেলীয়া, এক বাত পুছু?

চামেলী কোনও জবাব দিল না। সে অনেকটা চিড়ে একবারে মুখে পুরে চিবচ্ছে। তার মন বলছিল, এই সময় একটা তাজা — হরা মরিচে এক কামড় বসাতে পারলে জিভে ভাল স্বাদ পাওয়া যেত।

ও চামেলীয়া। তুহারি এক বাত পুছু?

পুছতি যাও।

গরমিন্টকা রুপৈয়া কাঁহা রে?

সব জেনেও চামেলী বলল, কৌন রুপৈয়া?

রামটহলকা বারে মে যো রুপৈয়া মিলা?—বোলো চামেলী দুসাদকো গরমিন্টকা তরফসে যো রুপৈয়া মিলি —

কথাটা সত্যি। কিন্তু কথাটায় মোতিয়ার জন্যে অপমান রয়েছে। রুপৈয়া তো আসলে রামটহলের জন্যে — সে মরে যাওয়ার জন্যে পাওয়া — আর সেই রামটহলকে এই মোতিয়া দুসাদই দশমাস পেটে ধরেছে। চুড়েল চামেলী! তুই তো আর তাকে পেটে ধরিসনি।

এসব কথার কোনওটাই মোতিয়ার মুখে উঠে এল না। নগদ টাকা বলতে যা কিছু তার সবই তো চামেলীর দখলে। শেষমেষ টাকাটা বাবুজির হাতে ছিল তা জানে মোতিয়া। মানে বাবুজি টাকার ব্যাগটা তুলে রেখেছিলেন। আজ শ্মশান খরচা — ব্যান্ড বাজার পাওনাগণ্ডা সবই

হিসেবপত্তর করে বাবুজিই মিটিয়েছেন। তা সেই বাবুজিই তো এক আওরতের সঙ্গে গাড়ি করে চলে গেলেন। ফিরবেন কিনা জানা নেই। সবার সামনে দিয়েই গাড়িতে উঠলেন। কিছু বলেও গেলেন না। ফিরেও তাকালেন না।

মিয়ানো গলায় মোতিয়া বলল, মেরি পাস তো এক ফুটে কৌড়ি ভি নেহি চামেলী।

চামেলীর যেন কোনও পরোয়াই নেই। সে দিব্যি হাল্কা চালে বলল, তব কেয়া?

এত নিশ্চিন্ত? অবাক হল মোতিয়া। সে বলেই ফেলল তব তো তুঝে রুপৈয়া দে গয়া বাবুজি —

চামেলী খচ্ করে ঘুরে তাকাল, নেহি তো —

তব্?

তব কেয়া? বাবুজি কেয়া সারে রুপৈয়া চোরি করকে লে গয়া? বাবুজিকো কেয়া চোর সমঝি?

চামেলীর এই পাল্টা আক্রমণে মোতিয়া একদম বোবা হয়ে গেল। কিছু না বলে রজত আচমকা চলে যাওয়াতে মোতিয়ার মনের ভেতরেও একটা টান পড়েছে। সে কখনোই রজতকে চোর ভাবেনি। কিন্তু হাতে একটা সিকিও নেই। রয়েছে বলতে রুপোর দু'টি পৈঁছা। তা বেচে আর ক'দিন চলবে। তাই খুব সহজভাবেই গরমিন্টের দেওয়া টাকাটার কথা তার মনে এসেছে। রামটহলের বাবা মারা গিয়েছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানির আমলে। তখন ম্যানেজারবাবুদের কুকুরকে ধরার জন্যে — কুকুরকে বেড়িয়ে আনার জন্যেও খনির একটা লোক মোতায়েন থাকত — কিন্তু চাকরি করতে করতে কেউ মারা গেলে, তার বেওয়ার জন্য কোনও পেনশন ছিল না। সেটা ছিল কোম্পানির আমল। আর এখন!

সেই তো। রামটহল খনির পাতালে মারা যেতে মোতিয়ার কপাল পুড়েছে। এখন যতদিন সে বেঁচে থাকবে, তাকে চামেলীর হাতে তোলা হয়ে থাকতে হবে।

অনেকক্ষণ পরে মোতিয়া দুসাদ বলল, কাল সবেরে সবেরে পাটনা যানা পড়েগি—

কিঁউ?

উধার হি তো কইলা ভবন হ্যায় — যাঁহাসে পেনশন উনসনকা ফয়সালা হোতা—

চামেলী ছোট করে বলল, দেখা যায়েগি। — বলেও সে নিজে বুঝতে পারছে না — তার এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন। সে এখনও জানে না — বাবুজি রুপৈয়া কো ব্যাগ কোথায় রেখে গেছে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কি? তাও জানে না চামেলী। সারা উঠোন চাঁদের আলোয় শুকনো — সাদা। চালের খাপরা টালির ওপর দিয়ে বন ধুঁধুলের লতা বেয়ে উঠে নিশুতি রাতের বাতাসে দুলছে মনে হল। বাবুজি কি ফিরে আসবে না? ওই আওরত তাহলে বাবুজির বহু।

রাত বাড়তে সারা দিনের ঝাঁঝালো গরম এবার ঠাণ্ডা বাতাসে মরে এসেছে। আবার একঝাঁক টিয়ে সাঁই সাঁই করে বাতাস কেটে গঙ্গার দিয়াড়ার দিকে উড়ে গেল। মোতিয়া দুসাদ ভাবল, সবাই সব জায়গায় চলে যেতে পারে। শুধু আমারই যাবার কোনও জায়গা নেই। খাবার জন্যে ফুটে কৌড়ি ভি নেহি। আমি এখন কী করব? কাল সকালেই যখন রোদ উঠবে — তখন খিদের চোটে কি চামেলীর পায়ে ধরব? রামজি! এ তুমি আমায় কৌন ফাঁপরে ফেললে? এর ভেতর আবার বাবুজি না বলে চলে গেল? মোতিয়া ভাবতে চাইছিল না — তবু তার মনটা খচ্খচ্ করে উঠল— এই চলে যাওয়ার সবকিছুই কি সাজানো? বঙ্গালিবাবুদের সবকিছু তো সে জানে না। বাবুজি গায়েব হয়ে গেল না তো?

রজত পালিত পাক্কা ছ'কিলোমিটার গঙ্গা ব্রিজ পেরবার সময় ভেবেই পাচ্ছিল না— ছায়ার কী দরকার ছিল তাকে খুঁজে বের করার। তার জন্যে ছায়ার এত উৎসাহ কীসের! সে তো এতকাল রজতকে ফর গ্র্যান্টেড ধরে নিয়েছিল। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে তাদের যে টাকা রয়েছে— তা তো এত শিগগির ফুরোবার নয়। রজনী সেন রোডের মুখোমুখি ইরাদের ফ্ল্যাটেও ছায়ার যেতে বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। আমি, ছায়া — দু'জন আলাদা মানুষ একই ছাদের নিচে বেঁচে থাকার সুবিধার জন্যে এক সঙ্গে ছিলাম — একই ঠিকানায়। তার চেয়ে বেশি কিছু কি?

পাটনা শহরে ঢুকে বিশু ড্রাইভারকে বোরিং রোজ হয়ে দরিয়াপুরের ভেতর দিয়ে চলতে বলল। বিশুর বলা-কওয়া রীতিমত এক্সপার্ট লোকের মত। যেন বহুবার সে এ শহরে এসেছে।

বোরিং রোডে থানার সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে বিশু ভেতরে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে ছায়াকে বলল, নাঃ! ওরা এখনও ফেরেনি। আশ্চর্য! কোথায় যেতে পারে দু'জনে?

কারা ফেরেনি? কোথায় যেতে পারে? কিছুই জানার আগ্রহ নেই রজতের। গাড়ির জানলা দিয়ে সে দেখল, দোকানের সাইনবোর্ডে হিন্দিতে লেখা — দরিয়াপুর, পাটনা সিটি।

রাতের পাটনা জমজমাট। গাড়ি বলদেব পালিত রোডে ঢুকে একটা মাঝারি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তার নামটাও রজত দেখতে পেল — ইংরেজিতে লেখা এক জুতোর দোকানের সাইনবোর্ডে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বিশু বলল — জানেন রজতদা, এই বলদেব সিপয় মিউটিনির সময় এখানে এসে জমিয়ে বসেন। বোধহয় গোরা সোলজারদের ঠিকেদার হয়ে এসেছিলেন। তারই ডিসেনডেন্টদের বাড়ি-ঘরদোর রাস্তার দু'পাশজুড়ে।

এমনভাবেই বিশু এক এক সময় শুরু করে — যেন বা কিছুই ঘটে যায়নি এর ভেতর। সে যেন রজতকে নিয়ে পাটনায় বেড়াতে এসেছে। কালই পাটনার ইতিহাস লিখতে বসবে।

দোতলায় হোটেল ঘরে ঢুকেই ছায়া টেবিলের ওপর রাখা একটা ব্যাগ দেখিয়ে বলল, জামা-প্যান্ট — ধুতি-পাঞ্জাবি — সবই এনেছি তোমার। সাবান মেখে ভাল করে চান করে এসো — মাথায় কীসের ব্যান্ডেজ?

চান করে নেওয়া দরকার তা জানে রজত। সারাদিন গরমে, ধোঁয়ায় শরীরটা চিড়বিড় করেছে। কিন্তু ছায়ার কথার ভেতর — 'সাবান মেখে' কথা দু'টি থাকায় তার ভেতর থেকে একটা আপত্তি উঠে আসতে চাইল। ব্যান্ডেজের কথা সে বলল না।

কিন্তু ছায়া যখন নিজেই ব্যাগ খুলে পাজামা, তোয়ালে বের করে দিয়ে বলল, 'সাবান বাথরুমে আছে—' তখন কথা দু'টি রজতের খুব সাধারণ লাগল। এমন করে তো সবাই বলেই থাকে।

অনেকদিন পরে শাওয়ারের নিচে সাবান মেখে চান করতে কার না ভাল লাগে। গা মুছে পাজামা পরে আয়নার সামনে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে রজত থেমে গেল। তার পাশেই আয়নায় ছায়া দাঁড়িয়ে। তারই দিকে তাকিয়ে।

নিচে বড় সেলুন দেখলাম। দাড়িটা ভাল করে কেটে এস।

না। কোনও দরকার নেই।

বিশু পাশের ঘরে। দরজা আটকানো। তবু ছায়া একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, দাড়ি তো তুমি কোনওদিন রাখতে না।

আমি তো আগের মত আর নেই ছায়া।

ছায়া আর কথা বাড়াল না। সে জানে রজতের কোন জামা পছন্দের। সে বুঝেসুঝেই কলকাতায় রজতের ব্যাগ ভরেছে। ব্যাগ থেকে পাতলা অরগান্ডির ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি বের করে দিয়ে বলল, এটা তো তুমি গায়ে দিতে ভালবাস—

অভ্যেস বশে জামাটা হাতে নিয়ে রজত মাথায় গলিয়ে অনেক দিনের পুরনো অভ্যেস মতই বলে বসল, খাবার কী আছে?

রজতের এ কথা শুনতে ছায়ার ভালই লাগল। এটা তো হোটেল। বিশুবাবু আসুন। বললে হয়ত তোমার পছন্দসই গরম গরম ডাল-ভাতের সঙ্গে মাছ ভাজার ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

পাটনায় — তাও রাতের বেলা, মাছ পাবে কোথায়?

তাও তো — বলে মাঝখানে কথা থামিয়ে রজতের খুব চেনা একটা ভঙ্গিতে ছায়া দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রজতের মনে পড়ল — নিরসায় এসে ইস্তক কতদিন আমি মাছ, মাংস খাই না — বরং অড়হড়ের ডাল, কুঁদরি ভাজি আর রোটিই এখন আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি যেখান থেকে মনে মনে অনেকদিন আগেই একটু একটু করে সরে এসেছি — আবার আমি তখনকার অভ্যেসে ফিরে যাচ্ছিলাম।

রজত বলল, যা হয় কিছু খেলেই চলে। না খেলেও পারি। কোনও অসুবিধে নেই আমার।

রজতকে ফের কেমন শক্ত হয়ে যেতে দেখে ছায়া বলল, অভিষেক ফেরেনি এখনও। এলেই একসঙ্গে খেতে বসা যাবে।

অভিষেক এসেছে নাকি?

আমি আসছি — আমার সঙ্গে আমাদের জামাই আসবে না?

'আমাদের' কথাটা খচ করে রজতের মাথায় বিঁধে গেল। মনে মনে বলল, তাও তো বটে! মুখে জানতে চাইল, কোথায় গেছে অভিষেক?

বোরিং রোডে সদর কোতোয়ালিতে তোমার খোঁজে ডায়েরি করতে গেল ও আর তুহিন। বিশু আমায় নিয়ে তোমাদের জেন্দাহা গাঁয়ে চলল। তখন তো তুমি সৎকারে গেছ। সারাটা দিন রোদে পুড়েছি—

মনে মনে হাসল রজত। আমার খোঁজে কোতোয়ালিতে যাওয়া? ফের অভ্যেসবশে রজত বলে বসল, তুমিও চান করে নাও। বলেই তার খেয়াল হল — জানতে চাইল, কোন তুহিন।

তোমাদের রিপোর্টার তুহিন। বিশু আর তুহিন তো তোমার খোঁজে 'এখন' থেকে এসেছে। সেই সঙ্গে আমাকেও নিয়ে এল বিশু—

ভাল কথা। রজত মনে মনে নিজের কাছে জানতে চাইল, আমার জন্য ডায়েরি করতে গিয়ে এত সময় লাগে? তুহিনকে ভাল করে চেনে রজত? চৌকস রিপোর্টার। সে-ই বা অভিষেকের সঙ্গে কোতোয়ালিতে গিয়ে এতক্ষণ ধরে কী করছে? দু'জন মিলে গেল কোথায়? কোথায় যেতে পারে? আর ভাবতে চাইল না রজত। সে হঠাৎ বলল, আমি—

কোথায় যাচ্ছ?

আমি চলে যাচ্ছি ছায়া। ও হ্যাঁ ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছি। জামাকাপড়গুলো লাগবে। কিনে নেব এমন পয়সাও নেই হাতে।

ঠিক এমন সময় বন্ধ দরজায় কে নক করল। রজতকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ছায়া এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই বিশু। টানটান করে ব্যাকব্রাশ করে মাথা আঁচড়িয়েছে। রজতকে সে বলে উঠল, বাঃ! চানটান করে ফ্রেশ রজতদা— দাড়িটা রাখুন। কাটবেন না। বেশ অন্যরকম

দেখাচ্ছে।

রজত কোনও রসিকতায় যোগ দিতে পারল না। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল, চলি--

একি? কোথায় চললেন? সারাদিন রোদে পুড়ে বসে থেকে আপনাকে হোটেলে এনে তুললাম। অফিসেই বা ফিরে গিয়ে কী বলব? শেষে আমার চাকরিটা খাবেন? আমি না হয় ছবি তুলে নিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু রিপোর্ট? তুহিন ফিরে না এলে তো রিপোর্টই হবে না। ও এসে আপনার সঙ্গে আগে কথা বলুক।

যা চোখে দেখলে তা-ই লিখে দিও—বলে রজত এগোতে যাবে। এমন সময় ছায়া এসে দরজার মুখে দাঁড়াল। অভিষেক ফিরে আসুক—

তার জন্যে আমি কি বসে থাকব? এমন তো কোনও কথা ছিল না।

বাঃ! এ কথা তুমি বলতে পারলে?

বিশু দেখল, ব্যাপারটা দাম্পত্য। সে মানে মানে করে দূরে হোটেলের লবির শেষে বড় জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে বলদেব পালিত রোডে মানুষ, মোটর, ঠেলার এলোমেলো মিছিল দেখা যায়।

ছায়ার চোখে জল এসে গেল। সে কোনওরকমে বলতে পারল, আমিই বা কি করে থাকব? একা। কীভাবে আছি — তা যদি জানতে — আর কোনও কথা বেরোল না ছায়ার মুখ দিয়ে।

বেশ থাকতে পারবে ছায়া। আমি আর তুমি দু'জনেই একা একা বেশ একই ছাদের নিচে ছিলাম। রুমমেটের মতই।

ছায়া কোনও কথা বলতে পারছে না। তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

রজত বলল, তুমি আমার জন্যে কাঁদছ না।

ওরই ভেতর ছায়া চোখ মুছে রজতের মুখে তাকাল।

তুমি কাঁদছ তোমার জন্যে।

অবাক হয়ে গেল ছায়া।

তুমি কাঁদছ এই ভেবে — স্বামী হিসেবে আমি তোমার পাশে — তোমার কাছে না থাকলে — তোমার পরিচয় কী? কি থাকে বলার? স্ট্যাটাস যায় যে! স্ত্রী থাকলে স্বামীর থাকতে হয় পাশে — যদি স্বামী বেঁচে থাকে। আমি তোমার বিবাহিত জীবনের স্ট্যাটাস সিম্বল মাত্র।

ছায়ার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। এই রজতকে সে চেনে না। কোথায় একটা চোরা ফাঁক বেশ কিছুদিন সে টের পাচ্ছিল। কিন্তু সেই অজানা জায়গায় ধসটা যে এতখানি, তার কোনও আগাম নোটিস সে পায়নি। নিরসা যাওয়ার পর থেকেই রজতের সবকিছুই একদম আচমকা। যেমন — না-ফেরা। যেমন — চিঠি।

তোমার, ইরার, অভিষেকের আমি কেউ নই। তোমরাও আমার কেউ নও। তোমরা আলাদা আলাদা লোক। আমিও একজন আলাদা লোক। বাবা, স্বামী, বউ, মেয়ের সম্পর্কের গিঁটগুলো জোর করে বেঁধে দড়ির ছিঁড়ে যাওয়া আটকানো যায় না।

রজতের মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছায়া খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল — শ্রান্ত, ক্লান্ত অভিষেক আর তুহিন সারাদিন পর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। উস্কো-খুস্কো দু'টি মাথা। তখন তখনই বেরোনো হল না রজতের। তুহিন তো দেখতে পেয়েই ছুটে এল, আরে! এই তো রজতদা—

লবির জানলা থেকে এবার বিশুও ফিরে এল। ছায়া দেখল, ক্লান্ত অভিষেক ততটা উচ্ছ্বসিত

হতে পারছে না। একে শ্বশুরমশাই — তারপর তারই অফিস কলিগদের সামনে ফট করে কোনও আবেগ এল না অভিষেকের।

তুহিন এগিয়ে এসে বলল, আমাদেরই উচ্চারণে ভুল ছিল। বলেছি জেন্দাহা। পুলিস শুনেছে — ঝিন্দোহা।

বিশু হাসি হাসি মুখে বলল, তাই?

অভিষেক এগিয়ে এসে বলল, একটা জিপ দিয়ে যে হাবিলদার সাহেবকে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিল কোতোয়ালি থেকে — তিনি আমাদের নিয়ে গয়ার রাস্তায় বৈকটপুরে গিয়ে হাজির। কাছাকাছি ঝিন্দোহা গাঁও পেলাম, তো সেখানে রামটহল বলে কেউ নেই — তখন দুপুর পড়ে এসেছে — চান খাওয়া হয়নি কারও —একটা ধাবায় শেষে—

তুহিন বলল, যাক্। রজতদাকে তো পাওয়া গেছে — বিশু গম্ভীর হয়ে বলল, রজতদা চলে যাচ্ছেন।

তুহিনের মুখটা নিভে গেল। কেন? কোথায় যাবেন?

জেন্দাহায়—

হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল তুহিন। আবার? আবার সেই আশ্চর্য জেন্দাহায়? যে জেন্দাহা আমি আর অভিষেকবাবু সারাদিনেও খুঁজে পাইনি। কেন রজতদা? রজত বা ছায়া — কেউই কোনও কথা বলতে পারল না। অবশ্য ছায়া প্রায় বোবা হয়েই দাঁড়িয়ে। রজত যেরকম শান্ত গলায় জেন্দাহা বলল — চোখের পলক না ফেলে — তাতে পায়ের নিচে হোটেল ঘরের মেঝে সারাদিনের এই গরমের পরেও যেন ঠাণ্ডা লাগতে লাগল ছায়ার। সে পায়ে পায়ে গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল। আজই সকালে পাশাপাশি দু'টি ঘর নেওয়া হয়েছে। ছায়ার ভাবা ছিল — একবার রজতের দেখা পাওয়া গলে, রজতকে নিয়ে সবাই মিলে হোটেলে ফিরে আনন্দ করে গল্পগাছা করা যাবে — খেতে বসে রজতের অভিজ্ঞতার কথাও শোনা যাবে। যেমন হয়ে থাকে আর কি। কিন্তু এ কি হচ্ছে? এত কঠিন--- এত শুকনো আর নিষ্ঠুর ব্যাপার ছোট ছোট সামান্য ক'টি কথায় ঘটে যাচ্ছে।

শেষে রজত পালিতই কথা বললেন। তিনি নিজেকে রজত পালিত ভাবতে পারলে আস্ত একটা শক্ত লোক হয়ে ওঠেন। শুধু রজত ভাবলে তা কিন্তু হয় না— এটা রজত লক্ষ্য করে দেখেছে।

কারণ, আমি সেখানে থাকি —

তুহিন জানে, অফিস তাকে এখানে পাঠিয়েছে — রজত পালিতকে খুঁজে বের করতে। শুধু খোঁজাই নয় — তিনি কোথায়? কেমন আছেন? আদৌ আছেন কি? থেকে থাকলে ফেরেননি কেন? কারণটা কি? পুরোদস্তুর একটা ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্ট করতে হবে। দরকার হলে তিন কিস্তি পর্যন্ত ছাপা যেতে পারে। সঙ্গে বিশুর তোলা এখনকার রজত পালিতের নানা অ্যাঙ্গেলের কয়েকখানি ছবি — তুহিনের মনে হল — দাড়ি থাকায় রজতদার মুখখানা কাগজের পাতায় একটা নতুন ডাইমেনশন পাবে — সেই সঙ্গে জেন্দাহা গাঁয়ের ল্যান্ডস্কেপের একটা আভাস দিতে হবে। যা কিনা ছবি দেখে আর্টিস্ট পেন অ্যান্ড ইঙ্কে ফাইন ফাইন রেখায় আঁকবে। অফিসের প্ল্যান তো তাই। এখনই তো রজতদাকে যেতে দেওয়া যায় না— যেতে দেওয়া হবেও না। কথা বলিয়ে বলিয়ে লেখার পয়েন্টগুলো বের করে নিতে হবে। সেই ফাঁকে বিশু কয়েকটা ফ্ল্যাশ মেরে তার কাজ সেরে নেবে। তুহিন খুব সাবধানে বিশুর দিকে তাকিয়ে চোখ

টিপল। কারণ, রজত পালিত নিজেই তো কাগজের ঘাগু লোক। বুঝতে পারলেই বোবা হয়ে যাবেন।

আপনি তো কস্মিনকালেও জেন্দাহায় থাকতেন না রজতদা। — বলতে বলতে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তুহিন বলল, আপনি তো কলকাতার বাসিন্দা। চিরকালই তাই। আপনিই বলুন?

ছায়া বলে উঠল, আমাদের বিয়ে হয়েছে চৌত্রিশ বছর। একটানা অনেক বছর কলকাতাতেই তো আছি আমরা। তার অনেক আগে থেকেও তো ও কলকাতাতেই।

অভিষেক কোনও কথা বলতে পারছিল না। সে জানে — মানুষ কোনও কোনও সময় আগের সব রেখা মুছে দিয়ে একদম উল্টোদিক থেকে শুরু করে। করতে চায়। সবাই নয়। কেউ কেউ। রজত পালিত ইরার বাবা। শঙ্কুর দাদু। চিনি তার স্কুলের খাতায় ইংরেজিতে এসে লিখেছে — মাই গ্র্যান্ডফাদার ইজ এ ভেরি জেনারাস পার্সন। হি লাভস মি ভেরি মাচ।

রজত পালিত খুব শান্ত গলায় হাসি মুখে বলল, সবাই সবসময় একই জায়গায় থাকে না। মানুষ বাসা বদলায়।

কলকাতায় আপনার এতদিনকার বাসা তুলে দেবেন? কী অসুবিধে হচ্ছিল আপনার?

বিশুর ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠল রজতের মুখে। তাতে রজত পালিতের শান্ত মুখে পলক পড়ল। তিনি তেমনই ঠাণ্ডা গলায় বললেন, জানি তুহিন — আমি তোমার লেখার কপি হয়ে উঠছি। তুমিই বা কী করবে! তুমি তো রিপোর্ট করতেই এসেছ। আর কথা নয়। আমি উঠছি—

আপনিও তো রিপোর্ট করতেই নিরসায় এসেছিলেন। আর ফেরেননি —

কারও কারও এমন হয়ে যায় তুহিন। তোমারও আজ থেকে তিরিশ বছর পরে এমন হতে পারে। চলি — বলে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রজত পালিত।

ছায়া এবার ভাল করে তার চৌত্রিশ বছরের পুরনো স্বামীকে দেখতে পেল। একদম অন্য লোক। অচেনা। আগের তুলনায় অনেক স্লিম। তার মানে বেশ রোগা হয়ে গেছে। রজতের মনে নেই — তার বয়স হয়েছে। এ বয়সে সব ধকল সয় না। শুকিয়ে আসা মুখ দাড়িতে ঢেকে দিয়ে সারা মুখে দিব্যি একটা ঋষি ঋষি ভাব। অভিষেক পথজুড়ে দাঁড়াল। এ ভাবে আপনি যেতে পারেন না। খালি পায়ে। কেটেকুটে গিয়ে টিটেনাস হলে —

এগোতে গিয়ে থামতে হল রজতকে। অনেকদিন পরে ভাল করে চান করা শরীরটা হাল্কা লাগছে। তারপর গায়ে পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি। কিন্তু পেটের ভেতর খিদেটাও খিদের চোটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে রজতের। সে ভাল করে অভিষেককে দেখল। তুমি কবিতা লিখছ?

মাঝে মাঝে লিখি। শঙ্কু — চিনি আপনার কথা খুব বলে। অনেকদিন যাননি আপনি। আসছেন না কেন — তাই জানতে চায় ওরা।

বলোনি ওদের?

কী বলব?

আমি চলে গেছি — এ কথা ওদের বলবে।

সে কথা আমি বলতে পারব না। এ কি? খালি পায়ে যাচ্ছেন কোথায়?

আমি তো আজকাল খালি পায়েই চলাফেরা করি। জেন্দাহায় কেউ তো জুতো পরে না। জুতো তোলা থাকে ঘরের আড়ায়। পাটনায় যেতে হলে পায়ে গলিয়ে নেয়। তোমার অ্যাপোলিন্যারের কথা মনে আছে?

খুব। আপনি ভোলেননি দেখছি।

তোমার কাছেই একবার শুনেছিলাম। স্প্যানিশ কবিতাজুড়ে তাঁর ছায়া — তুমিই বলেছিলে।

হুঁ।

সাইবেরিয়ার উপকূলের বাতাস তাঁর কবিতার সুরে। তাই না অভিষেক?

তা তো বুঝলাম। কিন্তু এ কী? আপনার মাথায় কাটল কী করে? রক্ত শুকিয়ে আছে।

ও কিছু না।

কিছু না মানে! শুকনো রক্তের ভেতর চুল আটকে রয়েছে।

শুকোলে অমন হয় অভিষেক। চান করতে গিয়ে ব্যান্ডেজটা ফেলে দিয়েছি বলে দেখতে পাচ্ছ।

টেডভ্যাক নিয়েছেন?

স্বপ্নের ভেতর যখন আমাদের পা কাটে — কেটে যায় — আমরা কি তখন টেডভ্যাক নিয়ে থাকি? বলে হাসতে হাসতে ব্যাগটা হাতে নিয়েই রজত বেরিয়ে যেতে গেল।

দরজায় অভিষেকের পাশে তুহিন এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের পেছনে বিশু। তার হাতে ফ্ল্যাশগান।

তুহিন বলল, আপনি এভাবে কীভাবে যাবেন? শরীর খারাপ করে ফেলেছেন। কলকাতা থেকে বৌদি এসেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

রজত কোনও জবাবই দিল না। ছায়া খাটে বসে মাথা নিচু করে আছে। যেন বিছানায় হারানো ছুঁচটা খুঁজছে। তুহিন এবার অন্যদিক থেকে একটা কথা পাড়ল। আপনার যা এক্সপিরিয়েন্স — এখনও আপনার দিক থেকে প্রফেশনকে অনেক কিছু দেওয়ার ছিল।

এবারও রজত কিছু বলল না।

আপনি নিজেকে বঞ্চিত করছেন। আপনার ভেতরে দেখার যে চোখ আছে — আপনার কপিতে যা আমরা পাই — সেই সব লেখা না লিখে — লেখা বন্ধ করে দিয়ে আপনি নিজেকেই ঠকাচ্ছেন।

আমার জীবন আমার তুহিন। তোমার জীবন তোমার। প্রফেশনের চেয়েও জীবন বড়। এবার আশা করি আমায় যেতে দেবে তোমরা—

অভিষেক না বলে পারল না, শঙ্কু আপনার জন্য ছটফট করে। প্রায়ই আপনাদের বাড়ি যেতে চায় — আপনাকে দেখার জন্যে—

তাই? তা যাবে ওখানে। ও বাড়ি তো আর আমার নয়। তার দিদিমা রয়েছে — তার কাছে যাবে।

১৭

রজতের কথায় ছায়া চোখ তুলে চাইল। সেই চোখে তাকিয়ে রজত জানতে চাইল, শঙ্কুর মা কেমন আছে?

ছায়া আর থাকতে পারল না। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, শঙ্কুর মা তোমার মেয়ে — তোমারই মেয়ে! এ কথাটাও ভুলে গ্যাছো নাকি!

ভুলবো কেন? সে এখন পুরোদস্তুর একজন মানুষ। ইরা দুই ছেলেমেয়ের মা। এখন আর আমাকে তার দরকার নেই। আমি তার রিডানডান্ট।

আপত্তি করে উঠে দাঁড়াল ছায়া, কে বলেছে? ইরা সব সময় তোমার কথা বলে।

বাবা নামে একটা অভ্যেসের ফিনফিনে সম্পর্ক আছে। তাই বলে। কিছুদিন বাদে আর বলবে না।

বিশু এতক্ষণ চুপ ছিল। সে এবার সবাইকে সরিয়ে সামনে এগিয়ে এল। এ সব কী পাগলামো করছেন রজতদা? বৌদি আপনার স্ত্রী —

তোমার মত ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প না খুলতে হলেও তোমাদের ভেতরকার টানের মতই আমাদের ভেতরেও টান ছিল। সেই টানেই আমি সংসার করে এসেছি। একদিন দেখি সে টান আর নেই। সেই টানের দাগটা পড়ে আছে শুধু।

এরকম কথা কখনও শোনেনি বিশু। ডিভোর্সের কথা সবাই জানে। কিন্তু এ কেমন? ডিভোর্স করিনি — অথচ তেমন টান নেই বলে চলে যাচ্ছি — তাও এই বয়সে — দুজনেরই বয়স হয়েছে। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

ছায়া পালিতও মাথা তুলতে পারল না। তার মন বার বার জানতে চাইছে — টান জিনিসটা কী? কাকে বলে? তা কখন চলে যায়? আমি তো টের পাইনি। কী একটা অপমানে তার দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ও ভাল করে দেখতেও পেল না — রজত পালিত কখন চলে গেল। কেননা — ঝাঁঝালো অপমানে তার চোখ বুজে এসেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরির সামনে এসে একটা অটো ধরল রজত পালিত। এখন খালি পায়ে হাঁটা অভ্যেসে এসে যাচ্ছে। অটোওয়ালা জেন্দাহা চেনে। বলল, সে গণ্ডকের ওদিককার লোক। কিন্তু ফেরার পথে সওয়ারি মিলবে না। তাই আপডাউন ভাড়া দিতে হবে। চামেলীদের পয়সা এভাবে খরচা করা যায় না। রজত হাঁটা ধরল। তার কোমরেই টাকার ব্যাগটা ভাল করে বেঁধে নিয়েছে রজত — বাথরুমে চান করার সময়। হাজার হোক পরের টাকা। পেনশন টেনশন তো পরের কথা। এখন এই টাকার দিকেই তাকিয়ে আছে মোতিয়া, চামেলী।

পাটনা গান্ধী ময়দান বাঁয়ে রেখে হাঁটতে হাঁটতে ডান হাতে পড়ছে নানান সরকারি অফিস। খবরের কাগজের এতদিনকার চাকরিতে রজতকে নানান সময় এ সব দিকে আসতে হয়েছে। অফিসবাড়ি সব রাতের বেলায় অন্ধকার এখন। ওসব জায়গায় খবরের জন্যে যাদের কাছে ও গিয়েছে — তাদের নাম মনে নেই — যাওয়ার কারণটাও মনে নেই আজ — দিনক্ষণ তো মনেই নেই। ওই তো কোল ইন্ডিয়ার দৈত্য সমান 'কইলা ভবন'।

গঙ্গা ব্রিজে এসে উঠতে উঠতে রাত যেন নিশুতি। একবার মনে হল — এতগুলো টাকা কোমরে নিয়ে এভাবে হেঁটে আসা তার ঠিক হয়নি। যদি কেউ কেড়ে নেয়। আলোর খুঁটি বসানো ব্রিজটা মাঝে মাঝে ভারি লরির ছুটে যাওয়ায় কেঁপে উঠছে। নিচে অন্ধকারের সঙ্গে

গঙ্গা মিশে আছে। ফুটি ফুটি তারার ভারে ঠিক ব্রিজের মাথায় আকাশটা ঝুলে পড়েছে।

রজত পালিত নিজেই নিজেকে বলল, আমি এ কোন জীবনে যাচ্ছি?

আরেক রজত তার কানের কাছে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, চেনা জীবন থেকে অচেনা জীবনে।

ওখানেও যদি দেখি ভেতরে ভেতরে কোনও চোরা টান পাচ্ছি না? তাহলে? চেনা জীবনেও তো সেই চোরা টান না পেয়ে আজ রাতে তুমি জেন্দাহা চলেছ।

জেন্দাহায় গিয়ে একদিন যদি দেখি — ওখানেও ভেতরে ভেতরে কোনও টান নেই? তখন?

তখন আবার আরেক নতুন জেন্দাহায় যাবে।

তাহলে আমি কার?

কারও নও তুমি।

তাহলে কে আমার?

কেউ নয় তোমার।

ব্রিজের মাঝামাঝি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রজত পালিত। এ সব কী হচ্ছে! বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জল ভরার সময় কলসীও কথা বলে। কৃষ্ণকান্তের উইল? না, কোথায় যেন। ঠিক মনে পড়ল না রজতের। ও বুঝল, নিজেই ও মনের কথাটা ফাঁকা ব্রিজ পেয়ে নিজেকে শুনিয়ে যাচ্ছে।

রজত দেখল, খালি পায়ে হাঁটলে নিজের পায়ের তলা কেমন শিরিষ কাগজের মত লাগে। পৃথিবী আসলে কিছু ধুলো আর কিছু জল। তার ভেতর পায়ের গায়ে জুতোর মলাট দেওয়া একটা অভ্যেস মাত্র। এই তো দিব্যি খালি পায়ে হাঁটছি। সঙ্গে সঙ্গে তার মন ভেতরে ভেতরে হো হো করে হেসে উঠল। নতুন করে টান ভালবাসার জগতে ঢুকতে হলে কি আমাদের সাবেক সব অভ্যেস ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে? যেন জুতো খুলে শুদ্ধ, শুচি হয়ে মন্দিরে ঢুকছি! মাঝ ব্রিজে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের ভেতর মাঝ-গঙ্গাকে খোঁজার চেষ্টা করে হেরে গেল রজত পালিত। এবার হন হন করে হাঁটা ধরল।

ব্রিজ থেকে নেমে বাঁ হাতি ঢালাই অ্যাপ্রোচ রোড বেশ অনেকটা ছুটে গিয়ে পাক্কি সড়কে মিশেছে। সেই মেশার মুখে পয়লা দোকানে আলো এখনও নেভেনি। ওখান থেকে আরও অনেকটা এগিয়ে পাক্কি সড়কের গা থেকে নেমে যাওয়া রাস্তা চলে গেছে জেন্দাহা।

রজতের ভাগ্য ভাল। অ্যাপ্রোচ রোডের মুখেই এক টাঙাওয়ালা টাঙা থামিয়ে এক গাল হেসে বলল, আইয়ে বাবুজি —

রজত উঠল না। সঙ্গে এতগুলো টাকা রয়েছে। বুঝে নেওয়ার জন্য বলল, কেয়া আপ মুঝে পহচানতে?

কিঁউ নেহি বাবুজি আজই ম্যায় কর্নেট বাজাতে থে —

রজত বুঝতে পারল না।

উঠিয়ে বাবুজি। ম্যায় তো আজ সবির সে ব্যান্ড বাজায়া। কর্নেট বাজাকে আপকা সাথ শমশান গয়া —

ও হো। বলে রজত পালিত টাঙায় উঠে বসল। লোকটি এর পর যা বলল — তা হল — সে দিনে দিনে ব্যান্ড বাজিয়ে রাতে রাতে নিজের টাঙা চালায় 'ইধার উধার'।

রজতকে পিপুল গাছের ধ্যাবড়া মত ছায়ার মুখে ছেড়ে দিয়ে ফের পাক্কি সড়ক ধরবে বলে টাঙা ফিরে গেল।

ছায়ার বাইরে একদম জ্যোৎস্নায় পড়ে গেল রজত। আর কোনও ছায়া নেই। জ্যোৎস্নার সামনে আর কোনও আড়াল নেই। সারা জেন্দাহা এখন তার চোখের সামনে স্পষ্ট। রাস্তার আশেপাশে কেউ জেগে নেই। ভারতবর্ষের গাঁয়ে ঘুম বড় তাড়াতাড়ি আসে।

রামটহলদের ভিটে বাড়ির সামনে এসে রজত পালিত দাঁড়িয়ে পড়ল। বউ শাশুড়ি দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল? ঘুমিয়ে পড়তেই পারে। সারাদিন যা গেছে। চালের খাপবা টালির গায়ের শ্যাওলা অব্দি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে — এত ঝকঝকে চাঁদের আলো।

শুনশান উঠোনে ঢুকতে যাবে — ঠিক এমন সময় দু'টি আলাদা গলা প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল, কৌনরে?

মোতিয়া আর চামেলী দুজনই উঠোনের দুইদিকে পিঠ ফিরে বসেছিল। তাদের ভয় পেয়ে যাওয়া গলা শুনেই রজত বলে উঠল, ম্যায় হু —ম্যায়—

কোনদিকে বসেছিল — তা ঠিক মত বুঝে ওঠার আগেই চামেলী কোত্থেকে ছুটে এসে রজতকে কোমরে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এক চিরে যাওয়া দেহাতি গলায় কেঁদে উঠল, বাবুজি — ই-ই —

রজতের ডান হাতখানি আপনাআপনি উঠে গিয়ে তার মাথায় বোলাতে লাগল।

কান্না আর হাসি মিলিয়ে চামেলী তখন একটানা বলে চলেছে — বাবুজি লওট আয়া — লওট আয়া —

এই কান্নার মুখে — এই হাসির মুখে কোনও কথাই এল না রজতের মুখে। ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে — দুই বয়সের এই দুই আওরত তার ওপর কতটা নির্ভর করে। অথচ এদের সঙ্গে কিছুদিন আগেও তার কোনও সম্পর্ক বা জান-পহেচান ছিল না।

কান্নায় বুজে আসা পুরুষালি চড়া গলায় মোতিয়া অনেক কষ্টে একটি কথাই বলতে পারল, বাবুজি। আপকো বহুকো কাঁহা রাখকে আয়া?

এ কথায় চামেলীর হুঁশ হল। মাইজিকো কিঁউ নেহি লে আয়া?

দু'জনেরই জিজ্ঞাসার ভেতরের কথায় না গিয়ে রজত পালিত ছোট করে বলল, পাটনামে রহে গ্যয়ি —

মোতিয়া চড়া গলায় জানতে চাইল, কাঁহা?

হোটেলমে —

এবার চামেলী অনুযোগের গলায় বলল, বিঁ ম্যায়নে পাকা দেতি —

কী করে বোঝাবে রজত — ছায়া পালিত জেন্দাহায় থাকতে আসেনি। এসেছিল তাকে নিয়ে যেতে। চলতি ধারণায় তাই তো ভাবা উচিত এই দুই আওরতের।

মুঝে কুছ খানে দো।

রজতের এ কথায় চামেলী — মোতিয়া — দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেন এতক্ষণ পরে নিজেদের খিদের কথাও ওদের মনে পড়ে গেল।

রজত ফের বলল, বহুত ভুখ লাগা —

এককথায় চামেলী সাত তাড়াতাড়ি রোটি পাকানা শুরু করে দিল। মোতিয়া বোধহয় কোনও সময় বিড়িটিড়ি খেত। কোত্থেকে একটা ঠুকনি বের করে উনুন ধরিয়ে ফেলল। শুকনো

কাঠকুটো গাঁয়ের অভ্যেসে দিনে দিনেই জোগাড় করা থাকে। সেগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে দু'জনেরই মুখ আলো করে ফেলল।

ওরই ভেতর খুব হাসি হাসি মুখে চামেলী জানতে চাইল, মাইজি কেয়া কাল আয়েগি?

নেহি —

হোটেলমে রহে যায়েগি?

নেহি —

অবাক হয়ে চামেলীর কথা বন্ধ হয়ে এল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, তব কব্ আয়েগি?

নেহি আয়েগি। কাল কলকাত্তা কা গাড়ি পাকড়েগি —

মোতিয়া এ সব কথায় এল না। গোড়ায় রামটহলের বাবার সংসার — তারপর রামটহলের সংসারে সে অনেক পোড় খেয়েছে। মানুষের কিছু বিশ্বাস নেই। আকাশের নিচে এই আজব দুনিয়ায় নানান কিসমের মানুষ থাকে। সাহেব লোক। উঁচা উঁচা অফসর লোগ। আবার ধাওড়ার বাসিন্দা মাইনিং সর্দার। গ্যাং খালাসি। এক এক ধরনের লোকের এক এক ধরনের সংসার হয়। সে সব সংসারের রহস্যও এক এক রকম। তারপর কলকাত্তাওয়ালী বঙ্গালী বাবুর বাঙ্গালীন — সে যে কীরকম হবে — তার কোনও আন্দাজই নেই মোতিয়ার। সে আপন মনে চাঁদের আলোয় ভাজি ভাজতে লাগল।

তিনজনে খাওয়া শেষ করে লওটা-ভর পানি পিকে দেখল—রাত ফিকে হয় হয়। আশপাশের গাছে গাছে পাখিদের ঘুম ভেঙে গেছে। সে কী আহ্লাদ তাদের গলায়। একটা নতুন দিন শুরু করার আনন্দ। এক এক পাখি এক একরকম গলায় ডাকছে। যেন জলে ভেজা ভরাট গলায়। বিশাল কোনও জামরুল গাছের সবুজ পাতার আড়ালে। জেন্দাহার কাকের গলায় যেন সবচেয়ে বেশি করে তৃপ্তি ঝরে পড়ে।

ঘুমনে যায়েগা বাবুজি?

ভোররাতের বাতাসেব ভেতর চামেলীর এ কথায় তার শাশুড়ি মোতিয়া দুসাদও যেন আনন্দে নেচে উঠল। কে বলবে—এই দুই বে-সাহারা আওরতের সবচেয়ে আপনজনকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে গণ্ডকের তীরে দাহ করা হয়েছে। জীবন এখানে অনেক নবীন। মোতিয়া বলে উঠল, চলিয়ে বাবুজি। চলে চলো—

ভোররাতের বাতাসে গাছপালার গায়ে শিশিরের ছিটে। তাই এসে গায়ে লাগছে সবার। গাঁ ছাড়িয়ে গণ্ডক বরাবর খানিক খানিক করে কেটে নেওয়া আখের ক্ষেত। ঘন সবুজ পুরুষ্ট সব আখের কালো কালো গাঁট। ওরা ঘন হয়ে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে।

শুধু দেখার আনন্দ। শুধু ঘোরার আনন্দ। এক পয়সা খরচা করারও রাস্তা নেই এখানে। কাঁচায়-পাকায় মোতিয়ার মাথায় যে এত চুল—তা আগে লক্ষ্য করেনি রজত। এখন সেই খোলা চুল বাতাসে উড়ছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে মোতিয়া দুসাদ বলল ইহা কাঁহি রামটহলকা বাপ দাদাকো জমিন থা-—

কাঁহা?

সো ম্যায় ক্যায়াসে বলুঁ? মেরি দিন তো বিত গ্যয়ি নিরসামে!

রজত পালিত মনে মনে বললেন, তাও তো বটে।

বাকি দিন জেন্দাহামে বিত যায়ে তো বহুত খুব!

মোতিয়ার এ কথায় তার মনের ইচ্ছা বেরিয়ে পড়ায় চামেলী একদম গুম হয়ে গিয়ে বড় বড় পায়ে একাই গাঁয়ের দিকে ফিরতে লাগল।

একদিকে অখুশি হয়ে চামেলীর হঠাৎ ফিরে যাওয়া। আরেক দিকে মুখ ফসকে মনের কথা বলে ফেলে—একরকম চামেলীর হাতে তোলা হয়ে থাকা নিরুপায় মোতিয়ার দাঁড়িয়ে পড়া। কোনদিকে যাবে রজত পালিত। রজতের হাল বুঝেই যেন মোতিয়া বলল, চলিয়ে বাবুজি। ঘর চলে—

ভাল করে সকাল হতেই রজত জেন্দাহার জীবনে জড়িয়ে গেল। এ দেশে ঘরের মেয়েদের বড় কাজ রসুই সামহালনা। বালবাচ্চাকো পালপোষনা। আর বাড়ির মোষের দুধের দই পেতে—সেই দইয়ের ভাঁড় মাথায় করে পাক্কি সড়কের ধাবায় ধাবায় বেচতে যাওয়া। লরি ড্রাইভাররা খুব লস্যি খায়।

মোতিয়া দুসাদের গাইমোষ কিছুই নেই।

ক'দিন বাদেই মোতিয়া জেদ ধরল, রামটহলের সৎকারের পরেও অনেক টাকা বেচে গেছে। একটা ভাল দেখে দুধেল মোষ কেনা হোক। সেই দুইতে পারবে। সেই দুধ দিয়ে শাশুড়ি বউতে মিলে দই পাতবে। চামেলীর বেরোবার দরকার নেই। মোতিয়া নিজেই মাথায় করে একদিন অন্তর একদিন ধাবায় গিয়ে বেচে দিয়ে আসবে। মোষ কেনার কথায় আগুন জ্বলে গেল। চামেলী এক ধমকে শাশুড়িকে বসিয়ে দিল। তখন অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রজত একটা রফা করে দিল। ও নিজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দুধ কিনে আনবে। মোষ পোষার ঝামেলা রইল না। অনেক টাকা একসঙ্গে ঢালতেও হল না। কয়েক দিনের দুধ কেনার টাকা নিয়ে নামলেই হল। তারপর দইয়ের টাকাই দুধ জোগাবে।

তিনদিন হল ছায়ার দিয়ে যাওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি গায়ে সে জেন্দাহার বাড়ি বাড়ি ঘোরে। যাদের দুধ কেনে—তারাই মাথায় করে দুধ পৌঁছে দিয়ে যায়। রজতের শুধু কিছু টাকা পকেটে নিয়ে বেরনো। এ দেশে ওর নাম—বঙ্গালীবাবু।

জেন্দাহা আর তার আশপাশের গাঁয়ে দই একটি কুটির শিল্প। এখান থেকেই পাটনাতেও দই যায়। কাজের ভেতর থেকে থেকে মোতিয়া আর চামেলীর ভেতর ঝগড়াঝাঁটি কমে এল। জ্বাল দেওয়া গরম দুধ মাটির ভাঁড়ে সাজা রেখে পেতে যাওয়া।

রজতের চোখের সামনে জেন্দাহার গাছপালার রঙ, আকাশের রঙ. পাখিদের গলার স্বর পাল্টে যাচ্ছে। রজতের জীবন এখন দই।

রোজ চলে যাওয়া একটা করে দিন—পরদিনই রজতের কাছে সেদিন বলে মনে হয়। সেই সেদিনের কথা সে যেন কোন্ বইতে পড়েছে।

এরকমই এক সেদিনে, মোতিয়া তখনও দই বিক্রি করে ফেরেনি। রজত হাত কোদাল দিয়ে উঠোনের ঢাল কুপিয়ে কুপিয়ে আল দিচ্ছিল। এ দেশে এটা তার দেখা। বর্ষার দেরি আছে। তবু সবাই দিচ্ছে। আচমকা বর্ষা এসে পড়লে চৌহদ্দির মাটি ধুয়ে—মিশে যাবে না পাশেরই চৌহদ্দির সঙ্গে। সীমানা একাকার হলে অনেক ঝামেলা।

মাটি কোপাতে কোপাতে রজতের পিঠ ঘামে ভিজে গেছে। সকাল ন'টা-দশটা হবে। চামেলী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার পিঠ মুছে দিল। রহনে দিজিয়ে বাবুজি—

কিঁউ?

ইয়ে আপকা কাম নেহি বাবুজি।

চামেলীর এই জবাবে মোতিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হল না। সে ফের চেঁচিয়ে উঠল গাহেক নেহি লিয়া। পুরা বড়া ভাঁড় বরবাদ। চুলহাকা আগি নেহি দেখা?

দেখকে কেহা হোগা? আসলি লকড়ি নেহি। সিরিফ সুখা আগসে দহি কা আগ্ কভি বনতি?

মোতিয়া আর সহ্য করতে পারল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ছুটে গেল — আর চামেলীর মাথাটি ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

ঘেমে নেয়ে ওঠা রজত খালি গায়েই দু'জনের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। সে কাউকেই ছাড়াতে পারে না।

চামেলীও ছাড়ার পাত্র নয়। সে মোতিয়ার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল. বুঢ়টি! তেরি ইতনি তেজ?

চামেলীর ধাক্কার সঙ্গে এঁটে ওঠার কথা নয় মোতিয়ার। সে ছিটকে গিয়ে সজনেতলায় পড়ল। পড়েই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

সে কান্নায় মৃত রামটহলের স্মৃতি। সে কান্নায় বয়স হারিয়ে ছেলের বউয়ের হাতে তোলা হয়ে থাকার দুঃখ। সে কান্নায় এক বড় ভাঁড় মহেঙ্গা দহির সবটা বরবাদ হওয়ার কষ্ট।

চামেলী আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ত। তা যাতে না পারে — সে জন্যে রজত ওদের দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

সারা জেন্দাহা আগুনে পুড়ছে। আশপাশে কেউ নেই। বৃষ্টি নামতে এখনও কিছু দেরি আছে।

আস্তে আস্তে মাটিতে পড়ে থাকা মোতিয়া দুসাদ নিজের কান্না গিলে ফেলতে লাগল।

১৮

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সেই যাকে বলে 'ঘনাইছে' — ঠিক সেই ভাবেই থাক থাক মেঘ এসে রজনী সেন রোডের সামনের ফ্ল্যাট বাড়িটার আকাশে সকাল থেকেই জমা হচ্ছিল। যেখানে যেটুকু রোদ ছিল তার সবটাই মেঘেরা দল পাকিয়ে বিকেল চারটের ভেতর একদম ঢেকে ফেলল। সারা কলকাতা বড় আশায় আশায় সারাদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে। তাদের আশা মত আকাশ কালো করে এমন বৃষ্টিই নামল যার ভেতর কখন সূর্য ডুবল — বা কখন সন্ধ্যে হয়ে এল, তা বোঝা গেল না। ফ্ল্যাট বাড়িটার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইরার চোখের সামনে সারা কলকাতা ঝাপসা হয়ে গেল।

শঙ্কু আর চিনি নতুন ক্লাসে উঠেছে। এখন গরমের ছুটি। চিনি বৃষ্টি নামার আগে কাছেই ভরতনাট্যম শিখতে গেছে। নিশ্চয় ফিরতে পারছে না। শঙ্কু গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফটের মুখে বল লোফালুফিতে ব্যস্ত।

দুপুর থেকে অভিষেক তার টেবিলে। পড়ছে? না লিখছে? তা জানে না ইরা। এক একদিন এভাবে টেবিলে বসে থেকে অভিষেকের আর অফিস যাওয়া হয়ে ওঠে না। সেদিনের পরদিন টানা চার পাঁচদিন অফিস করে অভিষেক সব কাজ তুলে দেবে। তার পরেই সেই সারাদিন টেবিলে বসে থাকার, পড়াশোনার, লেখালিখির একটি দিন চলে আসে। আজ সে রকমই একটি

দিন এসেছে।

ইরা হঠাৎ দেখল, তার চোখেও জল। হাত দিয়ে মুছে নেবার পর খেয়াল হল — তাকে এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে শুধুই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। তার চোখের সামনের কলকাতা জলের ধারায় মুছে গেছে। সে আবার সারাটা মন একত্র করতে চোখ বুজে ফেলল। তারপর খুব চাপা গলায় বলতে লাগল, বাবা। ফিরে এস। ফিরে এস —

মাটি থেকে কয়েকতলা ওপরে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে শূন্যে হাঁটতে হাঁটতে রজত পালিত যদি সিধে ঝুলবারান্দায় চলে আসত, তাহলে ইরার খুশির কোনও শেষ থাকত না।

সে ফের বলল, ফিরে এস বাবা। তুমি তো কোনওদিন এমন ছিলে না বাবা। ছেলেবেলায় আমি যখন সন্ধ্যেরাতে ঘুমিয়ে পড়েছি — তুমি তো আমার স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে সোজা আমার কাছে চলে আসতে।

ইরার শেষের কথাগুলো আর মুখ দিয়ে বিড় বিড় করেও বেরোল না। সে কথাগুলো তার মনের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। সে যাওয়ায়, একটা সুখ আছে। আনন্দ আছে। যেন বা সত্যিই তেমন ঘটছে — বা এখুনি ঘটবে। কী আনন্দের।

সত্যি সত্যিই ইরা যখন স্কুল টাস্ক সেরে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ত, কোনও কোনওদিন রাতে — তখন তার বাবা বেশি রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসত। বাবার ঘুম ভাঙানোর একটা বিশেষ কায়দা ছিল। যেন অনেকদূর থেকে — যেন বা স্বপ্নের ভেতর তার নাম ধরে ডাকত বাবা। সে ডাক বাতাসে ভেসে ভেসে তার কানে এসে পৌঁছত। অনেকটা এরকম ই-রা-আ-আ

চোখ ভরে ফের জল এলেও ইরার মুখে আগেকার সেই ছোট ইরার হাসি ফুটে উঠল। ঘোর অন্ধকারে নদীর বুকের লঞ্চের মত বাড়ি বাড়ি কিছু আলো। সে আলোও লোডশেডিং হলে দপ করে নিভে যেতে পারে। রজনী সেন রোডে হাঁটু জল। হাত রিকশার ঠুন ঠুন। এ পাড়ায় বাড়ির পর বাড়ির জঙ্গলে কী করে একটা ঝাকড়া জামরুল গাছ টিকে গেছে। তার ভিজে অন্ধকার ডালপালার ভেতর কোনও পাখির বাসা ভেঙে যাওয়ায় সে কী একটানা চেঁচামেচি। এক অদ্ভুত দশা এখন ইরার। সে না পারছে ভাল করে হাসতে। না পারছে ভাল করে কাঁদতে। বিয়ের আগে বাবার সঙ্গে তার যে জীবনটা ছিল — আনন্দের — আহ্লাদের — তা যেন ছেলেমেয়ে নিয়ে এই বেশ কয়েক বছরের সংসারের আড়ালে চলে গিয়ে শুধু স্মৃতি।

সে ব্যালকনিতে পাতা বেতের চেয়ারটায় এসে বসল। তার পর সারাটা মন এক জায়গায় করে নিজের দুই ভ্রূর মাঝখানে বেঁধে ফেলতে চাইল। এই জীবনের কোনও আনন্দই তার কাছে বাবা ছাড়া পুরো মনে হয় না।

রুক্মিণী মা বার বার বলেছে, দ্যাখো ইরা মনকে দুই ভ্রূর মাঝখানে আনতে পারলে বাকি পৃথিবীর সবকিছু তুমি ভুলে যাবে। একবার সেখানে যেতে পারলে তুমি তোমার মনের মুখোমুখি হতে পারবে। তখন তুমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে।

চোখ বুজে ইরা এক বিরাট অন্ধকারের ভেতর প্রায় দেখতেই পাচ্ছে — তার নাকের ওপর দুই ভ্রূর মাঝখানটায় তিন ব্যাটারির টর্চের ছোট ডুমের মতই কী একটা জ্বলে উঠছে। ঠিক তখনই ঢোলা পাজামার ওপর আরও ঢোলা পাঞ্জাবি গায়ে অভিষেক পায়ের হাওয়াই চটিতে ফট ফট আওয়াজ তুলে খোলা দরজার সামনে আলনা হাটকাতে হাটকাতে চেঁচিয়ে উঠল, আমার সাদা ফুল শার্টটা কাচতে দিয়েছ নাকি?

অভিষেকের গলার আওয়াজ ভারি আর গাঢ়। ফোনে শুনতে আগেকার বিকাশ রায়। কিন্তু কাছাকাছি যখন চেঁচাবে — তখন মনে হবে এই বুঝি পটাং করে তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে গেল।

চোখ খুলে গেল ইরার। না — বর্ষা নামছে বুঝতে পেরেই আজ কিছুই কাচতে দিইনি। শুকবো কোথায়?

বাঁচিয়েছ। কোথায় গেল শার্টটা?

ওখানেই আছে। সারা আলনাটা ঘাটছ কেন?

পাচ্ছি না তো।

এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরোবে এখন? চিনিকে আনতে হবে কিন্তু।

বৃষ্টি ধরলে তুমি গিয়ে আনবে চিনিকে —

বাঃ! নিজে ঘুরতে বেরোবে —

আর আমি গিয়ে মেয়েটাকে ভিজে ভিজে নিয়ে আসব? আমি এখন কোথাও বেরোব না। আমার বেরোবার উপায় নেই। শার্টটা খুঁজে দাও তো —

একটু অবাক হয়েই ইরা উঠল। এই তো। খুঁজে পাচ্ছ না? তোমার জিনসের ট্রাউজারের

নিচেই তো রেখেছ কাল রাতে — বলতে বলতে সাদা ফুল শার্টটা বের করে দিল ইরা।

ইরার হাত থেকে শার্টটা একরকম কেড়ে নিয়ে অভিষেক শার্টের কাফের জায়গাটা আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগল।

কী খুঁজছ?

কোনও কথা না বলে বাঁ হাতার কাফটা চোখের সামনে মেলে ধরল অভিষেক। এই তো — বলেই সে মাঝের ঘরের টেবিলে চলে যাচ্ছিল।

ইরা পেছন থেকে অভিষেককে টেনে ধরল. কী দেখি?

ছাড়।

দেখি না — বলে শার্টটা কেড়ে নিল ইরা।

ওঃ।

অভিষেক কোনও কথা বলল না।

আবার শার্টের হাতায় ডটপেন দিয়ে হিজিবিজি কেটেছ? কাচলে উঠবে?

তাড়াতাড়িতে লিখে রেখেছি। যদি ভুলে যাই।

এখন পড়তে পারবে?

শর্টে লেখা আছে। একটা শব্দ দেখলেই পুরো লাইনটা মনে পড়ে যাবে। পাছে হারিয়ে যায়। তাই —

একটুখানি হেসে ইরা বলল, বাবা কেন একদম হারিয়ে গেল?

টেবিলে ফিরে যাচ্ছিল অভিষেক। গেল না। ইরার মুখে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, রজত পালিত তো হারিয়ে যাননি। এই বয়সে কেউ তো হারায় না। এক যদি—

কী?

এক যদি তিনি নিজেকে বেমালুম ভুলে যেতেন —

নিজেকে?

হ্যাঁ ইরা। যদি নিজের নাম — নিজের ঠিকানা ভুলে যেতেন — কিংবা 'আমি কে'?— তাই যদি মনে করতে না পারতেন — তাহলেই শুধু তিনি হারিয়ে যেতে পারতেন।

বাবা তো কিছুই ভোলেননি।

হ্যাঁ। ভোলেননি। তিনি আমাদের একদম ভুলতে চান। এখনও সবটা ভুলে উঠতে পারেননি। ভুলতে চান তিনি। ভুলে গিয়ে — আমাদের সঙ্গে এই জীবনটা ভুলে গিয়ে তিনি অন্য জীবন শুরু করতে চান।

কিন্তু কেন?

অভিষেক কোনও জবাব দিল না। সে শার্টটা হাতে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। তারপর হাতার ওপরে লেখা শব্দগুলো চোখ নামিয়ে খুটতে লাগল। সাদা শার্টের ওপর ডটপেনের হিজিবিজি। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এক জায়গায় একটা কথা উদ্ধার করা গেল। চপ্পল। আরেকটু এগিয়ে কয়েকটা ঢেউ লাইনের মাঝখানে 'নলেন' কথাটি উঁচু হয়ে আছে। কী ভাবতে ভাবতে অভিষেক হঠাৎ ডটপেনটা বাগিয়ে খস খস করে লিখতে শুরু করে দিল —

মানুষ জন্মালে তার বাবার চপ্পল
বারান্দায় কুচকাওয়াজ করে

মানুষ জন্মায়
জন্মেই ঘুমিয়ে পড়ে অবিলম্বে তুলোর তুলতুলে
ইগলুর ভেতরে
মানুষের বাবা

এই শব্দে এসে থমকে গেল অভিষেক। সে বিড় বিড় করে বলে উঠল, মানুষের বাবা — মানুষের বাবা —

কোনও গানের ধুয়ো ধরার মতই সে নিজেকে শুনিয়ে হারানো কথাগুলো তুলে আনার চেষ্টা করতে লাগল। কাল অফিসে বিকেলের দিকে এই কথা কটি বুড়বুড়ি কেটে তার ভেতরে ডুবে যায়। কুয়োয় ডুবে যাওয়া বালতি তোলার মতই সে তার নিজের ভেতরে কথাগুলো ভাসিয়ে তুলতে চাইছে।

মানুষের বাবা
সরবতি লেবুর মত কড়াপাক নলেনগুড়ের সন্দেশের
মত মায়াময় হয়ে হাসপাতালে মানুষের মায়ের শিয়রে
জেগে থাকে ধাই আর প্রসূতিধামের
টাকাকড়ি গোনে

এবারে থেমে গেল অভিষেক। যেন অনেক খাটুনি গেল — এইভাবে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে কবিতার মাথার দিকে চোখ বোলাতে গেল। একদম শুরুতে। যদি কোনও কথা — কোনও শব্দ তাড়াতাড়িতে বাদ পড়ে গিয়ে থাকে — বাদ গিয়ে থাকে। আমি চললাম —

ঘোরের ভেতর মাথা তুলে অভিষেক দেখল — শাড়ি পালটে ইরা ছাতা হাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোথায়? এই বৃষ্টির ভেতর?

বৃষ্টি ধরে আসছে। তুমি গিয়ে চিনিকে নিয়ে আসবে একটু পরে।

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি —

ট্রাম নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে। যাবে কীসে? বাসে উঠতে পারবে না।

না পারলে অটো আছে। অটো না পেলে রিকশা।

কবিতার ঘোর তখনও কাটেনি অভিষেকের। চোখ কেমন আচ্ছন্ন। সেই দুই চোখ দেখতে দেখতে ইরা বাইরে বেরিয়ে সদর দরজা কড়া টেনে বন্ধ করে দিল।

ট্রাম লাইন তখনও ডোবেনি। ডোবার আগের শেষ ট্রাম ধরল ইরা। দু'চারটে কাপড়ের দোকান আলো জ্বেলে বসে আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে দেখতে পেল, তার বাবার নেমপ্লেটটা এক স্ক্রুতে ঝুলে পড়েছে। আরেক দিকের স্ক্রু নেই। ভীষণ রাগ হল ইরার।

দরজা খোলাই ছিল। সামনের ঘরে কেউ নেই। পাখা ঘুরছে। খাবার ঘরে টেবিলে চুল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে মা।

দরজা খুলে বসে আছ? কেউ যদি ঢুকে পড়ে —

ঊষাকে পাঠিয়েছি চিরুনি কিনে আনতে। কেউ ঢুকবে না।

মিস্ত্রি ডেকে বাবার নেমপ্লেটটা তো ঠিকমত লাগিয়ে রাখতে পার।

ছায়া তার মেয়ের মুখে না তাকিয়ে বলল, আর নেমপ্লেট!

এতটা হতাশ হয়ে বসে থাকার মত কিছু হয়নি মা। যাবে কোথায়! শেষ অব্দি বাবাকে

ফিরতেই হবে।

এবারও মেয়ের মুখে না তাকিয়ে ছায়া বলল, ফিরেছে!

গোড়া থেকেই যেন সুর কেটে আছে আজ ইরার। সে হঠাৎ বলে ফেলল, তোমারও তো কিছু করার ছিল মা।

আমি?— এই প্রথম মেয়ের মুখে তাকাল ইরা। আমি কী করব?

কথাটা ইরার বলার ইচ্ছে ছিল না। তবু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তুমি বাবাকে তার স্ত্রী হয়ে ঠিক মত সঙ্গ দিতে পারনি মা।

ছায়া কথা খুঁজে পেল না। শুধু বলতে পারল, আমি?

হাঁ মা। তুমি কি তার সঙ্গী হতে পেরেছিলে? আমি তো ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি—

কী দেখে এসেছিস? বল?

থাক মা। চা করি? খাবে

না। যা বলার বল তুই।

তবে শোন। বাবাকে দেখেছি নতুন নতুন ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কোথাও যাওয়া। কোনও বই যোগাড় করে পড়া। কাগজ থেকে কোথায়ও পাঠালে সে ব্যাপারটা নিয়ে ষোল আনা মাথা ঘামাতে। আর তুমি?

দিশেহারা ছায়া বলল, আমি কী? আমিও কি নিত্যিনতুন পাগলামোতে ঝাঁপ দেব? দিলে সংসারটা চলত?

তুমি তখন স্টিলের বাসন কেনার মাস্থলি লটারিতে টাকা পাঠিয়েছ। পছন্দসই নুনদানি কিনতে বাজারে ঘুরেছ।

একটা একটা করে সেইভাবেই তো থালা, বাসন, ডেচকি সব করেছি। লটারিতে। নয়ত পুরনো কাপড় দিয়ে। তা না করলে মাটির সানকিতে ভাত খেতে হোত তোকে?

না হয় খেতাম। তুমি তাহলে বাবার ঠিক ঠিক সঙ্গিনী হতে পারতে মা।

কী করে হব? বিছানার চাদর দরকার। বালিশের ওয়াড় ছিঁড়ে গেছে। তোমার বাবার সেদিকে নজর নেই। এক পুরনো বইওয়ালা অফিসে এসে বই দিয়ে যেত — আর তিনি গুচ্ছের টাকা দিয়ে সেসব কিনে এনে বাড়িতে টাল দিয়ে রাখতেন।

ইরা দেখল, কয়েক মাস আগে নিরসায় রিপোর্ট করতে যাওয়ার আগে অবধি কেনা বই সত্যিই তার বাবার টেবিলে টাল হয়ে পড়ে আছে। সব বই গুছিয়ে রাখার মত তাক বানাতে পারেনি তার বাবা। ধুলো বেশ পুরু হয়েই জমে আছে বইগুলোতে।

ইরা এগিয়ে গিয়ে ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে দেখল, কাজের পুরনো লোক ঊষাদি চিরুনি হাতে ঘরে ঢুকছে। একগাল হেসে সে জানতে চাইল, কখন এলে দিদি? রুটি করা আছে। সঙ্গে কিছু একটা ভেজে দিই?

না ঊষাদি। আমি এখুনি ফিরে যাব।

ছায়া মা হয়ে তার মেয়েকেই কিছু খেতে বলছে না দেখে পুরনো লোক হয়েও ঊষা গুটিয়ে গেল। সে আন্দাজ করল — মা মেয়েতে কিছু একটা হয়ে গেছে খানিক আগে — যখন সে চিরুনি কিনতে দোকানে গিয়েছিল। ইদানিং ছায়ার মন মেজাজ প্রায়ই ভাল থাকে না। বেশ অনেকদিনের কাজের লোক ঊষা। সে এখন এ বাড়ির লোক হয়ে গেছে। বিশেষ করে মেসোমশাই যেদিন থেকে আর ফিরে আসেননি — সেদিন থেকেই সে মাসিমাকে দেখাশুনো

করে আসছে। এজন্যে ইরা দিদি তাকে আলাদা করে দিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মায়ের খবর সে মেয়েকেও দিয়ে আসে। ঊষা গিয়ে ছায়ার পেছনে বসে চিরুনি দিয়ে তার চুলের জট ছাড়াতে বসল।

ঠিক তখন ইরা এগিয়ে এসে বলল, ঊষাদি। তুমি বরং বাবার টেবিলটা ঝেড়ে ঠিকঠাক কর। আমি মায়ের কাছে বসছি। ঊষা টেবিল পরিষ্কার করে বই সাজাচ্ছে। জানলার বাইরে বৃষ্টি ধরে এল। ইরা তার মায়ের চুলের জট চিরুনি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, তোমার মাথায় এখনও এত চুল।

ছায়া কোনও কথা বলল না।

ইরা ফের বলল, তুমি বেশ ক'বছর সাজগোজও কর না মা।

এবার ছায়া মুখ খুলল, তুই কি অভিষেকের সঙ্গী হতে পেরেছিস?

ইরার হাতের চিরুনি কেঁপে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারল না। তার হাতের চিরুনিও ছায়ার চুলে থেমে থাকল। সারা ঘরে কোনও কথা নেই। ঊষা বই থাক দিয়ে টেবিলে সাজাচ্ছে — শুধু তারই শব্দ। ছায়া বলল, বিহারের গাঁয়ে দু'টো ডাইনি মিলে তোর বাবাকে ধরে রেখেছে।

কাদের ডাইনি বলছ মা? তুমিই তো পাটনা থেকে ফিরে ওদের কথা বলেছিলে। বউ আর তার শাশুড়ি।

রাত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার। ভাল করে দেখতেও পাইনি। ওর অফিসের ফটোগ্রাফার বিশু যা বলেছে, তা-ই বলছি। একটি ছুঁড়ি। আর একটি বুড়ি। দু'টোই নাকি খুব নাছোড়।

কোনও কিছু মেলাতে পারল না ইরা। কোন্ দূর গাঁয়ে — যেখানকার কিছুরই আন্দাজ নেই ইরার — সেখানে তার বাবা আছে। মৃত মাইনারের বউটি ছুঁড়ি। বুড়ি তার শাশুড়ি। বাবাই বা সেখানে সারাদিন কী করে? কোনও কিছুই সে ভাল করে বুঝতে পারছে না। ভেবে ভেবে যে একটা ছবি ভেবে নেবে ইরা — তারও কোনও উপায় নেই। হঠাৎ ইরা নিজেকে বলল, আমি কি অভিষেকের ঠিক ঠিক সঙ্গী? সঙ্গীনী?

এই বৃষ্টির ভেতর এখন অফিসের ভেতরটা জমজমাট। পরাশর বাঁ কাঁধে মাথা কাৎ করে কানের নিচে রিসিভারটা চেপে ফোনে পলিটিক্যাল স্টোরির মালমশলা জোগাড় করছে। চাপা গলায়। চারদিকে হইহল্লার মত নানান কথা তুবড়ি হয়ে ফস করে এয়ারকন্ডিশন করা হলঘরের ফলস্ সিলিংয়ে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। ওরই ভেতর রিপোর্টিংয়ের টেবিলে বসে তুহিন জানতে চাইল, খুব বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে?

আশপাশে যে যার রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত। কেউ কারও দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার মন রয়েছে নিজের লেখাটা কীভাবে সাজাবে তারই চিন্তায়। ইনসিডেন্টের কোনও ছবি যেতে পারে আজ — তাই জানতে গিয়েছিল বিশু। এডিটরের ঘরে। কিন্তু জানা হল না। ঘর ভর্তি লোক। না জেনেই ফিরে আসতে হল। আদরের কুকুরটিকে কোলে নিয়ে রেণু নিশ্চয় এখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি দেখতে ভালবাসে রেণু। আজ নিশ্চয় বৃষ্টির ছবি হবে। কাল সকালে কাগজ খুলে সবাই দেখতে চাইবে --- বৃষ্টিটা কেমন হল? তার ছবি। তার রিপোর্ট।

রিপোর্ট দিয়ে ফিরে যাবার সময় তুহিনের কথাটা বিশুর কানে গেল।

খুব বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে?

বিশু বলল, কলকাতা ভেসে যাবে আজ। সার্দান অ্যাভিনিউ এতক্ষণে নদী হয়ে গেছে।

তালতলা দিয়ে ফিরলাম — গাড়ির ভেতর কাঁটা হয়ে বসে ছিলাম। যদি কারবোরেটরে জল ঢোকে —

অ্যামবাসাডার তো। হবেই। হ'ত অস্টিন — দেখতিস কিছুই হত না। কারবোরেটর অনেক উঁচুতে। কী ছবি করলি বৃষ্টির? দেখি?

বৃষ্টি তুই লিখছিস?

তুহিন ডটপেনের পেছনটা দাঁতে কামড়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। — তারপর কী মনে হতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বছরের পয়লা বৃষ্টি। এ রিপোর্ট একজনের হাতে দারুণ খুলত

— কার কথা বলছিস? রজতদা তো। এ সব কপিতে লোকটার হাত খুলে যেত। তুই আমের খোসা নিয়ে লিখতে দে — রজতদা কপি দাঁড় করিয়ে দেবে ঠিক।

তুহিন বলল, সত্যি সত্যিই মানুষটা আর ফিরল না। সেই অজানা জেন্দাহা গাঁয়ে থেকে গেল। ভাষা আলাদা। জমি আলাদা। তবু থেকে গেল? ওখানকার মানুষজন কেউ তার আপনজন নয়। তবু —

বিশু বলল, এই বয়সে কেউ ফের নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে? ভাবাই যায় না।

এক জীবন থেকে একদম অন্য — আরেক জীবনে। একেবারে অজানা জায়গায় গিয়ে অজানা লোকজনের ভেতর ফের শুরু করা। আচ্ছা বিশু — কেন এমন করতে গেল লোকটা? মেয়ে-জামাই—নাতি-নাতনি আছে রজতদার। বৌদিরও বয়স হয়েছে। তবু সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে — মাথায় পোকা থাকলে যা হয়। বহুদিনের পুষে রাখা পোকা। হঠাৎ এত বছর পরে বেরিয়ে পড়েছে মাথা থেকে। তা না হলে —

তুহিন কোনও কথা বলতে পারল না। সে মাথা নিচু করে লিখতে লাগল। যতবারই লেখে, ততবারই কাটতে হয় তাকে। ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। হঠাৎ চোখ বুজে সে আজকের বর্ষাভেজা কলকাতাকে দেখতে চাইল।

চোখ বুজতেই সে দেখতে পেল — গালে অগোছালো দাড়ি — কাঁচাপাকা। মাথাটিও তাই। কপালে এক জায়গায় শুকিয়ে যাওয়া রক্তে মাথার চুল লেপটে আটকে আছে। মানুষটি ডান হাতে ব্যাগ নিয়ে হন হন করে হোটেল বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে! গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি নিচে পাজামা। খালি পা।

জেন্দাহায় কিন্তু বর্ষা নেমেছে বেশ কয়েকদিন আগেই। একবার নামলে আর থামতেই চায় না। তারই ভেতর যে যার হাল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে।

এদিককার কুকুর আর মানুষ কিছু অন্যরকম। চওড়া কাঁধ — ভারি নাক — হাসলে মুখের হাড়ের ওপর বড় করে মাংসের ভাঁজ পড়ে। কুকুরগুলো ঘাড়ে-গর্দানে এই মোটা। কিন্তু পেটের কাছে সরু। আর যখন ডাকে — গলা দিয়ে মেঘ গুঁড়ো করার আওয়াজ। এখন বেলা দশটা এগারটা হবে। অথচ আলোর চেহারা সন্ধ্যে সন্ধ্যে।

গাছপালার পাতা ঘন সবুজ। বর্ষার জল খেয়ে খেয়ে একধার থেকে সবাই ঝলমল করে উঠেছে। গণ্ডকের ধারাধারি ঝুমনি পালাই গাঁ। ঘরে ঘরে মোষ। সেখান থেকে দুধ কিনে ফিরছে রজত। মাথার টোকায় জল আটকায় না। ডান হাতে বর্ষার জল-খাওয়া গণ্ডক খোলা চেহারা নিয়ে পাড়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ওর ভেতরেই বাঁকের দু'দিকে বড় মেটে-কলসিতে দুধ বোঝাই দিয়ে রজতের আগে আগে চলেছে ভরসারাম। সে এ তল্লাটের বাঁকওয়ালাদের একজন।

ধরাবৃষ্টির ভেতর রজত দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঁ হাতে যতদূর দেখা যায় — কালো কালো মোষের হাল মাটি উল্টেট উল্টেট চলেছে। খানিক গিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসছে। সাদাটে বৃষ্টি। কালো মোষ। মাঝেমধ্যে লালচে বাদামি একঘোড়ার হাল। দূরে দিগন্ত ছুঁয়ে সবুজ গাছপালা। তার ভেতর মাথায় গামছা বেঁধে খালি গায়ে জেন্দাহা আর তার চারপাশের চাষী মানুষজন মোষ আর ঘোড়ার এই স্লোমোশন পিকচারে নতুন একটা জিনিস হয়ে মিশে গেছে। রজত যেন এইমাত্র বড় একটা সত্য আবিষ্কার করে বসে আছে। পৃথিবী কখনও পুরনো হয় না। সব সময়েই বদলে বদলে শুধুই নতুন হয়ে যাচ্ছে। নতুন থেকে আরও নতুন।

পিপুলতলা পেরিয়ে রামটহলদের ভিজেবাড়িতে এসে রজত দেখতে পেল মোতিয়া বর্ষার জন্যে গোয়ালের আড়ায় তুলে রাখা শুখা লকড়ি নামাচ্ছে। লকড়ি মানে — শুকনো ভ্যারেন্ডার ডাল পুঁয়ে পাওয়া আখ আর গণ্ডকের তীরে গজানো গুচ্ছের আগাছার কেটে আনা মোটা মোটা শেকড়। বেছে বেছেই দেখে শুনে নামাচ্ছে। নয়ত জ্বাল দেওয়া দুধে একবার গন্ধ লেগে গেলে দইয়েও সে গন্ধ থাকবে।

রামভরসা জানে দুধ কোথায় রাখা হয়। নিজের থেকেই সে বাঁক নামিয়ে কেড়ে দুটি কাত করে কালো মেটে জালায় ঢালতে লাগল।

মোতিয়াকে দেখে রজত জানতে চাইল, চামেলী কোথায়?

কুথা আর যাবে? রাজদুলারী ইহা তো আভি আভি মওজুদ থি। ঘুমনে গ্যয়ি হোগা — দহি কাঁহা?

দহি তো হ্যায়। মগর কৌন বিকনে যায়েগি?

চামেলী দুধটা বসাবে। চুলহার খেয়াল রাখবে। তুমি বেচতে যাবে।

হি হি করে হেসে উঠল মোতিয়া। দেখবে — তো সে চুড়ৈল কাঁহা?

তাই তো? এই বর্ষার ভেতর গেল কোথায় মেয়েটা?

রজত যে জেন্দাহায় এসে পড়েছে একদম উটকো — তার চালচলন, কাজকর্ম দেখে তা বোঝার উপায় নেই কোনও। নিজে নিজেই সে বলল, এখন খুঁজতে বেরোও। এবার তার মুখ দিয়ে রাগে রাগে অনেক কথা বেরিয়ে এল।

বৃষ্টিটাও থামে না ছাই। খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে দুধ জোগাড় কররে — আর পায়ে হাজার কামড় —

মোতিয়া কিছু বুঝতে না পেরে কাছে এগিয়ে এল রজতের, কেয়া বোলাতানি বাবুজি? কুছ নেহি। নিজের বেটার বউয়ের সঙ্গে একটু ভাব করে থাকতে পার না? এখন খোঁজ। কোথায় গেল মেয়েটা

কাহার সঙ্গ দোস্তি করু। ঢুঁড়নে কা কোই জরুরত নেহি।

কিঁউ?

কেয়া চামেলী কোই বাচ্চি তো নেহি। ডাইন হ্যায় ডাইন। মেরি জওয়ান বেটা কো খা লায়ি। অব মুঝে ভি কাচ্চা খা লেগি।

বুরি বাত ছোড়ো মোতিয়া। চামেলী-তুমহারি বেটাকা বেওয়া — এ মৎ ভুলো।

মোতিয়া দুসাদও তেরিয়া হয়ে এগিয়ে এল রজতের দিকে। রজত কী করবে বুঝতে পারছে না। কথায় কথায় নগদ পয়সায় কিনে আনা অতটা দুধ না কেটে যায়। তাহলে তো চিত্তির। বৃষ্টির কোনও থামা নেই। রামটহলদের উঠোন থেকে পরিষ্কার দেখা যায় — সারা জেন্দাহায়

পয়লা বর্ষায় যে যতটা পারে জমি চষে নিচ্ছে। এদিককার লোকজনের চাষবাসে এখনও ধানই এক নম্বর।

ক্যায়সে ভুলুঁ বাবুজি? চামেলী খুদহি মুঝে হরবখত ইয়াদগারি দেতি — ও মেরি বেটাকা বেওয়া — ইসিকা ওয়াস্তে রামটহলকা পেনশনকা উপর উনকাহি পুরা হক।

ভীষণ শব্দ করে কোথায় যেন বাজ পড়ল। তার আওয়াজে মোতিয়ার গলা চাপা পড়ে গেল। রজত শুনল, মোতিয়া বলে চলেছে — ম্যায় এক অভাগন মা হুঁ।

আর কথা বেরল না মোতিয়া দুসাদের মুখে। তার বদলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। চারদিকে কোথাও কোনও কথা নেই। শুধু বৃষ্টি। বৃষ্টির শব্দ। সেই সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। এখন যে বেলা কত, তা বোঝার উপায় নেই। কবজিতে ঘড়িওয়ালা লোকজন সেই পাক্কি সড়কের ওপর ধাবায় গেলে তবে দেখা যাবে।

হঠাৎ মোতিয়া দুসাদ বলে উঠল, মেরি পেটসে রামটহল নিকালে — আউর উসকা পেনশন পর মেরি কোই হক নেহি? ম্যায় ভি এক বেওয়া হুঁ।

কোনওরকমে মোতিয়াকে সামলানোর জন্যে রজত বলল, চামেলী তুমহারি বেটি লাগে। ও তুমহে বুঢ়াপা সে দেখেগি। — বলতে বলতে রজতেরও মন তাকে বলল এ কেমন আইন? ছেলে মারা গিয়ে কেউ যদি অনাথা হয় — ছেলের পেনশনে তার কোনও হক থাকবে না?

রজতের খবরের কাগুজে মাথা তাকে বোঝাল, রামটহল যদি বিয়ে না হওয়া দশায় মরত — তাহলে তার পেনশন নিশ্চয় মোতিয়া দুসাদ পেত। আইনটা বোধহয় তাই।

বেশ বেলাবেলি বৃষ্টি ধরে আসতে গণ্ডক আর গঙ্গার আকাশে মেঘের খানিকটা কেটে গিয়ে রোদ বেরল। সে রোদের চেহারা পড়ন্ত দুপুরের। এদেশে জোর বর্ষা হলেও জল দাঁড়ায় না। সব জল গড়িয়ে গড়িয়ে গণ্ডকে গিয়ে পড়ে।

বিকেল বিকেল ধরা বর্ষার ভেতরেই রজত খালি পায়ে শার্ট আর পাজামা পরে পাক্কি সড়ক পেরল। কোথায় যেতে পারে চামেলী? কোথায়? সারা জেন্দাহা সে আঁতিপাতি করে খুঁজেছে। ভিজে বাঁশতলা। পঞ্চায়েতি ইঁদারার এধার-ওধার। মহুয়া তালাও। কোথাও নেই চামেলী।

মোতিয়ার কাছে চামেলীর কথা সে জানতে চায়নি। অতটা দুধ এসে পড়ায় কোনও কথা না বলে মোতিয়া নিজেই চুলহা ধরিয়ে চাপিয়ে দিয়েছে। তারপর তুলে রাখা সাজা দিয়ে একা একাই সবটা দই পেতেছে। পেতে খুব সাবধানে কলাগাছের মাঝের পাতা কেটে এনে ভাঁড়ে ভাঁড়ে আলাদা করে ঢাকা দিয়েছে মোতিয়া। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির ফাঁকে ফাঁকে ফিরে এলে এসব চোখে পড়েছে রজতের।

পাক্কি সড়ক পেরিয়ে গণ্ডক যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। উঁচু উঁচু ঢিবি। আগাছার জঙ্গল। শ্রাদ্ধ-শান্তির পর ভেঙে দিয়ে যাওয়া মাটির কলসির ভাঙা কানাতের ছড়াছড়ি। এসব পেরিয়ে রজত গণ্ডকের সামনে এসে দাঁড়াল।

১৯

গণ্ডক আসলে এক পাড়ভাঙানি নদী। নেহাত তার বড়দি — গঙ্গা তার খাতে জল যুগিয়ে যুগিয়ে গণ্ডককে শান্ত রাখে। এক মাসের জেন্দাহা বাসে গাঁ গঞ্জের মানুষদের মুখে দু'টি কথা প্রায়ই শুনেছে রজত। বড়ে বহিন। ছোটে বহিন। মানে গঙ্গা আর গণ্ডক।

সন্ধ্যের আগে সূর্য কাত হয়ে যে এলানো লালচে রোদ ফেলেছে তাতে গণ্ডকের জলে নেমে যাওয়ার ভাঙা পাড় — পাঁক মাটি — জোলো ঘাস, সবই খানিকক্ষণের জন্য লালচে হয়ে উঠল। এমনকি ঘোলাটে গণ্ডকের বুকও কেমন ফিকে হয়ে লাল হয়ে উঠছে।

আর কোথায় খুঁজব চামেলীকে? শেষে মেয়েটা খুদখুসি করে বসেনি তো? এই গণ্ডকে?— খানিকবাদে চারদিক তাকিয়ে রজত নিজেকেই বোঝাল, গণ্ডকে ডুবে আত্মঘাতী হবার উপায় নেই চামেলীর। সাঁতার জানে যে। নিশ্চয় সাঁতার জানে। যে সাঁতার জানে তার জলে ডুবে মরা খুব কঠিন।

আর খানিকক্ষণের ভেতর টুপ করে সূর্য ডুবে যাবে। গেলেই সারা তল্লাট পলকে অন্ধকারে মুছে যাবে। তখন এখান থেকে রাস্তা চিনে রজতের পাক্কি সড়কে ওঠাই কঠিন হবে। শেষে না অন্ধকারে ঘুরে মরতে হয় সারারাত। তাছাড়া সাপখোপ তো আছেই। দেখে দেখে পা না ফেললে কেটেকুটে একাকার হতে হবে।

গণ্ডকের দিকে তাকিয়ে রজতের মনে হল — এই বিরাট জল কী নিষ্ঠুর। তাকে মাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ভাসাবে বলে — হয়ত ওৎ পেতেই আছে।

ফিরে আসছিল রজত। হঠাৎ ডানদিকে দূরে সূর্যের লালচে আলোয় দেখতে পেল — ভাটফুলের ঢিবির নিচে জলের কাছাকাছি চামেলী বসে আছে। আঁচল জোলো বাতাসে পিঠের পেছন থেকে পতপত করে উড়ছে। সেখানেই কাশের ঝাড়। তারাও সেই বাতাসে কাত হয়ে নুয়ে পড়ছে — আবার বাতাসে ঢিলে পড়লেই খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চামেলীর কয়েক হাত নিচেই গণ্ডক। ঘূর্ণিপাক খেয়ে খেয়ে জল যে কোথায় চলেছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। এতক্ষণ বৃষ্টির মধ্যে ওখানে বসেছিল নাকি মেয়েটা? প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল রজত — চামেলী—ই—

দূরে চামেলী নড়ে বসল।

অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগেই পাক্কি সড়কে ওঠা দরকার। রজত যতটা পারে পা সামলে দৌড়তে শুরু করল। চামেলী—ই—ই

এবার চামেলী ভাটফুলের ঢিবি পেরিয়ে ভাঙা পাড় ধরে ধরে ওপরে উঠছে। সন্ধ্যার শেষ টিয়ার ঝাঁক ভিজে শরীরে সাঁ সাঁ শব্দ তুলে উঁচু ডাঙার দিকে চলে গেল।

হাঁফাতে হাঁফাতে রজত গিয়ে চামেলীর হাত দু'খানি ধরল। পায়ের নিচে গাঙ শামুকের ভাঙা পিঠ?— না, ভেঙে দিয়ে যাওয়া কলসির কানাত?—পড়ল— তা খেয়ালই থাকল না রজতের।

মেরে ওয়াস্তে কিঁউ ইতনি দূর আ কে পরেশান হোতা হ্যায় বাবুজি?

এমন শান্ত, ধীর গলায় চামেলী কখনও কথা বলে না। রজত বেশ অবাক হল। বলল, চলে চলো। আভি আভি সূরজ ডুব যায়েগা।

চামেলী কথা না বলে হাঁটতে লাগল। রজত জানতে চাইল, কেয়া পুরা বারিস মে ইহা

বৈঠকে বিতায়ে?

চামেলী কোনও জবাব দিল না। আবছা অন্ধকারে মেয়েটার গায়ের শাড়ি যেন ভিজে — সপ সপ করছে।

খানিকটা এগিয়েছে ওরা — ঠিক এই সময় পেছন থেকে ভারি সুন্দর সুরে একটা গান ভেসে এল। রেকর্ডের গান। রজত আর চামেলী — দু'জনেই একসঙ্গে গণ্ডকের দিকে ফিরে তাকাল।

চলো কাঁহি ভাগ চলে —

ভাগ্ চলে—এ—এ

ভারি সুন্দর বাজনার সঙ্গে লতা গাইছে। গণ্ডকের তীর ধরে কারা যেন বড় নৌকোয় ব্যাটারি সেটে হিন্দি ছবির ক্যাসেট বাজাতে বাজাতে চলেছে। পোর্টেবল মাইকে গানটা সারা গণ্ডকের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকার হয়ে আসা আগাছার জঙ্গলেও সে-গান ছড়িয়ে পড়ল।

শাদি কা বরাত যা রহি—

রজত বলল, তাই হবে। আষাঢ় মাস তো এখন।

বজরা মত বড় নৌকোয় পাল খাটানো হয়েছে। পালের টানে নৌকো চলেছে। অন্তত বিশ বাইশটা কালো কালো মাথা হ্যাজাকের আলোয় দেখা যাচ্ছে। লতার গলায় — গানের সঙ্গে বাজনায় কী যেন আছে। একটা ফুর্তি। ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

চলো কাঁহি ভাগ্ চলে —এ—এ

রজত বা চামেলী কেউই যেন গানটাকে পেছনে ফেলে চলে যেতে পারছে না। গানটা ওদের টেনে রেখেছে। একদল হইহল্লা করা মানুষ নৌকো বোঝাই দিয়ে জোলো বাতাসের ভেতর বিয়ের বরাত নিয়ে চলেছে। গণ্ডকের গায়ে দূর কোনও বসতি থেকে আরেক বসতিতে।

পাক্কি সড়কে উঠতে উঠতে দু'জনের পা ধরে এল। তখন সূর্য ডুবে গেছে। হঠাৎ চামেলী সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ে জানতে চাইল, বাবুজি। এ ইরা কৌন হোতি হ্যায় আপকা?

ইরা?

হাঁ বাবুজি। আপ আভি আভি উসকি নাম পুকারতে থে —

ম্যায়?

হাঁ বাবুজি।

হরগিজ নেহি। ম্যায় তো চামেলী কহে কে পুকারতে থে।

ফের হাঁটতে শুরু করে দিয়ে অন্ধকারেই চামেলী হেসে উঠল। নহি বাবুজি। ম্যায়নে কেয়া ভুল শুনি!

এ কথায় রজত পালিত ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল। হল কি আমার? এক নামে ডাকতে গিয়ে আরেক নামে ডেকে উঠছি? ইরা এখন এখানে কোথায়? সে তো কলকাতায়। তার জগতে। সে এখন আলাদা একজন লোক। আমিও আলাদা একজন লোক। আমরা কেউ কারও নয়। হঠাৎ কী খেয়াল হতে রজত বলল, সারাটা বৃষ্টির ভেতর বসেছিলে? কেয়া?

বাংলা বোলি বোলিয়ে বাবুজি। বহুত মিঠাজ—

সে হবে 'খন। ঘরে গিয়ে আগে আগুনের সামনে বসবে।

সে জরুর বোসবে! — বলে বাংলা বলার আনন্দে চামেলী একচোট হেসে নিল।

রজতের খুবই অদ্ভুত লাগছে। চামেলী তার কেউ নয়। তবু তার ঠাণ্ডা লাগতে পারে ভেবে কেন তার এত দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে — এখানে কোথায় ডাক্তার? কোথায় ওষুধ? যদি জ্বর আসে চামেলীর? চলো কাঁহি ভাগ চলে — এ — গানটার ঝোঁক, ফুর্তি, সুর তখনও রজতের ভেতর একদম মরে যায়নি। গানটা কেমন গুন গুন করে তার মাথার ভেতর চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। এখন বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকার পর হঠাৎ দেখা যাবে — মেঘের ভেতর একটুখানি চাঁদ উঠেছে।

তখনও জেন্দাহার পিপুল তলা আসেনি। রজত জানতে চাইল, আকেলি আকেলি কিঁউ নিরালা গণ্ডকমে গ্যয়ি থি?

ইঁউহি।

ফির? — তবু? কেন গিয়ে বসেছিলে ওখানে? একা একা?

ইঁউহি বাবুজি, কোই খাস কাম নেহি থি।

ইস বারিসকা টাইমসে নিরালাসা গণ্ডক কো-ই আচ্ছা জায়গা নেহি চামেলী। ভয়ানক কুছ হো সকতে—

হুয়া তো নেহি। ক্যা কঁরু ঘরমে? দহি বানাতে রহু? আউর ঝগড়া করতে রহু?

ইতনা বেচাইনি আচ্ছা নেহি চামেলী।

একথায় চামেলী ঘাড় ঘুরিয়ে তেড়িয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেরি পয়দায়িস পূর্ণিয়ামে বাবুজি। মেরি বাচপনি আধা টাউনমে বিতে। শাদি কা বাদ ম্যায়নে উহাসে নিরসা গ্যয়ি।

তো?

ইয়ে জেন্দাহা মেরি পসন্দ নেহি।

আচ্ছা জাগহা জেন্দাহা।

মেরি পসন্দ নেহি। ম্যায় নিরসা লওটনে চাহাতি হু।

রামটহলদের উঠোনে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক লোকের কথাবার্তা কানে ভেসে এল রজতের। বেশ গোল হয়ে বসেছে গাঁয়ের অনেকে। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে দুলে দুলে কথা বলছে — তাকে গলার স্বরেই চিনতে পারল রজত। পণ্ডত্ দয়ানাথ। আজ তার গায়ে জামা। বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ির কেসটা কুপির আলোয় চিক চিক করে উঠল। ডান হাতে টর্চ। মোতিয়া বসে বারান্দায়। ঠিক কুপির পাশে।

চামেলী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, পঞ্চায়েত বৈঠায়া —! দেখতি হু। — বলে দুম দুম করে পা ফেলে সে ঘরে ঢুকে গেল। মোতিয়ার গা ঘেঁষে। চামেলীর এভাবে কাউকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বেপরোয়াভাবে ঘরে ঢুকে পড়া মোতিয়া দুসাদ তার দেখার ভেতরেই নিল না। তাই মনে হল রজতের। সে এও বুঝল— আজ সন্ধ্যেরাতে আচমকা এই জমায়েতের পিছনে — আর কেউ নয় — মোতিয়া দুসাদই আছে।

রাগ তার মাথায় উঠে যাচ্ছিল। তবু সে ঠাণ্ডা হয়ে থাকল। এও তার মনে পড়ল — রামটহল চলে যাওয়ায় মোতিয়াও তো অভাগন। সেও তো একজন বেওয়া।

পণ্ডত্ দয়ানাথ তখন সুর করে হনুমান চলিশা থেকে গাইছিল। আর সারাদিন মাঠে ভিজে পুড়ে আসা মানুষজন এখানে জমা হয়ে এখন সেই চলিশার ধুয়ো ধরছে। দেহাতি জেন্দাহা গলায়। একদম তেড়েফুঁড়ে। অন্ধকার চিরে দিয়ে।

জয় হনুমান জ্ঞান গুণসাগর।
জয় কপীশ তিহুঁ লোক উজাগর।

অমনি চার-পাঁচজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, উজাগর। উজাগর। উজাগর। উজাগর। — সারা জেন্দাহার মেঘলা আকাশ ফেটে যায় যায়।

সে চেঁচানিতে ঘরের ভেতর থেকে ঘাগরা দাপিয়ে বেরিয়ে এল চামেলী। কেয়া করকে রাখ্‌খা হ্যায়? ইতনা শোর কিঁউ? ঘরের বউয়ের এই দপদপা জেন্দাহায় কেউ ভাবতে পারে না। এই ক'মাসে রজত ঘুরেফিরে যা বুঝেছে — তা হল — জেন্দাহা চলে সরল পথে। খাটো। খাও। বসে থেক না। চামেলীরও চুলো জ্বালিয়ে — দই বসিয়ে দিন কাটে। কিন্তু তাই বলে জেন্দাহার আর পাঁচজনের সামনে ঘরের বউ বেরিয়ে এসে গাঁয়ের জমা হওয়া মানুষদের পাত্তাই দেবে না — তা কি এরা সইবে?

পণ্ডত্ দয়ানাথ শান্ত গলায় বলল, বেটি। হনুমান চলিশা গা রহি হ্যায়। তুমহারি গাঁও কি আদমি সব। তুমভি সামিল হো যাও। পরণাম করো।

এসবের ধার দিয়েও গেল না চামেলী। সে স্পষ্ট গলায় বলল, সারে দিন বৈঠনেকো ফুরসত নেহি মিলতি। বহুত থাকা হুয়া।

ফোঁস করে উঠল মোতিয়া দুসাদ। কিঁউরি? হনুমান চলিশাকা ফুরসত না মিলি? কাঁহা থি ইতনি টেইম?

এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে চামেলী জমায়েতের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, আভি বখ্‌ত নেহি।

এবার মোতিয়া আর বসে থাকতে পারল না। সে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলল, ইয়ে মেরি শ্বশুরাল কি জাগহা হোতি। ইহা কেয়া চলেগি — কেয়া নেহি চলেগি বোলনে মে তু কৌন্ হোতি?

পণ্ডত্ দয়ানাথ তবু থামাবার চেষ্টা করল। বলল, রামটহল কি মা। ইয়ে জগহা পর চামেলী কা ভি হক হ্যায়। উহ্ তুমহারি বেটাকা বেওয়া।

এসব শোনার মত অবস্থা নেই চামেলীর। সে উঠোনে দাঁড়ানো মোতিয়া দুসাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পায়ের ধাক্কায় প্রথমেই কুপিটা উল্টে গিয়ে দপদপ করে শিখা তুলে নিভে গেল।

রজত যে ছুটে গিয়ে চামেলীকে ধরবে — কিংবা মোতিয়াকে সরিয়ে নেবে তার সুযোগ পেল না। রজতের সামনে সারা জেন্দাহার মাথা মাথা পনেরো-কুড়িজন উঠোনেই বসে। অন্ধকারে দু' একজন বাদে কাউকেই সে চিনতে পারছে না। কোত্থেকে দুধের বাঁকওয়ালা ভরসারামও এদের ভেতর এসে জুটেছে। একটু আগে হনুমান চলিশার ধুয়ো ধরে এই ভরসারামই সবচেয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছিল। তাই মনে হল রজতের।

পণ্ডত্ দয়ানাথও ঘাবড়ে গেল। সবার চোখের সামনে মোতিয়া আর চামেলী উল্টোপাল্টা খেয়ে উঠোনে গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু'জনেরই কথা কমে গিয়ে নিঃশব্দে আঁচড়াআঁচড়ি — কামড়াকামড়ি — মাথার চুল ধরে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। আবছা আঁধারে কিছু দেখা যায় — কিছু দেখা যায় না। জেন্দাহার যারা এসে জমেছিল — তারা সবাই পিছিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

রজত নুয়ে পড়ে মোতিয়াকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। চামেলী ছুটে এসে মোতিয়াকে ফের ধরতে গেল। অমনি পণ্ডত্ দয়ানাথ গিয়ে শক্ত হাতে চামেলীকে ধরল। তারপর চড়া গলায়

চেঁচিয়ে বলল, কান খোলকে শুনো। কাল তুম দোনো পটনামে কইলা ভবন যায়েগি। সবেরে ঠিক আট বাজে হামলোগ আয়েগা। য়ঁহা যো কুছ কাগজা হ্যায় — তুম দস্তখত্ কর দেনা — বলেই দয়ানাথ চামেলীর মুখে টর্চের ফোকাস ফেলেই নিভিয়ে দিল। তার মানে এটা তার আদেশ।

দয়ানাথের হাত থেকে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল চামেলী। তখন তার মাথার চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। ঘাগরা ধুলো আর কাদায় মাখামাখি। হাতের কাচের চুড়ি ভেঙে গিয়ে হাতে বসে থাকতে পারে। কেননা ডান হাতখানা তুলে ধরে বাঁ হাতে তা চেপে দাঁড়িয়েছে। গলার ডুমো পুঁথির মালাটা কখন ছিঁড়ে পড়ে গেছে। ডান কানের ঝুমকোও বেপাত্তা।

চামেলী পাণ্টটা চেঁচিয়ে বলল, নেহি যায়েগি। নেহি যায়েগি। নেহি যায়েগি।

দয়ানাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আলবাৎ যায়েগি। কইলা ভবনসে যব রামটহলকা পেনশন উঠেগা — তব তুম দোনোকো বাটোয়ারা কর দিয়া যায়েগা — বলেই সে হন হন করে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গিয়ে পলকে মিলিয়ে গেল।

উঠোন ফাঁকা হবার পর তিনজনের কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারল না।

মোতিয়া কোনমতে গিয়ে ফের সেই বারান্দায় বসল। তার গায়ের জামা সরে গেছে। ঘাগরা কাদায় মাখামাখি। সেই দশাতেই উঠোন থেকে কুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে মোতিয়া ঠিক করতে বসল। সাতদিন অন্তর একটা লোক সাইকেলে এসে ঘরে ঘরে কেরোসিন দিয়ে যায়। ব্ল্যাকে।

দুগুণী দামে। সেই দানি তেল উঠোনে পড়ে গেছে। অন্যসময় এভাবে কেরোসিন গড়িয়ে পড়লে মোতিয়া দুসাদ কপাল চাপড়ে কাঁদতে বসত।

ঘরের পেনশনের কথা পাঁচ কান করায় মোতিয়ার ওপর রাগ হয়েছিল রজতের। কিন্তু এখন আর রাগ হচ্ছে না তার। মোতিয়াই বা কী করবে? বাঁচতে হলে তারও তো টাকা দরকার।

এত গোলমালের পরেও চামেলী কাঠকুটো দিয়ে দই বসানোর চুলো ধরাল। বড় হাঁ করা চুলো।

রজত জানে মোতিয়া কলাপাতা দিয়ে যেসব ভাড় ঢেকে রেখেছে — সেগুলোতে এতক্ষণে থম দিয়ে দই বসে গেছে। কাল আবার একটা দিন শুরু হবে। মোতিয়া বেরবে বেচতে। রামভরসার বাঁকে করে সে দুধ নিয়ে ফিরবে। এখন যেখানে বসে রুটি বানাচ্ছে চামেলী — ওখানে বসে দইয়ের দুধ জ্বাল দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাবনাকে কারেক্ট করল রজত। কাল তো এসব হবে না। সকাল সকাল পণ্ডত্ দয়ানাথ আসবে। তার সঙ্গে মোতিয়া আর চামেলী পাটনায় যাবে। কইলা ভবনে।

গরম গরম মোটা রুটি দু'তিনখানা করে এগিয়ে দিল চামেলী। কিছু অবাকই হল রজত। এত কাণ্ডের পর এমন মাথা ঠাণ্ডা করে রুটি বানাতে পারে কেউ? শুধু রুটি নয়। কুঁদরি ভাজি তো ছিলই সেই সঙ্গে — তার ওপর চামেলী যখন খুব আদর করে তুলে-রাখা আচার খানিকটা মোতিয়ার থালিতে এগিয়ে দিল — তখন শুধু রজত নয় — মোতিয়াও বোবা। অথচ খানিক আগেও কী চুলোচুলি গেল।

বেশি রাতে অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল রজতের। কলকাতায় থাকতে সে ঘুমের জন্যে মাঝে মাঝে কাম্পোজ খেত। এখন তাকে ঘুমের জন্যে কোনওরকম সাধ্যসাধনা করতে হয় না। সারাদিনে এত হাঁটাহাঁটি হয় — ঘুম এসে চোখের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে রজতের। প্রেসারের জন্যে এনাম ফাইভ মিলিগ্রাম — সেও অনেকদিন খাওয়া হয় না। ইদানীং চোঁ চোঁ খিদে পেলেই তবে খাওয়া। সেই সঙ্গে বাড়িতে পাতা দই। প্রেসার কি ভাল হয়ে গেল?

ঘরের চাল খাপরা টালির। মোতিয়া আর চামেলী অন্যদিন ভেতরেই শোয়। আজ দু'জনই খোলা বারান্দায় উল্টোমুখ করে ঘুমিয়ে। হাত পা ছড়িয়ে। তালপাতার চাটাই আর একখানি করে নিরসা খনির কম্বল — কোমর অব্দি। রজত শুয়ে থাকে গোয়ালের লাগোয়া একদা যে রসুইঘর ছিল — তার ঢাকা বারান্দায়। ভাল করে ঠাসা বিচুলির তড়পার ওপর কম্বল পেতে। সে কম্বলও নিরসা খনির। রামটহলরা বছর বছর কম্বল পেত। মশা, পোকা, গরম, ঠাণ্ডা — এমনকি বৃষ্টি সবই শরীরে সয়ে এসেছে রজতের। এখন যেন সে চোখ বুজলে অনেক বেশি দেখতে পায়। আগে চোখ বুজলে দেখতে পেত শুধু অন্ধকার। ঘুরে ঘুরে দেখল রজত — কে কোথায়?

এ এক ছত্রাখান সংসার। এর ভেতর জড়িয়ে গেলাম কেন? এদের সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। তবু জানা জগৎ থেকে এদের একদম অজানা দুনিয়াতেই আমি ঝাঁপ দিয়েছি। আমি এত চেষ্টা করেও কেন হারিয়ে যেতে পারছি না? আমার এত দিনকার চেনা জগৎ ভীষণ বাসি লাগে। হাতে গড়া তিন দিনের বাসি রুটি।

জেন্দাহার নিশুতি রাতের আকাশ এখন জায়গায় জায়গায় ফুটো কলসী। ফাঁক ফাঁক দিয়ে বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ে। আবার থেমে যায়। তার মানে সকালের দিকে বড় করে একটা বৃষ্টি হবে।

জীবনে আমি কার সঙ্গে গিট বাঁধবো?

ফের বিয়ে করে আমার আর বাবা হবার পথ নেই। কী হবে তা করে? সে-ই তো এক-ই। আমি নতুন করে কার জন্যে ফের পাগল হই তাহলে? আমি কলকাতায় থাকতে জানতাম — আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর কাল সকাল থেকে আবার কি কি হবে। মুখ ধোও। চা খাও। থলে হাতে বাজার যাও। ফিরে এসে আবার চা। খবরের কাগজ। বাথরুম। স্নান। জুতো জামা পরে বেরনো। দিনের পর দিন — সেই একই।

গণ্ডকের দিকের আকাশ মেঘ আর নিভু নিভু চাঁদের আলোয় একখানা বড় অয়েল পেইন্টিং এখন। পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় এভাবেই আজ রাতে নানান ছবি ঝুলে আছে আকাশে। সেই সব ছবির নিচে নানান লোকালয়। সেখানে নানা রকমের লোক। তাদের সবার নিজের নিজের একটা করে পৃথিবী। সেই পৃথিবীর পাশ দিয়ে কোথাও গণ্ডক, কোথাও গঙ্গা, কোথাও তোর্সা কিংবা অন্য কোনও নদী বয়ে যায়। কারও পাশেই পাহাড় বা প্রান্তর। এই ভাবেই আস্ত একটা জীবন।

রজত ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। ঘুম চাই। ঘুম। ঘুম বড় দরকারি। এত গোলমেলে কাণ্ড-কারখানার ভেতর ঘুম সবচেয়ে বড় ওষুধ। জেন্দাহা গাঁয়ে যত মশা ছিল — যত পোকা ছিল — তারা সবাই আবার যে যার কাজে লেগে গেল। মানুষ জেগে থাকলে তাদের কাজের বড় অসুবিধে হয়। পোকারা যেখানে যা পেল — তাই-ই কেটে কুটে চেটে ক্ষয় করে দিতে লাগল। মশারা রক্তের খোঁজে এখানে ঘুমন্ত তিনটি মানুষের গায়ে জায়গা বেছে নিয়ে ভাল করে বসলো। এবার যত রাজ্যের ঝিঁ ঝিঁ ছিল তারা সুর করে ডাকতে লাগল। বৃষ্টি ভেজা পাতাগুলো নিয়ে গাছের দল, দূরে গঙ্গা ব্রিজ, ভিজে গা পাক্কি সড়ক — সবাই — সবাই এখন বসে আছে — কখন ভোর হয় — কখন আলো ফোটে— কখন আবার একটা দিন শুরু হয়।

ফের ঘুম ভেঙে গেল রজতের। ঘোরের ভেতর মনে হল — তার পায়ে কে হাত রাখল। পটাং করে উঠে বসল রজত।

তুমি? কি ব্যাপার?

চলো। কাঁহি ভাগ চলে—

চামেলী বাঁ হাতে একটা পুঁটুলি মত গুছিয়ে নিয়েছে।

এত ভোরে? কোথায় যাব?

চলো বাবুজি। ইহাঁসে ভাগ চলে।

কেন? এটা তোমার ঘরবাড়ি।

চুপ। আইস্তা বোলো বাবুজি। নেহিতো ও ডাইন জাগ যায়েগি। — বলে ডান হাতে রজতকে একরকম টেনে তুলল। তুলে বলল, কুছ রুপয়া উসকি লিয়ে রাখকে — চলো, ভাগ চলে —

কেন?

নেহি তো উহ্ পণ্ডত্ আজ মুঝে জরুর কইলা ভবনমে লে চলে গা! ও আয়েগা আউর মুঝে যানাহি পড়েগি।

তো যায়েগি তুম। ইসমে তুমহারি ভালাই হোগি। মোতিয়াকো ভি ভালাই হোগি।

নেহি বাবুজি। মেরি ভালাই মেরি হাতপে ছোড়িয়ে। ম্যায় ইহা নেহি রহেগি। এ মেরি জগ্হা নেহি। চলে চলো — কোই জবরদস্তি মেরি বিলকুল বে-পসন্দ।

রজত একবার কী ভাবল। তার জিনিসপত্তর বলতে কয়েকটা শার্ট প্যান্ট, টুথপেস্ট ব্রাশ, পাজামা পাঞ্জাবি. গেঞ্জি, দুটো ধুতি। সবই ছায়ার দেওয়া ব্যাগে পড়ে আছে। এখানে রজত গায়ে দিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে না যাওয়া অব্দি গায়ের জামা পালটায় না। টুথপেস্ট অনেকদিন হল ইউজ করে না সে। ভ্যারেন্ডার কষ কষ টাটকা ভাঙা ডালেই দিব্যি কাজ চলে যায় তার। মুখের ভেতরটাও আগের চেয়ে কম পরিষ্কার লাগে না। কোথায় যাবে?

কিঁউ নিরসামে।

লেকিন —

কোই লেকিন উকিন নেহি বাবুজি। য়ঁহা তের নম্বরমে তো কোয়ার্টার হায়ই।

বড় সরল উত্তর। এতদিন কি রামটহলের নামে সেই কোয়ার্টার আছে? হয়ত অন্য কেউ সে কোয়ার্টারে এসে গেছে।

অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে রজত বুঝলো, মোদ্দা কথাটা জানে চামেলী। রামটহলের বদলি তার জন্যে নিরসায় একটা নোকরি আছে। নোকরি থাকলে থাকবার কোয়ার্টারও আছে একটা।

রাত ফিকে হবার আগেই চামেলী দুসাদ রজত পালিতের হাত ধরে পাক্কিসড়কে এসে দাঁড়াল। এখন হেড লাইট জ্বেলে শুধু লরির পর লরি চলছে। গঙ্গা ব্রিজ পেরিয়ে 'পটনা সিটিতে' ঢুকবে। সেদিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

বড় বড় ফোঁটায় ফাঁকা ফাঁকা বৃষ্টি। দূরে অন্ধকারে আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে গণ্ডক পড়ে আছে। কাল সন্ধ্যে সন্ধ্যে নৌকোয় ভেসে ফুর্তি করতে করতে যাওয়া বরাতির দল এখন নিশ্চয় তাদের নয়া রিস্তেদারের বাড়িতে খেয়ে দেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাল সন্ধেবেলা ওদের বাজানো গানটা এখনো রজতের মাথার ভেতর গুন গুন করছে। চলো কঁহি ভাগ চলে —

চারদিক তাকিয়ে কেমন মায়া লাগল রজতের। সে এই অবছা অন্ধকারে চামেলীর মুখ দেখার চেষ্টা করে। সে মুখে যেন মায়ায় আটকে পড়ার কোন ছাপ নেই। ছায়া নেই। সব সময় চামেলী মুক্ত। ভোর রাতের সওয়ারি ধরতে একটা অটো যাচ্ছিল। সেটায় উঠে বসল দু'জনে।

এত ভোরে ট্রেন আছে।

চামেলীর সব জানা। সে হেসে বলল, নই নই সাদিকা বাদ জেন্দাহামে কুছ রোজ থি। তো অ্যায়সাহি এক সবেরে রামটহলকা সঙ্গ ম্যায়নে পটনা আয়ি থি। উঁহাসে আসানসুলকা ট্রেন পকড়া গয়ে—

এত অবলীলায় কথাগুলো বলে চামেলী! ইরা যেমন ইদানীং বলতো — তারপর রুকমিনী মা আসেন বসে মন এক জায়গায় করলেন। তাঁর তো সবই জানা। তিনিই জগন্মাতা। তিনি জানবেন নাতো কে জানবে? মন একজায়গায় করার পর মহা জগতের সঙ্গে জগন্মাতার যোগাযোগ হয়ে গেল। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় একই বিন্দুতে এসে দাঁড়াল।

এসব কথা বলার সময় ইরার সারা মুখ জুড়ে একটা তৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়ে।

রামটহল আর নেই। তার সঙ্গে শেষরাতে তারই হাত ধরে পাটনা সিটি স্টেশনে যাওয়ার স্মৃতি এত হাসি মাখিয়ে বলতে পারে শুধুই চামেলী। তাই মনে হল রজতের।

শেষরাতের রেল স্টেশন দেখে মনে হল দিন এসে গেছে। কামরায় ওঠার সময় রজত বলল, মোতিয়ার খুব কষ্ট হবে। একা পড়ে যাবে।

রজতের উল্টোদিকের সিটে বসতে বসতে চামেলী বলল, নেহি বাবুজি। রুপয়া রাখকে আয়া। ঘরমে দহি হ্যায় আধা মনকা উপর। সব বিক দেগি। যব রুপেয়া পুরা খরচা হো যায়েগি

— তব আপকি মোতিয়া সিধা পটনা স্টেশন আয়েগি। য়ঁহাসে আসানসুলকা ট্রেন পাকড় লেগি।

এহি তো চামেলী। লেকিন উসকি বহুত খারাপ লাগেগি — যব দেখেগি —

হাঁ। ও তো সহি বাত হায় বাবুজি। হাঁ — সবসে খারাপ লাগেগা পণ্ডত্‌কো। আকে দেখেগা — চিড়িয়া উড় গয়ি!

আরও অনেক বেশি অবাক হওয়ার বাকি ছিল রজতের। ভাল করে রোদ উঠতে চামেলী তার পুঁটলির ভেতর থেকে কাল বেশি রাতে বানানো রুটির গোছা — সেই সঙ্গে কুঁদরি ভাজি। আচারও বের করল।

রজত বুঝলো— তাদের এই চলো কঁহি ভাগ চলে — একদম আচমকা ঠিক করেনি চামেলী। পণ্ডত্‌ দয়ানাথ যখন চামেলীর মুখে টর্চের ফোকাস মেরে জবরদস্তির ফতোয়া জারি করে — ঠিক তখনই মেয়েটা মনে মনে সব কিছু ছকে নিয়েছে। কাল নিশুতি রাতে ঘুম ভাঙতে রজত চামেলীকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছিল। সেই ঘুমও বোধহয় চামেলীর মটকা মেরে পড়ে থাকা।

জানলার বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। দূরে মাঠে মোষের হাল এগচ্ছে। আবার ঘুরে আসছে। ফি বছর এই সময়টায় মাটি দলদলে করে সারা দেশের মানুষ। এ এক অদ্ভুত সঙ্গত। মাটির সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে। বৃষ্টির সঙ্গে। বীজের সঙ্গে।

মহাবিয়ার সস্তায় কেনা পাগলা হাতিটা হয়ত আজই রাতে চিৎকার করে উঠে সারা জেন্দাহার আকাশ ফাটিয়ে ফেলবে।

২০

চটি নিরসায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত আটটা সাড়ে আটটা হয়ে গেল রজতদের। হাতে তো ঘড়ি নেই। কবেই তা জেন্দাহায় গেছে। রাতের চেহারা দেখে তাই আন্দাজ হল রজতের। সারা নিরসা খনিটা এখন অন্ধকারে ভূতের মত পড়ে আছে। একটাও আলো জ্বলেনি। শুধু ওয়াটার ট্যাংকের কাছাকাছি উঁচু পোস্টের মাথায় একটি সার্চলাইট আলো দিচ্ছে — তাতে খনির আকাশমুখো চাকা — তার বেল্টটও পরিষ্কার দেখা যায় না। বাকি সব তো অন্ধকারে।

আসানসোল-নিয়ামতপুর-সাকতোড়িয়া-রানীগঞ্জ লাইনের বাস কয়েকজন হোমগার্ড, তিনজন কাবুলির সঙ্গে ওদের নামিয়ে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এখানে অবশ্য বৃষ্টি হলে কোনদিনই জল দাঁড়ায় না। রাস্তায় দু'পাশে খাদ। যেখানেই হাঁটো — সব জায়গাতেই মাটির নিচে কয়লা — হয় সে কয়লা অনেকদিন আগেই তোলা হয়ে গেছে — নয়তো ঠিক এখুনি খনি-পাতালে সেই কয়লা তোলা হচ্ছে — ওপরে থেকে তা জানা বা বোঝার কোন উপায় নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রজতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — তাহলে খনি খোলেনি আজও।

চামেলী বেশি কথা বলতে পারছে না। সেই শীতের রাতে অ্যামবুলেন্স করে রামটহলের লাশ নিয়ে চলে যাওয়া — আর এই বর্ষার ভেতর সন্ধ্যেরাতে ফিরে আসা। মাঝখান দিয়ে

কেটে যাওয়া কটা মাস যেন একদম নেই বলেই মনে হল চামেলীর।

ট্রেনে বসে তার বার বার মনে হচ্ছিল — তার দেখা নিরসা না জানি এক মাসে কত বদলে গেছে। তের নম্বর ধাওড়ায় জি মার্কা কোয়ার্টারে তার সহেলি — মধুবনীর মেয়ে তিতলি তাকে দেখে চিনতে পারবে তো? এরকম নানান আশা আর নিরাশায় দুলতে দুলতে সারাদিন পরে এই ঘুরঘুটে অন্ধকারে বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে চামেলীর প্রথমেই মনে হল — নিরসা তো এমনটি ছিল না। কত আলো। কত লোকজন। কত হাসি মশকরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল — আমি তো একজন বেওয়া আওরত। আমার আবার কিসের হাসি? কিসের মশকরা? কিসের ফুলছড়ি ওড়ানো? চামেলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কেয়া বাবুজি — পাতাল মে আগ নেহি বাবুজি?

তা তো বলতে পারবো না। কতদিন কাগজ পড়ি না — বলে রজতের মনে পড়ল, সেই শীতের এক শেষরাতে ট্রেন ধরে এখানে তার আসা। তারপর আর কলকাতায় ফেরাই হয়নি তার। মাঝখান দিয়ে গণ্ডকের গায়ে জেন্দাহা গাঁয়ে কয়েকটি মাস কাটিয়ে আসা। তার তো এখনও মনে হচ্ছে — সে জেন্দাহারই লোক। বেড়াতে বেরিয়ে সবে নিরসায় এসে উঠেছে। কালই ভোররাতে ভরসারামকে নিয়ে দুধ নিয়ে ফিরতে হবে।

এখনও কি পাতালে আগুন আছে? না, আগুনের পথ বন্ধ করতে সেবারেই তরল নাইট্রোজেন ঢেলে দিয়ে বেরোবার সব রাস্তা সিল করে দেওয়া হয়েছে? জ্বালানীর জন্যে মানুষ মেসিন লোড দরকার সবকিছু মিশিয়ে এ এক বিরাট যন্ত্রণা। রজতের মনে হল, নিরসা খনি না বলে — বলা উচিত নিরসা যন্ত্রণা। নিরসা উদ্বেগ। নিরসা টাকা। নিরসা আতঙ্ক। নিরসা নোকরি। নিরসা দরকার।

খনির অফিসঘর দিনের বেলা খোলা থাকে। এখন কাউকে পাওয়া যাবে না। এসব জানে চামেলী। সে বলল, চলিয়ে বাবুজি।

কোথায় চামেলীর মন পড়ে আছে তা জানে রজত। সে দিব্যি চামেলীর পাশে পাশে চলতে লাগল। খালি পা। হাতে ছায়ার দিয়ে যাওয়া সেই ব্যাগ।

গুঁড়ো কয়লা ফেলা চেনা রাস্তা। বাবলা গাছটার কাছে বাঁক। তারপরেই পিচ ওঠা সরু ফালি পথ। এগারো নম্বর ধাওড়ার কাছাকাছি ট্রানজিস্টরে গান ভেসে এল। চামেলী বলল, বাবুজিকো কালহি জুতা খরিদনা হোগা।

রজত একথায় কিছু বলল না। সে বুঝতে পারল, নিরসা খনির কোয়ার্টারের চলতি কালচার মাফিক চামেলী চায় — তার বাবুজি খালি পায়ে না হেঁটে জুতো পরুক। এটা আর যা-ই হোক জেন্দাহা তো নয়।

তের নম্বরের সামনে এসে বুকটা ধক করে উঠল চামেলীর। ব্যারাকবাড়ির মত পর পর কোয়ার্টার। একই টানা ছাদের নিচে পর পর পর সংসার। কতদিন তাদের ঘরদোরে ঝাঁটপাট পড়ে না। তাকে বিয়ের পর রামটহল এখানে এনেই তুলেছিল প্রথম। সবজি কাটাকুটির পর ফেলেদেওয়া লতা পাতা থেকে কয়েকটা ব্রাহ্মীলতা জন্মেছিল উঠোনে। তারা কি এখনও আছে? বর্ষার জল পেয়ে হয়তো আরও অনেকটা লতিয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই সুইচ টিপে আলো জ্বালবে চামেলী। চারপাই, তক্তপোষ, বিস্তারা, লোটা, কলসী সবই তো পড়ে আছে তাদের। একবার নিজের কোমরে হাত দিল চামেলী। এক মাস জেন্দাহায় থাকতে আনমনা হয়ে কতবার যে সে কোমরের সুতুলিতে বাঁধা চাবিটা ছুঁয়ে দেখেছে — তার ঠিক

নেই। চামেলীর কাছে এই চাবি যেন খোদ নিরসা। চাবি দিয়ে বাক্স খুলে শাড়িগুলো — বিশেষ করে ভাগলপুরী সিলিকের শাড়িটাকে বাইরে ফেলে রোদ খাওয়াতে হবে। নয়তো গুমসে উঠে ছাতা পড়ে যাবে।

আপনা আপনি গজানো কয়েকটা বুড়ো ভুট্টা গাছ। কাটাও হয়নি। আর দানা ধরে না। একটা কামিনী ফুলের গাছ। আর কিছু লঙ্কাচার। সবই চিনতে পারলো চামেলী। কিন্তু এ কি? আলো জ্বলছে যে। জানলা দরজা খোলা। এমনকি ঘরের ভেতর থেকে বিবিধভারতীর গান ভেসে আসছে। এ গানটাও চামেলীর চেনা। একদিন রামটহলের সঙ্গে বসে হাসি মশকরার ভেতর এ গান তারা দুজনে শুনেছিল। ঠিক মনে আছে চামেলীর। কোয়ার্টারে যাবার চিলতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চামেলীর সারা শরীর কেঁপে উঠল। থরথর করে। সামান্য উঁকি দিতেই চোখে পড়ল — খালি গায়ে কে জানলার দিকে পিঠ ফিরে বসে। চারপাইয়ের ওপর। বাবুজি — বলেই চামেলী পড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলাবে কি? এ কি করে হয়? রামটহল ফিরে এলো কি করে? কিছু মেলাতে পারছে না চামেলী।

রজত ধরে ফেলল। কি হল?

চামেলী কোন কথা বলতে পারছে না। ঠিক এইসময় ঘরের ভেতর থেকে গলা উঠল, কৌন?

চামেলীকে দাঁড় করিয়ে দিল রজত।

ঘরের ভেতর থেকে এই তিরিশ বত্রিশের এক মরদ বেরিয়ে এল — একদম উঠোনে। আপলোগ?

তখনও বুক কাঁপছে চামেলীর। সে কিছু বলতে পারল না। রজত এগিয়ে গিয়ে বলল, ইস কোয়ার্টার মে ইয়ে চামেলী দুসাদ রহতে থি — রামটহলকা বিবি।

বিশেষত একজন আজনবি আওরতের সামনে খালি গায়ে বেরিয়ে পড়েছে মনে পড়তেই লোকটি ছুটে ঘরের ভেতরে চলে গেল। একটা ফতুয়া মত গায়ে গলিয়ে ফিরে এসেই বলল, আপলোগ বৈঠিয়ে। সমঝিয়ে কেয়া ইয়ে আপহিকা ঘর —

বলতে বলতে সে ঘরের ভেতর কাত করে রাখা চারপাইখানি এনে বারান্দায় পেতে দিল। চামেলী দেখে চিনলো এটা তারই চারপাই। দিয়ে বলল, ম্যায় তো আশপাশ কা তিলং কোলিয়ারিসে ইহা আয়া। ছে মাহিনাকে ওয়াস্তে। কোই কোয়ার্টার নেহি মিলতা থা — তো অফিসসে বোলা — রামটহলকা কোয়ার্টার পর রহে যাও — কনভেয়র বেল্টকা কাম হো যানে কা বাদ তো তুম চলে যায়েগী —

বলতে বলতে লোকটি সামান্য হেসে চামেলীর দিকে তাকালো। ম্যায় ফৌজদার পাসোয়ান হুঁ। আপকি এক ভি চিজ সামাহাল করকে রাখ্খা। য্যায়সা কনভেয়র বেল্টকা রিপেয়ারিং কা বারে মে মুঝে সব কুছ সাজাকে রাখনা পড়তা — এক এক করকে — চুন চুন করকে — আয়সাহি সমঝাইয়ে।

রজত দেখলো, ফৌজদার পাসোয়ান হাসে আর কথা বলে। নিজের কাজের ব্যাপারে সে যে দক্ষ — সেজন্যে ফৌজদারের একটা গর্ব আছে। আর সে গর্ব সে ঢেকে রাখে না।

চারপাইতে বসে পড়ে চামেলীর চোখে পড়ল — তাদের বাক্স, থালি, জলের সরাই, শিশা, আটাবেলুনি, কড়া — সব — সব — এমনকি হাতপাখা পর্যন্ত ফৌজদার পাসোয়ান ভাল করে গুছিয়ে ঘরের একদিকটায় রেখেছে। শুধু তক্তপোষটা ব্যবহার করছে। বিছানা মশারি সব বেঁধে

ছেঁদে ঘরেব ওপর কাঠের আড়ায় গুছিয়ে রেখেছে ফৌজদার।

চামেলীর মন বলল, ফৌজদারের বউ নিশ্চয় খুব গোছানো মেয়ে। নয়তো কনভেয়ার বেল্টের মেকানিক এতটা গুছিয়ে হয় কি করে?

চায়ে বনাঁউ?

রজতেব আগেই চামেলী বলল, নেহি নেহি।

কেয়া? আজহি লওটি?

চামেলীর আগে আগে এবার রজত বলল, আভি আভি আয়া—

তবতো বড়ি ভুখ লাগি — একথা ফৌজদার চামেলীর চোখে তাকিয়ে বলেই রজতের মুখে তাকালো। তাকিয়ে বলল, কুছ তো খানাহি পড়েগা —

রহনে দিজিয়ে — বলে রজত চামেলীর মুখে তাকাল। চামেলী তাকিয়ে রয়েছে ফৌজদারের মুখে। রজত বুঝলো, চামেলী বাইরের পরপুরুষের দিক থেকে এতটা খাতির বা ভদ্রতা কখনও পায়নি। আশাও করে না। তার মত একজন অজানা — আনপড় আওরতকে এভাবে খেতে বলার — বসে বিশ্রাম নেবার কথা তার রিস্তেদারদের ভেতর কেউ কখনও বলেনি। বলেনি কারণ, চামেলীর আত্মীয়স্বজন — স্বামী, ভাই ভাতিজা কেউই কখনও কনভেয়র বেল্ট রিপেয়ারের মত উঁচু জাতের কাজ করেনি। তারা সেই তুলনায় গোদা ধরনের কাজ করেছে। কাজের ধরনই মানুষকে সহবত শেখায়। ফৌজদারের পায়ে স্যান্ডেল। কাচা লুঙ্গির ওপর ফতুয়া গায়ে। কবজিতে ঘড়ি। ভাল করে কামানো গাল। মাথাটি পরিপাটি আচড়ানো।

ফৌজদাব পাসোয়ান থালা চাপা সরিয়ে রুটির গোছা থেকে দু'খানা করে রুটি বের করে দু'জনের সামনে থালায় রাখল তারপর কাচের কৌটো থেকে গুড বের করে সাজিয়ে দিল। আউর কছু নেহি। পানি মিলেগা বহুত — বলেই নিজেব বসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠল।

খিদে সত্যিই পেয়েছিল। দু'জনেরই। আর না করা গেল না। খিদের মুখে সবই অমৃত লাগে। চামেলী খাচ্ছিল আর ভাবছিল — নিজের কোয়ার্টারে বসে পরের এগিয়ে দেওয়া থালি থেকে রুটি খাচ্ছি। কি আশ্চর্য! এরপর আমাকে এগিয়ে দেওয়া পানিও খেতে হবে।

তো রহে যাইয়ে ইহা। ম্যায় কোই জাগহা ঢুঁড় লেগা।

চামেলীই বলল, নেহি নেহি। মেরি সহেলি তিতলিকে পাশ রহে যাউঙ্গি। আপ কোই ফিকর মৎ করিয়ে। চলিয়ে বাবুজি।

আপকি সহেলি কেয়া কোই দূরকা রহনেওয়ালি? একহি তো রাত। ম্যায় কঁহি না কঁহি গুজর লেগা —

চামেলী হেসে ফেলল। কোই জরুরত নেহি। মেরি সহেলি তিতলি ইধারহি জি টাইপ কোয়ার্টার কা রহনেওয়ালি। আপ বে-ফিকর রহিয়ে। চামেলী কথা বলছিল আর মনে মনে বলছিল — সারাদিন ট্রেনে গেল — তারওপর আগের রাতে — গতকাল ঠিক এই সময়টায় জেন্দাহায় ওই হুজ্জোতি — গায়ের কাপড়া এতই ময়লা — রীতিমত গন্ধ বেরুচ্ছে। তিতলির ওখানে গিয়ে সবচেয়ে আগে চান করা দরকার। তার তুলনায় এই অজানা মানুষটি — ফৌজদার পাসোয়ান রীতিমত তকতকে ঝকঝকে। যেমনটা আর কি নিরসায় এই তের নম্বরে তেমন একটা চোখে পড়েনি কখনও।

ফৌজদার পাসোয়ান ক'মাস হল এখানে এসেছে। নিরসার খনি পাতালে আগুন লাগার কথা দেশসুদ্ধ সবাই জানে। আগুন লেগেছিল বলেই তার এখানে আসা। খনি বন্ধ রেখে ঝেড়ে আগাগোড়া রিপেয়ারিং চলছে। নইলে চালু করার আগে সেফটি সার্টিফিকেট মিলবে না।

লঙ্কা চারাগুলোর পাশ দিয়ে চামেলী চলে যাচ্ছে। হাতের পুঁটলি বাঁধা বোঁচকা বাঁ কোমরে ঠেসান দিয়ে ধরেছে। বাঁ হাত দিয়ে। সঙ্গে কোই চাচা য্যায়সা আদমি। ইতনি কমতি উমরমে বেওয়া-পণ বড়া আফসোস কি বাত।

তিতলি ঘরেই ছিল। চামেলীকে দেখে জড়িয়ে ধরে খানিক কাঁদলো। খানিক হাসলো। তারপর রজতের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবুজি। আপভি ইহা রহ যাইয়ে — চামেলীর খেয়াল হল, বাবুজি তো রয়েছে। সে এগিয়ে এসে বলল, রহনেকো জাগহা তো মিলহি যায়েগা। অফিসসে কালহি ইন্তেজাম হো যায়েগি। তব তক বাবুজি —

তিতলি এগিয়ে এসে বলল, তব তক বাবুজি থোড়াসা তকলিফ হোগা।

এই রাতে কোথায়ই বা যাবে রজত! বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছেই। খনি খোলা থাকলে না-হয় বলে কয়ে অফিসঘরে — নাহয় তো কোন গেস্টরুমে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। বন্ধ খনির অফিসও চলে ঢিলে তালে। হয়তো কাল বেলাবেলি লোকজন আসবে। সে না থাকলে চামেলীই বা এতসব পোহাবে কি করে?

তিতলি চামেলীর সখীর মত। সে বলল, তার স্বামী রাত ডিউটিতে পিটসাইডে রিপেয়ারিং কাজে গেছে। চাই কি ওভারটাইম করলে ফিরতে ফিরতে কাল সেই বেলা দুটো-আড়াইটে। তব তক আপ আরাম কিজিয়ে। ম্যায়নে আপ দোনোকা নাহানেকা পানি ইন্তেজাম কর দেতি—

জেন্দাহায় খড়ের গাদায় কম্বল পেতে শোয়ার চেয়ে এখানে তো অনেক ভাল ব্যবস্থা। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে সব কোয়ার্টারেই একখানা দু'খানা চারপাই মজুত থাকে। তারই এক খানায় চামেলী আর তিতলি মিলে তার জন্যে বিছানা পেতে দিয়েছে। অনেকদিন পরে এমন আরামের বিছানায় শুয়ে খোলা বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রজতের মনে হল — এখন তো রাজশয্যায় শুয়ে আছি।

কিন্তু ঘুম আর আসে না। খনি চালু থাকলে নিশ্চয় অনেক আলো জ্বলতো। লোকজনের ঘোরাফেরায় জায়গাটা জেগে উঠত। কোথায় মোতিয়া দুসাদ পড়ে আছে। সারা জেন্দাহা এখন বদচলন চামেলীকে নিয়ে চর্চা করছে নিশ্চয়। সেই সঙ্গে বঙ্গালীবাবুজির কথাও উঠছে বারবার। পণ্ডত্ দয়ানাথ তো ফুঁসছে। আর এদিকে নিরসায় পৌঁছে চামেলী এখন পর্যন্ত বেঘর।

ঘুম হচ্ছে মানুষের মাথার ভেতরকার সারা আকাশ জুড়ে বিছানো অতিকায় এক সামিয়ানা। সেই সামিয়ানা এবার রজতের ওপর দয়ালু হল। কী যেন ভাবতে ভাবতে সে সব হারিয়ে ফেলল। সামিয়ানাটা ছড়িয়ে পড়ে তার মাথার ভেতরকার আকাশটা একদম ঢেকে ফেলল। তখন আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি পড়ছে।

নিরসা খনিতে এখন পুরোদস্তুর অফিস নেই। সাকতোড়িয়া থেকেই ফোনে বেশিরভাগ বড় কাজ চলে। দিনে দিনে কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হেলিকপ্টারে উড়ে আসতেন মাঝে মাঝে। রানীগঞ্জ থেকে। কখনও বা সাকতোড়িয়ায় ই সি এল-এর নিজের হেলিপ্যাড থেকে। এখন আর তার আসার দরকার পড়ে না বড় একটা।

চামেলীকে নিয়ে পরদিন অফিসঘরে বসে থাকতে থাকতে এরকম নানাধরনের কথা কানে এল রজতের।

গোড়ায় থাকার কোয়ার্টার। তারপর রামটহলের বদলি নোকরি। দু'ব্যাপারেই অনেক কাগজাতে দস্তখত করতে হল চামেলীকে। টিপছাপ নয়। চামেলী হিন্দিতে নিজের নামটা লিখতে পারে। অফিসঘরের বারান্দা থেকে নিরসার মাইনিং পিট দেখা যায়। মাত্র ক'মাস আগে ওখান থেকেই রেসকিউ দল খনি-পাতালে নামছিল। যদি কেউ বেঁচে থাকে — তাহলে তাদের ওপরে তুলে আনতে। এখন সব শুনশান। সেদিকে তাকিয়েই চামেলী বলল, শাদিকা বখত্ ম্যায়নে একোয়া ক্লাসমে পড়তি থি —

এত তাড়াতাড়ি থাকার জায়গা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু অ্যাকসিডেন্টে রামটহল মারা যাওয়ায় তার বেওয়া চামেলী এখন কোল ইন্ডিয়ার দায়।

বিকেল বিকেল ন'নম্বর ধাওড়ায় একটা এল মার্কা কোয়ার্টারের চাবি হাতে পেল চামেলী। চাবি হাতে নিয়ে সে যখন অফিসঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল — তখন নিরসা খনির চেনাজানা রাস্তা একদম খা খা করছে। অথচ আগে এই রাস্তা ঠিক এই বিকেলের দিকে ডিউটি ফেরত মানুষের ভিড়ে রমরম করত। কেউ কেউ নিয়ামতপুরের রাস্তা অব্দি সাইকেল চালিয়ে চলে যেত। ফিরত টুকটাক কেনাকাটা করে। রামটহলের সাইকেল ছিল না। সে হেঁটে হেঁটেই সব কাজ সারতো।

ন'নম্বর থেকে তের নম্বর ধাওড়া হাঁটা পথে সাত আট মিনিট। সন্ধ্যের মুখে বৃষ্টি ছুটে ছুটে আসছে। তার পেছন পেছন পাগলা বাতাস। রজত এখন জানে — এসব এলাকা এক সময় ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানির। একশো দেড়শো বছর আগে এক একটা খনি খোলা হয়। আজও দুপুরে অফিসঘরে বসে সে দেখছে — আগেকার আমলের বড় বড় ঘরে বড় বড় ছবি ঝুলছে। কোনটায় কোম্পানি আমলের সাহেব ম্যানেজারের কুকুরের ছবি। কোনটায় সাহেবের মেমের। আবার কোনটায় আর্দালির ছবি।

সেই আমল থেকে খনির নানা কাজের মানুষদের থাকবার এইসব ধাওড়া গড়ে উঠেছে। এক এক আমলে এক একরকমের কোয়ার্টার হয়েছে। ইলেকট্রিক এসেছে। রাস্তা তৈরি হয়েছে। নানা সময়ের বাসিন্দারা নানারকমের গাছ পুঁতেছে। এখন সব মিলিয়ে মানুষের বসবাসের চিহ্ন সর্বত্র। হাঁটতে হাঁটতে চামেলীর একতরফা বকরবকরের ভেতরে পায়ে একটা ঠোক্কর খেল রজত। পুরনো বড় সাইজের ঝামা খোয়া। হয়তো এই খোয়াটা একেবারে গোড়ার দিকে এখানে রাস্তা তৈরির সময় এসেছিল। তারপর কত লোক এল গেল — সবাইকেই দেখেছে খোয়াটা। পায়ে গুঁতো খাওয়ায় টলে যাচ্ছিল রজত।

চামেলী তার হাতের বোঝাটা হাতে নেবার চেষ্টা করল। পারল না। রজত দিল না। চামেলী বলল, আজ বাবুজি আপকো জুতা খরিদনাহি পড়ে গা —

এটা বাজে খরচার সময় নয় চামেলী।

বেফয়দা কিঁউ বলছেন বাবুজি? আপতো জুতা পহনেওয়ালা আদমি হো বাবুজি।

এখন তোমার পয়সা দরকার। তুমি একা। হিসেব করে চলতে হবে।

অকেলি কিঁউ বলছেন বাবুজি। মেরি সাথ তো আপ হ্যায়।

কেয়া ম্যায় তুমহারি সারি জিন্দেগি সঙ্গ সঙ্গ রহে জায়েগা?

হাঁ। কিঁউ নেহি। মেরি তো নোকরি মিলনেওয়ালা হ্যায়। মেরি সঙ্গ সঙ্গ রহনে মে আপকি কোই হরজা হ্যায় বাবুজি?

অন্ধকারে রজত চামেলীর মুখ দেখতে পেল না। ওর গলার স্বরে বায়না ধরা বাচ্চা মেয়ে

যেন ভর করেছে। পৃথিবীটা এত কঠিন। রজত তখন তখনই হ্যাঁ বা না — কিছুই বলতে পারল না। এ মেয়েকে কি বলবে?

অন্ধকারের ভেতর কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে মানুষজনের গলার স্বর। কারও ঘরে বা টিভি-র গলা। বাজনা। কোথাও ট্রানজিস্টর। বাচ্চা কাঁদছে। বাসন পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। মাটির নিচের কয়লা এই নগর বসিয়েছে। এখানে কয়লাই ভরসা।

তের নম্বর ধাওড়ার কাছাকাছি এসে রজত জানতে চাইল, কোনসা নোকরি তুমহে মিলনেওয়ালা হ্যায়?

আপ তো থা। কুছ নেহি শুনা?

তুম যখন ক্লেইম ওয়েলফেয়ার দফতরমে গ্যয়ি — ম্যায় তো বাহার মে বৈঠা থা।

ও তো সহি। সাহাব নে কহা — সাকতোড়িয়া সেন্ট্রাল হাসপাতালমে কাম কাজপে ভর্তি হো সকতি। নেহি তো ইহা দফতরমে কাগজা দেনেকা কামপে সামিল হো সকতি।

তুমনে কোনসা কাম চুন লায়ি?

মাঝ রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল চামেলী। বৃষ্টির হালকা ছাটে কোন পরোয়া নেই তার। এখন থেকে মাস গেলে তার তংখা মিলবে। সেই ভাবনায় ভীষণ উৎসাহ চামেলীর গলায়। দেখিয়ে বাবুজি — অসপাতালকি কামপে ম্যায়নে কুছ শিখ সকতি। লেকিন ও কাম তো বড়ি কঠিনাই হোগি।

কিঁউ।

হররোজ বাস পাকড়না পড়েগি। যানে আনে মে করিবন দো ঘণ্টা চলি যায়েগি। শিফ্‌ট ডিউটি করনা পড়েগি। লেকিন ইহা দফতর যানেমে বাসকা কোই ঝামেলা নেহি। রাত ডিউটি ভি নেহি। দফতরমে এক ঘরসে আরেক ঘরমে কাগজা দেনা পড়েগি। টেবিলকা খাতা, কলম ঠিকঠাক করদেনা পড়েগি। পায়দল যায়েগি। লোটেগি পায়দল।

অন্ধকারে মুখ না দেখতে পেলেও রজত চামেলীর গলার স্বরে আনন্দ, উৎসাহের আভাস পাচ্ছিল।

চামেলী ঠিকই করে এসেছে — এখনকার মত তাদের পুরনো কোয়ার্টার থেকে চারপাই, বিস্তারা, লোটা — এসব নিয়ে যাবে ন'নম্বরে। তারপর আস্তে আস্তে সব নিয়ে তুলবে নতুন কোয়ার্টারে। আগে দফতরের কাজে জয়েন করে নিই। তারপরে একে এক সবই হবে। এখন সে রোজগারওলি — নোকরি মিলনেওয়ালি — নসিবওয়ালি এক আওরত। তাকে আর বেসাহারা অভাগন বলা যাবে না। নোকরিটা এখন চামেলীর কাছে কাল সকালের চারদিক আলো করা সূর্যের মত। সূর্য উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ফৌজদার পাসোয়ান কোয়ার্টারে নেই। ডিউটি থেকে ফেরেনি। রজত বলল, অব কেয়া কিয়া যায়?

য়ঁহা তো চারপাই হ্যায়।

রজত দেখল, কাল রাতে তাদের বসাবার জন্যে ফৌজদার যে চারপাই বারান্দায় পেতে দিয়েছিল — সেটা আর তোলা হয়নি। ঘরের দরজায় তালা।

চামেলী বলল, আপ য়ঁহা বৈঠিয়ে। ম্যায়নে উনকো ঢুঁড়কে লে আয়েগি।

কাঁহা ঢুঁড়েগি?

কিঁউ? বেন্টিংমে — য়ঁহা তো রিপেয়ারিংমে মওজুদ হোগা ফৌজদার।

কনভেয়র বেল্টিং? তুমি জানো?

রামটহলনে মুঝে সারে নিরসাখনি এক এক করকে দেখায়া থা বাবুজি, ম্যায়নে য়ুঁ যায়েগি — য়ুঁ লওটেগি —

বলে চামেলী যেই যেতে যাবে — অমনি রজত হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল। না তুমি একা একা যাবে না চামেলী। এ জায়গা এখন কেমন — তা আমি জানি না। তুমিও জানো না। নিরসা খনি অনেকদিন হল বন্ধ। ডাকু, লুটেরার রাজত্ব চলছে।

হো হো করে হেসে ফেলল চামেলী। আমি নিরসাকে জোনে বাবুজি। এখানে হামারি কোই কুছ খারাবি নেহি কর সাকতে।

না। তুমি এখন কোথাও যাবে না। বসে থাকো। ফৌজদার ফিরলে আমরা চারপাই বিছানা টিছানা নিয়ে ন'নম্বরে যাব।

আপ কা মর্জি বাবুজি। — বলে বাধ্য মেয়েটির মত চামেলী বারান্দার মেঝেতে বসল।

রজত বলল, ইহা আকে বৈঠো।

চামেলী রজতের পাশে চারপাইতে এসে বসল না।

এসো বলছি। আমি বসব চারপাইয়ে। আর তুমি বসে থাকবে মেঝেতে। তা কি হয় চামেলী। এসো।

চামেলী এসে রজতের কথা মত বসলো চারপাইয়ে। বেশ খানিকটা তফাৎ রেখে।

কেয়া ম্যায় শের হু। অ্যায়সা কিঁউ বৈঠা? আরামসে বৈঠো।

তবু সহজ হতে পারল না চামেলী। লাগোয়া কোয়ার্টারে শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিয়েছে অড়হড় ডালে। বাতাসে তার খিদে চারানো গন্ধ।

ম্যায় তেরা কৌন হোতা চামেলী?

ম্যায়নে তেরা কৌন হোতা চামেলী?

ম্যায়নে নেহি জানতি বাবুজি।

ম্যায় ভি নেহি জানতা।

বৃষ্টি আজ রাতে কাউকেই রেয়াত করবে না। রানীগঞ্জ এখান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। সেদিককার আকাশ চিরে দিয়ে বাজ পড়ল। পর পর। তিনটে। রানীগঞ্জ আর দামোদরের মাঝামাঝি — যাকে ইদানীং টিভি-র আবহাওয়ার সংবাদে বলা হয় — 'দামোদরের উপত্যকা' — তার পাতালেই কয়লার রিজার্ভ। গত দেড়শো বছর ধরে খনি খোলাই চলছে। যেখানে কয়লা আর কাটা যায় না — সেখানে খনি বন্ধ করে চলে আসা হয়। এখন বন্ধ খনিগুলোর ইটে গাঁথা টাওয়ারে বট অশ্বত্থের সংসার। বড় বড় বয়লারের খোল ভাঙা ভিটে বাড়ির মতই মাঠের ভেতর আগাছার জঙ্গলে পড়ে আছে। একদল মানুষ ওখানে একবার সংসার পেতেছিল। তারা কবেই সব উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এই নিরসাতেও তাই হবে একদিন।

বেশ অনেকদূর থেকে ভারি গলায় কে গান গাইতে গাইতে আসছে। দরাজ চওড়া গলা। সে গানে ঢের নম্বরের আর সব আওয়াজ যেন চাপা পড়ে গেল।

ও সবেরেওয়ালে গাড়ি- ই- ই — তার পরের কথাগুলো যে গাইছে তার গলার ভেতর চলে গিয়ে যেন গুন গুন করে উঠল। চামেলী কী বলতে যাচ্ছিল। বলা হল না তার। দেখল, ফৌজদার পাসোয়ান আসছে। চামেলী বুঝলো সে কাঁপছে।

২১

ন'নম্বর ধাওড়ার সামনে একটা গুলমোহর গাছ রাজার মত দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি কি রোদ — সব সময় ফুল ঝরিয়ে চলেছে। এল মার্কা কোয়ার্টারের জানলাগুলো বড়। নোকরিওয়ালি চামেলী নাস্তা করেই দফতরে গেছে। সেই জানলার সামনে চারপাই পেতে বসে আছে রজত। ফাঁকা কোয়ার্টারে বসে সে টের পাচ্ছে — বাইরে বর্ষাকালের রোদ ঘাম দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিচ্ছে। দূরে একটা মোষ অব্দি গরমে নাকাল হয়ে মাথাটা তুলে একবার আকাশটা দেখার চেষ্টা করল।

জেন্দাহায় গিয়ে সে কাজ পেয়ে গিয়েছিল। সেখানে সারাদিন সে কাজে জড়িয়ে থাকত। আজ ক'দিন হল চামেলী দফতরে চলে যেতেই রজত একদম অকূলে পড়ে যায়। করার কিছু নেই। সামনে অঢেল সময়। আর খুব খিদে পায়। তখন — যা সে কোনওদিনই করেনি — তাই করে। চামেলী কী রেঁধে রেখে গেছে — তাই আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখে রজত। ভিন্ডি ভাজি। আর ডাল-ই করে রেখে যায় বেশিরভাগ দিন। দপ্তর থেকে ফিরে হাত পা ধুয়ে চামেলী আটা মাখতে বসে। আর সেদিন যা যা ঘটেছে দফতরে তাই একটু একটু করে বলে যায় রজতকে। খুবই সাধারণ সব ঘটনা। কিন্তু এমনভাবে বলে চামেলী — যেন মেলা দেখে ফিরে এসে গল্প বলছে। যেন বা রজত একটি বালক শ্রোতা।

খুঁজে খুঁজে ঢাকা চাপা সরিয়ে দেখে বটে রজত — কিন্তু কোনওদিন কিছু তুলে খায়নি। নিরসা খনি এলাকার ভেতর খনির ক্যান্টিন আছে। এখন তা পুরোপুরি খোলেনি। সেখানে খেতে হলে খনির কাজে থাকার চাকতি দেখাতে হয়। ওখানে যায়নি সে। দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে বাস রাস্তায় গিয়ে নিমগাছের নিচে চটি মত জায়গায় সে কচৌরি খেয়ে এসেছে। একদিন সে ওই নিমগাছের নিচে ইটে বসে মাথার চুলও কেটেছে। হজাম জানতে চেয়েছিল, কেয়া দাড়ি বানাওগে?

নেহি —। বলে রজত আর দাড়িটা কাটেনি।

আজ সে চামেলীর কিনে দেওয়া নতুন স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে হেঁটে দেখার চেষ্টা করল। ছোট্ট খোলা বারান্দায় বেশি ঘোরা যায় না। ওর ভেতরেও পায়ে দিয়ে হাঁটতে কেমন অস্বস্তিতে পড়ল রজত। সে তখন স্যান্ডেলজোড়া পা ছুঁড়ে ঘরের ভেতরকার তক্তপোশের নিচে পাঠিয়ে দিল। তারপর বদলি চাবি দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এখানকার মাটি পাথুরে — যেখানে সেখানে দানা দানা কাঁকর। হাঁটতে গিয়ে লাগছে। সাইকেল ভ্যানে ব্যাটারি সেটে হিন্দি গান। তার পাশে আচার সাজানো। গান শুনে ভিড় হচ্ছে আর আচার বিক্রি হচ্ছে।

সুখ, আহ্লাদ, উৎসাহ — এ সব জিনিসে যেন রজত আর কোনও টান বোধ করে না। আমার এই শরীর নিয়ে আর কতদিন হেঁটে বেড়ানো। যদি একদম শুয়েই পড়তে হয় তো, সে হবে আমার শেষ। কেউ এসে তুলে ধরে আমায় বসিয়ে দেবে — এ ভাবতেই পারি না।

ন'নম্বর আর আট নম্বর ধাওড়ার লোকজন যারা পথে পড়ছে — তারা রজতকে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে তার এখনও আলাপ পরিচয় হয়নি। তাকে দেখে ওদের এই তাকাতে তাকাতে যাওয়া দেখে রজত আন্দাজ করতে পারে — রো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না — চামেলীর মত কম বয়সী বেওয়া এক আওরতের সঙ্গে তার মত বয়স্ক লোকের সম্পর্কটা

কী?

ঠিক এই সময় — নিরসা খনি অফিসের বারান্দায় টুলের ওপর বসে চামেলী দেখতে পেল — দূরে মাঠের ভেতর দিয়ে উঁচু-নিচু জমি ভেঙে একটা লোক হেঁটে আসছে। আকাশের নিচে মাথার ওপর কোল-টাব যাতায়াতের রোপওয়ে থাকলেও — মাটির ওপর দিয়ে খাদ-বেখাদ টপকে কনভেয়র বেল্ট চলে গেছে। খনি চালু থাকলে এই বেল্টের ওপর দিয়েই কয়লা পয়লা দফায় যায়। সে রকমই বেল্টের একটা লম্বা টুকরো কাঁধে ফেলে হেঁটে আসছে — কখনও তার মাথা ঢাকা পড়ছে ভাঙা ঢিবিতে। আবার সে ঢিবি টপকে চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

ফৌজদার — কথাটা ঠোঁটে এসে গেল চামেলীর।

এখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত বদলি বেল্ট চাইতে আসছে ফৌজদার।

ভেতর থেকে চামেলীর ডাক পড়ল। ও চামেলী —

চামেলীর আর ফৌজদারকে দেখা হল না। সে ভেতরে এসে এক ঘর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, পানি লাগে? একজন বলল, না। একটু পান এনে দিতে হবে —

কেন যে এরা একবারে বলে না — তা বুঝতে পারে না চামেলী। একটু আগেই সে দপ্তরবাবুদের একজনকে পান এনে দিয়েছিল।

অফিস থেকে বেরিয়ে খনি-হাতার বাইরে পায়ে চলার রাস্তার গায়েই পান বিড়ি নিয়ে বসে একটা লোক। তার কাছে গিয়ে পানের বরাত দিয়ে দাঁড়িয়ে চামেলী — ঠিক এই সময় তার কানের কাছে কে ভারি গলায় বলে উঠল, উস রাত বহুত তকলিফ হুয়ি আপকি —

চমকে গিয়ে চামেলী বলে উঠল, কৌন?

ম্যায় ফৌজদার —

সো তো দেখহি রহি হ্যায়! উস রাত তো আপ চার পাই, বিস্তারা — সবকুছ আপনা কান্ধো পর ব্যয়ঠাকে দফে দফে পঁহুছি দিয়া। তকলিফ কিঁউ হোগি? তকলিফ তো হায় আপকো?

ফৌজদার পাসোয়ান সামান্য হেসে বলল, নই নই নোকরি ক্যায়সা লাগ রহি?

চাকরিটা যেন চামেলীর নতুন গয়না। গর্বও হয়। লজ্জাও করে। সে আস্তে করে বলে, অ্যায়সাহি —

ফৌজদার গম্ভীর গলায় বলল, নোকরি আপকি আজাদি।

এ কথায় কেন যে চামেলী কেঁপে কেঁপে উঠল তা সে বুঝতে পারল না। ভয়ে? না, আনন্দে?

একঝাঁক পাখির মতই বৃষ্টিটা আসছে। আবার চলেও যাচ্ছে। যখন আসে — রজত গিয়ে কাছাকাছি গাছতলায় দাঁড়ায়। গাছতলাটা মাটি থেকে উঁচু বলে — সেই ঢিবিতে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায় — আশেপাশে — দূরে — চালু কয়লাখনির মানুষ,জনের চলাফেরা — প্রান্তরের ভেতর দিয়ে কনভেয়র বেল্টে চড়ে কয়লার যাওয়া — চিমনি — অ্যামবাসাডর, ফিয়াট — কত কি!

জেন্দাহায় থাকতে নানান ভাবনা তার মাথায় ঢুকে পড়ার চান্সই পায়নি। সারাটা দিন রজত কাজে কাজেই জড়িয়ে তাকত। কিন্তু চামেলী নোকরিতে ভর্তি হবার পর থেকেই — বিশেষত একলা দিনের বেলায় — রজত যেন অস্থির হয়ে পড়ে। আমি কি করছি? আমি তো বসে বসে রোটি সাবাড় করে চলেছি। সে এখন এই বৃষ্টিভেজা দুপুরে উঁচু-নিচু প্রান্তরের ওপর দিয়ে তার ফেলে আসা জীবনটা দেখতে পাচ্ছে। কোনওদিনই কোনও কাজের মত কাজ করে উঠতে

পারেনি। খবর লিখেছি মাত্র। সংসার করেছি। চারদিকে মাইনে, ইনসিওরেন্স, অ্যান্টিবায়োটিকের সিকিউরিটির দেওয়াল তুলে ভেতরে ভদ্রলোক সেজে বসে থেকেছি। এক কলম, দেড় কলম লেখা লিখে — পরদিন সকালের কাগজে ছাপা চেহারাটা দেখে ভেবেছি — আহা! কী জিনিস!! এখন রজত পালিত নিজেকে ঠাট্টা করে ফাঁকা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বলল, এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের সব লেখা একসঙ্গে করে খণ্ডে খণ্ডে ছেপে বের কর রজত! বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রাহক চাঁদা তোলো। সেই টাকায় ছেপে বেরোক — রজত রচনাবলী — প্রথম খণ্ড! রজত রচনাবলী — দ্বিতীয় খণ্ড!! সারা জীবন আমি কিছুই করিনি।

পড়ন্ত দুপুরে মিইয়ে পড়া সূর্যের আলোয় সারাটা নিরসাকে কে যেন চোখের সামনে কুঁদে কুঁদে গড়ে তুলেছে। এর ভেতর রামটহল দুসাদ থাকত। সে নেই। মোতিয়া দুসাদ থাকত। সে জেহান্দায়। চামেলী দুসাদ থাকত। সে জেন্দাহা থেকে ফিরে নোকরি নিয়েছে।

সন্ধ্যে রাতে চামেলী ন'নম্বর ধাওড়ায় ফিরছে না দেখে রীতিমত চিন্তায় পড়ল রজত। এখনও খনি চালু হয়নি। যাকে বলে ভাঙা হাট। এর ভেতর যে ক'জন কাজকর্ম করছে — তারা একে একে যে যার কোয়ার্টারে ফিরল। কিন্তু চামেলী ফেরে না কেন?

এক টুকরো ভাঙা আয়নার মত চাঁদ আকাশে দেখা দিতে চামেলী দুসাদ ফিরে এল। হাতের বোঝা নামিয়ে বলল, আটগো আম লায়ি। ইস্ সাল বাবুজি আমকা পয়দায়িস বহুত খারাপ!

রজত কোনও কথা বলল না। সে এতক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ খারাপ করে ফেলেছে। মাথাও যেন ধরে উঠেছে।

আম কেটে এনে রজতের সামনে ধরল চামেলী। কেয়া তবিয়ত আচ্ছা নেহি বাবুজি?

আমার তো বয়স হয়েছে। শরীরের দোষ কী? তোমার আসার পথ চেয়ে বসে আছি ঠায় —

তার জন্যে কেউ চিন্তা করে ভেবে খুশিতে চামেলী খিল খিল করে হেসে উঠল। আমের প্লেটটা টুলের ওপর রেখে সে এগিয়ে এসে রজতের পিঠে হাত বোলাতে লাগল। আজ যেন তার জীবনে আর কোনও দুঃখ নেই। একটা চাকরি পেয়েছে। থাকার সরকারি জায়গা আছে। আর মাথার ওপর বাপ য্যায়সে — রজতের মত একজন মানুষ আছে সর্বক্ষণ। হাসি থামিয়ে চামেলী বলল, ম্যায়নে তো আপকা নোকরিওয়ালি বেটি। এতো চিন্তা কীসের বাবুজি?

চামেলীর গলায় পূর্ণিয়া টানে বাংলায় একটা মিঠে ভাব আসে। ছুটির পর এত দেরি হল ফিরতে?

কী করব বাবুজি। ফৌজদার বলল, চল চামেলী — কুছ খরিদনা পড়েগা। তো নিয়ামতপুর বাজার গয়িথি। নেহি তো ইতনা আচ্ছা আম নিরসামে কাঁহা মিলতি?

ফৌজদার পাসোয়ান নিরসামে রিপেয়ারিং পর আচানক আয়া —

আচানক চলা যায়েগা। উসকা বারে মে ম্যায় তো কুছ নেহি জানতা —

রজতের গলায় ফৌজদারের সঙ্গে তার মেশামিশিতে আপত্তির ঝাঁঝ টের পেল চামেলী। পেয়ে তার ভালই লাগল। এই দুনিয়ায় তার ভালমন্দ দেখতে তবু একজন এখনও আছে — যাকে সে কয়েকমাস আগেও জানত না। রজতের উদ্বেগের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভালমানুষি গলায় চামেলী বলল, ওহ্ পাসোয়ান কেয়া আচ্ছা — কেয়া ভালা — ম্যায়নে ভি না জানতি। দেড় সাল বাদ নিয়ামতপুর বাজার মে গ্যয়ি। খরিদনেকা কেয়া নেহি যো চাহো খরিদো।

সব বাজারই তাই চামেলী। খরিদ্দার ভোলাতে জিনিস নিয়ে বসে থাকে দোকানিরা।

এ 'ভোলাতে' কেয়া হ্যায় বাবুজি?

মন হরণ করে বলেই না আমরা মনোহারী দোকান বলি।

রজত দেখল — বাংলাটা অনেকটা বুঝলেও সব বাংলা কথার থই পায় না চামেলী। সে অবাক হয়ে তার মুখে তাকিয়ে আছে।

রজত তখন বলল, মনমানি তো জানতি চামেলী?

হাঁ বাবুজি।

অ্যায়সাহি চামেলী। দেখো — ফৌজদারকো তুমহে আচ্ছি লাগি।

কী কথায় কী কথা? রীতিমত কেঁপে গেল চামেলী। মনে পড়ে গেল — ভরা গলায় গেয়ে উঠা — ধ্যাড়ধেড়ে হাঁটা — লম্বা লম্বা পা ফেলে — জামার বাইরে শির ওঠা চওড়া হাত।

তুমহে ভি উনকো আচ্ছা লাগা। নেহি তো তুম দোনো একসাথ নিয়ামতপুর নেহি যাতে থে —

বাবুজির একথায় কিছুই বলল না চামেলী। আজ কিছু আগে দফতর থেকে বেরিয়ে সে আর ফৌজদারি পাশাপাশি হেঁটেছে। নিরসা খনি — নিরসা চটি পেরিয়ে বাসের সঙ্গে দেখা। বাসে বিশেষ ওঠেনি কোনওদিন চামেলী। ছেড়ে দিচ্ছিল বাস। ফৌজদার আগে উঠে পাদানি থেকে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকায় তাকে ভেতরে নিয়ে গেছে। ফৌজদারের হাতের পাতা খরখরে। কড়া পড়া হাত। চোদ্দ পাউন্ড হাম্বর চালানো হাত। ফৌজদারের হ্যাঁচকা টানে তার সারা শরীর ঝাঁকুনি খেয়ে গেছে। সে যেন অন্য দিনের তুলনায় অনেক ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছে। তার ওপর আবার বাবুজির মুখ দিয়ে কীসব কথা বেরচ্ছে। চামেলী বুঝল — তার যেন অবশ দশা। নিয়ামতপুর বাজার থেকে ফিরতে ফিরতে দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠল। 'আসানসুলের' বড় পুলিস অফসর জিপ থেকে 'ফেমিলি' নিয়ে নামল। চোখ ভরে দেখছিল চামেলী। কী সুন্দর জেনানা। বালবাচ্চা।

হঠাৎ ফৌজদার বলল, চল চামেলী — বাসকো কোই ঠিক ঠিকানা নেহি। রিকশভ্যানমে তুরন্ত চলা যায়েগা —

রাস্তায় কোথাও বিজলি আলো। কোথাও চাঁদের আলো। বিজলি আলো পড়লে সেখানে পান বিড়ি কচৌরির দুকান। আবার চাঁদের আলোর ভেতরেও কুপি জ্বেলে আলুর চপ, বেগুনির কেনা-বেচা। এ সব দু'পাশে ফেলে পাঁচ-ছ'জনকে নিয়ে রিকশাভ্যান ছুটছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট। ওরই ভেতর সাইকেল ভ্যানে পা ঝুলিয়ে বসে মহাফুর্তিতে ফৌজদার গান ধরল।

বাতাস ঠাণ্ডা। আকাশের নিচে চারদিক আবছা। দূরে কোথাও ইলেকট্রিকের জোরালো সার্চ লাইট। তার আভা। রাস্তার দু'ধারে খাদান মত নাবি জমি। মোটা গাছের গুঁড়িতে সাদা চুনকাম — পাছে কোনও গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মেরে নাবিতে উল্টে যায়।

এসবের ভেতর দিয়ে ফৌজদার পাসোয়ান গাইছিল। তার ভরা গলা রাস্তার দু'ধারে ছড়িয়ে পড়ছে। গানটার ভেতর একটা দিশি মোরগের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আছে।

তাই গান থামিয়ে ফৌজদার মাঝে মাঝে মোরগটার গলা নকল করে ডাক দিয়ে উঠছিল। সে-ডাকে চামেলী তার হাসির বাগ মানাতে পারেনি। হাসতে হাসতে সে ঢলে পড়ছিল। একবার তো ফৌজদার তাকে বাঁ হাতে পেঁচিয়ে না ধরলে চামেলী চলন্ত ভ্যান থেকে পড়েই যেত।

বাবুজির সামনে বসে চামেলী এখন বুঝতে পারছে না — বাবুজি তাকে দেরি করে ফেরায় বকছে — না বাঁকা পথে কথার ফেরে তাকে সমঝে দিচ্ছে।

হঠাৎ রজত বলল, আমি এবার চলে যাব —

চামেলীর বুকের ভেতর থেকে কান্না উঠে আসার যোগাড়। কাঁহা যাবেন বাবুজি? কিঁউ যাবেন?

আমার তো কাজ শেষ এখানে চামেলী।

কেয়া শেষ? কিসকা সঙ্গ আমি থাকবে এখানে বাবুজি?

বাঃ! তোমার নোকরি হয়েছে। থাকবার কোয়ার্টার হয়েছে। তুমি এখন তোমাকে নিয়ে থাকবে।

ম্যায়নে কভি আকেলি নেহি থি বাবুজি। আকেলি ম্যায় মর যাউঙ্গি বাবুজি।

ইধার তুমহারি সব কোই হো যায়েগা। হাতপে পয়সা হ্যায়। কোন কিছুর অভাব হবে না তোমার। আমি কী করে বসে বসে খাই বল তো।

কেঁদে ফেলল চামেলী। অ্যায়সি বুরি বাত আউর ভি মৎ বলিয়ে। বুঢ়াপা আপ কো আভিতক নেহি আয়া। আপকো বেটি য্যায়সে ম্যায় — ইয়াকিন কিজিয়ে — আপকো দেখভাল — খানাপিনা ম্যায়নে এন্তেমাল করুঙ্গি বাবুজি।

রাতে শোবার সময় রজতের নিজের মশারি টানাবার মত ইচ্ছে থাকে না কোনওদিনই। ঘুম এসে তার দখল নেয়। আজ কিন্তু চামেলী এসে মশারি টাঙালো।

কী হচ্ছে চামেলী?

কবু নেহি। মচ্ছর বহুত কাটতি।

তুম শো যাও চামেলী। দিনভর দফতরমে কাম পে থি। থাকা হুয়া — যাও, লেট যাও।

চামেলী কথা শুনলো না। ঢাকা — কিন্তু তিনদিক খোলা সামনের ছোটমত বারান্দায় চারপাই পেতে শোয় রজত। ভেতর ঘরে চামেলী শোয়। কাজের ভেতর রজত সারাদিনের এক সরাই ভর্তি করে খাবার জল নিয়ে আসে টিউবওয়েল থেকে। নয়তো ঘর ঝাঁটপাট, রুটি বানানো — সবই চামেলী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

অনেক রাতে বিছানার ভেতর ঘুম ভেঙে গেল রজতের। সে খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেল — চামেলী ঠিক ছেলেবেলার ইরার মতই ডান কাতে হাত মেলে রেখে তার ওপর মাথা দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

পরদিন চামেলী সন্ধ্যের অনেক আগেই দফতর থেকে ফিরে এল। চায়ে পিয়োগে বাবুজি?

চা তো তুমি খাও না চামেলী।

আপকো লিয়ে লায়ি —

তো বানাও। দো পেয়ালা বানাও। তুম ভি পিয়োগি।

চা বানিয়ে রজতকে দিয়ে নিজেও পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে বসলো চামেলী। পেয়ালা মানে — এখানে বুঝবে গ্লাস। অনেকদিন চা খায় না রজত। সেবারে নিরসায় রিপোর্টিং করতে এসে রজত একে একে অনেক কিছু থেকে সরে এসেছে। জোর করে নয়। আপনা আপনি। একদম নিজের অজান্তে।

আজ অনেক দিন পরে চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হল একদম নতুন জিনিস। চামেলী যে চা বানিয়েছে — তাতে সবই আছে — কিন্তু চা হয়নি। দুধ, চিনি — দুইই বেশি। সেই চা গরম শরবতের মত তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে চামেলী।

নিজের গ্লাসটা মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে রজত বলল, দু'খানার বেশি রুটি খাব না। বেশি

রোটি বানাবার দরকার নেই চামেলী। একটু হেঁটে আসি।

কিঁউ? ভুখ নেহি?

ভুখ থাকবে কোত্থেকে? সারাদিন তো ঘরে বসে।

তব তো মেহনত করনা চাহিয়ে। ঘুমকে আইয়ে বাবুজি।

কিছুদিনের ভেতর নিরসার রাস্তাঘাট মুখস্ত হয়ে গেছে রজতের। এখন যেদিকেই যায় তার চেনা লাগে। তবে হেঁটে তো সব জায়গায় যাওয়া যায় না। নাবি পেরিয়ে দূরে একটা জায়গা হয়ত সুন্দর, ইন্টারেস্টিং লাগল রজতের। কিন্তু সেখানে যাবার উপায় নেই। অনেক চড়াই ভেঙে — আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে তবে সেখানে যাওয়া যায় — যা কিনা রজত কেন — খুব গেছো লোক না, হলে যাওয়া সম্ভবই নয়।

নিরসা খনি আবার একটু একটু করে জেগে উঠছে। ছুটি কাটিয়ে লোকজন দেশ থেকে ফিরছে। খালি কোয়ার্টার সব ভরে উঠল বলে। মাত্র ক'মাস আগে কতগুলো মানুষ যে আর খনি পাতাল থেকে ওপরে উঠল না — সেসব কথা এখন গল্পগাছা।

আবার সন্ধ্যের পর ঘরে ঘরে গান। আবার বিকেলের শেষে সাইকেল হাতে পরদিনকার বাজার হাট করতে বেরনো। হেঁটে ফিরতে ফিরতে রজত দেখল সে অন্ধকারে পড়ে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে গুতোগাতা লাগে — তাই সে যেখানেই কোয়ার্টার পায় — তার আলো দেখে দেখে হাঁটতে লাগল।

এভাবে কখন যে সে আগেকার তের নম্বর ধাওড়ার গায়ে এসে পড়েছে — খেয়াল করেনি। চেনা বাবলা গাছটার বাঁকে এসে সে থমকে দাঁড়াল। এখানেই আমি গত শীতে প্রথম আসি।

ওই তো রামটহলদের বারান্দা।

রজত দেখল, একদম অন্ধকার। ঘরও অন্ধকার। ফৌজদার পাসোয়ান হয়ত কাজের পর কোথাও গেছে — ঘরে তালা দিয়ে। রজত চলে আসছিল। হঠাৎ বারান্দার সামনে একটি চেনা ছায়া দেখে সে থমকে দাঁড়াল।

আগাছার মত বেড়ে ওঠা ভুট্টার গাছ। আর দানা ধরে না। উঠোন বলতে এখন শুধুই আগাছা ঢাকা কিছু জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে চামেলী। একা অন্ধকার বারান্দার দিকে তাকিয়ে। কোনওদিকে কোনও খেয়াল নেই।

এমনভাবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চামেলীকে চোর ভেবে তাড়া করাও আশ্চর্য নয়। রজত বুঝতে পারল না — চামেলী কেন ওভাবে দাঁড়িয়ে। ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? না। তাহলে ওভাবে একদম স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত না। তবে কি রামটহলের সঙ্গে বিয়ের পর এই কোয়ার্টারেই জীবন কাটিয়েছে — তাই ফিরে ফিরে দেখতে আসা?

হবেও বা। চেঁচিয়ে ডাকলে ভয় পেয়ে যেতে পারে। লজ্জাও পাবে। রজত বুঝলো — এই তো বয়স — খুব একলা হয়ে গেছে চামেলী।

সে খুব আস্তে ডাকল, চামেলী?

চামেলী শুনতে পেল না। পেলে ছুটে আসত। এ-গলা তার খুব চেনা।

এবার রজত গলা আরেকটু তুলে ফের ডাকল, চামেলী? চামেলী বিটিয়া?

ঘাড় ফিরিয়ে চামেলী তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। তবু স্বপ্ন পাওয়া গলায় বলল, যাতি হুঁ বাবুজি —

আগাছায় ভরা উঠোন মাড়িয়ে — কাঁটা গাছের তোয়াক্কা না করে ছুটে এল চামেলী।

বাবুজি—

আও —

এবার রজতকে দেখতে পেল চামেলী। সে এগিয়ে এসে রজতের হাত ধরল।

কিতনা দূর গয়া?

দূরে যাইনি। এহি আমনে সামনে —

আভি তো ভুখ লাগা হোগা —

খানা বনায়া?

কব্ তো চুকি বাবুজি।

তব চল — একসাথ বৈঠকে খানা খা লুঙ্গা।

খেতে বসে খুব গোপনে রজত চামেলীর মুখ দেখতে লাগল। মুখখানি শুকনো। জেন্দাহায় তবু দইয়ের জন্যে দুধ জ্বাল দিতে চুলো ধরাতো। শাশুড়ি মোতিয়ার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করত। এখানে কী করবে?

স্রেফ দফতরে সারাদিন একটা টুলে বসে থাকবে? মাঝে মধ্যে পানি, পান এগিয়ে দেবে? আর এক টেবিল থেকে কাগজ আরেক টেবিলে পৌঁছে দেবে? এতে তো চামেলীর মত খাটিয়ে মেয়ের শরীরের আড়ই ভাঙবে না।

ডাল রোটি এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে রজতের। খেতে খেতে সে এ শুধু একটা ফারাক বের করতে পারল। তা হল আগে চামেলী দইয়ের দুধ চুলোয় বসিয়ে শাশুড়ির হাত থেকে আপনা আপনি বিশেষ কিছু পেতো না। ঝগড়াঝাঁটি করে দুটো চারটে টাকা পেত। আর এখন মাস গেলে মাস মাইনে হিসেবে যা পাবে চামেলী — তা তার কাছে প্রায় অগুনতি টাকা।

রামটহলের সৎকারের সরকারি টাকা এখনও ফুরোয়নি। সেই টাকা থেকে গুনে গুনে হাজার টাকা রজত ঘুমিয়ে থাকা মোতিয়া দুসাদের মাথার কাছে চাপা দিয়ে রেখে এসেছিল।

জেন্দাহায় যেমন খরচ করার রাস্তা নেই — নিরসাতেও বা খরচ করা যাবে কোথায়? তবু সব টাকাই রজত গুনে গেঁথে রেখেছে। বিশেষ করে চামেলী বেওয়া মানুষ। যদি সঙ্গে সঙ্গে নোকরিটা না পেতো — তো শুধু এই টাকাই ছিল ভরসা। খেতে খেতে রজত ঠিক করল — কালই সকালে সব টাকা চামেলীর হাতে বুঝিয়ে দেবে। তোমার টাকা এবার থেকে তোমার কাছে রাখ।

উধার আন্ধেরামে কেয়া করতি থি?

কাঁহা বাবুজি?

তেরা নম্বরমে —?

হোঃ! — মত ছোট করে হেসে বলল, আভি ও কিতনে দূর — আউর কিতনে পাস ভি—। হাম দোনো কভি কভি য়ঁহা বৈঠতে থে — খুলি আসমানকা নিচে বাবুজি।

কথা বলতে বলতে চুপ মেরে গেল চামেলী। খাওয়া যেন ভুলে গেল। গত শীতেও তো রোজ মাথায় ক্যাপলাইট লাগিয়ে খনি পাতালে নামত।

খা লো বেটি — খা লো।

নিজেই লক্ষ্য করল রজত — এখন চামেলীকে তার মেয়ে বলে ডাকতে কোথাও আটকাচ্ছে না।

২২

খনি প্রায় চালু হওয়ার মুখে। রোজ কোনও না কোনও ইউনিয়ন জলুস বের করছে। খনিটা খুলে ফেলার দিন এগিয়ে আনার কৃতিত্ব নাকি শুধু তাদেরই। আবার সরাইওয়ালা, কিস্তিতে কাপড়জামা, থালা, বাসন-কোসন বিক্রির সেলসম্যান, হিমতাজ তেল, মেয়েলি ওষুধ ফিরির লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকি কাক যে কাক — তারাও খবর পেয়ে গেছে। এখন তাদের এ বাড়ি ও বাড়ির রান্নাঘরের সামনে প্রায়ই দেখা যায়।

বৃষ্টির বাড়াবাড়ি গেল ক'দিন। রাস্তাঘাটে বেরোলেই ভিজতে হচ্ছে। কোথাও কিছু নেই। মাঝরাস্তায় পৌঁছে দেখা গেল ওই বৃষ্টি ছুটে আসছে। কাছাকাছি কোনও গাছও নেই যে, ছুটে গিয়ে নিচে দাঁড়ানো যাবে।

চামেলী নিরসা খনির ক্যাম্প অফিস থেকে ক'দিন হল পাকা অফিসে বদলি হয়েছে। পাকা অফিস আসলে তৈরি হচ্ছে নতুন করে — যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, আগুন লাগলে অফিস সরাসরি কলকাতায় সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। জায়গাটা কিছু দূরে। সেখানে যেতে সময় লাগে। ফিরতেও চামেলী সন্ধ্যা করে ফেলে।

একা কোয়ার্টারে কী করা যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে রজত ভায়া নিয়ামতপুর-আসানসোলের বাস ধরে উঠে বসল। ভাল লাগলে কোথাও নেমে যাওয়া যাবে। জানলার গায়ে সিটে বসে রজত ঘনিয়ে আসা মেঘের দিকে তাকাল। আর তো বর্ষা ফুরিয়ে এল। দূরে মাঠে মাঠে এই সময় জেন্দাহায় মানুষ দেখা যায়। মোষ দেখা যায়। এখানে দেখা যায় বাতিল বা চালু খনির চিমনি। খনি-ফেরত মানুষের ভিড়। একা একা উজিয়ে চলা কোনও মোটরগাড়ি। আমি তাহলে এতকাল কাদের জন্য কাগজে লিখে এসেছি? কতজন লোক কাগজ পড়ে? আমাদের এই লেখালিখির ব্যাপারটার নাম প্রেস। এই কথাটি লেখা স্টিকার লাগানো গাড়িতে করে কত জায়গায় রিপোর্ট আনতে গেছি। কত সেমিনারে প্রেস নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে। গণতন্ত্র। স্বাধীনতা। এখন একগাল দাড়ি নিয়ে খালি পায়ে বাসের সিটে বসে রজতের মনে হল — ও সব থেকে বেশ দূরে সরে এসে এখন আমি কত ভাল আছি। বেশ ভাল আছি। চামেলী নামে অন্তত জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে একই কোয়ার্টারে থাকি। মাঝেমধ্যে বাজারহাট করি। চামেলী রাঁধে। তার সঙ্গে পাশাপাশি বসে রুটি খাই। অড়হড় ডালে জিরে ফোড়ন নিয়ে দুটো কথা হয়।

মানুষজন উঠছে. নামছে। নিয়ামতপুরে এসে বাস ভরে গেল। বাসের ছাদ ভরে গেল কাঁঠালে কাঁঠালে। এত কাঁঠাল এদিকে কোথায় হয়?

খুব একটা নির্জন জায়গা দেখে নেমে পড়বে বলে ভেবে রেখেছিল রজত। কিন্তু যেখানেই নামবে ভাবে — সেখানে আর নামা হয় না। ভিড় ঠেলে এগনোই কঠিন।

শেষে সেই আসানসোল স্টেশনের কাছে এসে নামতে হল। সেখানে বাসও খালি। রজত কী ভেবে একখানি প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াল।

পরপর প্ল্যাটফর্ম। ট্রেন আসছে যাচ্ছে। এ লাইনে রেলের পার্টিগুলো একটুও বিশ্রাম পায় না। কোন ছেলেবেলার একটি সিঙ্গিল লাইন রেলরুটের কথা মনে পড়ল তার। কোন্ জায়গা এখন আর মনে পড়ছে না রজতের। সারাদিনে মোট দু'খানি ট্রেন যেত। দু'খানি আসত। বাকি সময় লাইনের পাশে দুপুর বেলা গাছের ডালে ঘুঘু ডাকত। সে ডাক শোনার মত লোক

রাস্তাতেও থাকত না।

ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল রজতের। না জানি চামেলী এক একা কী করছে কোয়ার্টারে। ন'নম্বরে কোয়ার্টারের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল রজত।

মোটা গলায় ফৌজদার কথা বলছে। তার সঙ্গে চামেলীর দেহাতি হিন্দিতে নাছোড় তর্ক — হাসির হররা — দু'জনের একই সঙ্গে কথা বলে ওঠা — ওদের খেয়ালই নেই ওদের বাদ দিয়ে বাইরে একটা জগৎ আছে।

রজত একবার ভাবল গলাখাঁকারি দেয়। দিয়ে ওদের হুঁশিয়ার করে। রজত পালিত বেড়িয়ে ফিরে এসেছে এই মাত্র! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল — এ কোয়ার্টার তো চামেলী দুসাদের নামে। সে কোল ইন্ডিয়ার কর্মচারী। রজতের গলা খাঁকারিতে চামেলীই বা কেন নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠবে? উঠোন থেকেই খুবই দোস্তালি গলায় রজত চেঁচিয়ে বলল, কেয়া ফৌজদার আয়া?

ফৌজদার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হাঁ বাবুজি।

চায় পিয়োগে?

নেহি বাবুজি। পি লিয়া। চামেলীনে চায়ে কি থি।

তো রোটি খাওগে?

ঘরমে রোটি বনা হুয়ে বাবুজি —

ফৌজদার ফি কথায় তাকে বাবুজি বাবুজি বলতে থাকায় রজত বুঝতে পারল — চামেলীর কাছ থেকে তার কথা সবই শুনেছে ফৌজদার। কথায় কথায় হাসি। মুখের চেহারায় কী একটা আছে ছেলেটার — যা তাকে আর পাঁচজন থেকে আলাদা করে দেয়। জেন্দাহা থেকে আলাদা। আবার নিরসা থেকেও আলাদা। কেমন শহুরে কায়দায় সবসময় কামানো গাল — ফিটফাট। যেন বেলুড় বা সোদপুরে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লাইন মেকানিক। যারা কথা বুঝে কথা বলে। যাদের বুক পকেটে সবসময় লাইন টেস্টার, স্ক্রুড্রাইভার থাকে।

চামেলী নিজে থেকেই বলল, বাবুজি। ম্যায়নে তো হার মানি। আপ দেখিয়ে কেয়া মানে ইয়া না মানে —

রজত ঠিক বুঝতে পারল না। কিসে হার মানল চামেলী? ফৌজদারই বা কী মানছে না?

ফৌজদার নিজে থেকেই বলল, আউর দো তিন মাহিনা বাদ ম্যায় আপনা পুরানা জগ্‌হা— পুরানা খনিমে লওট জায়েগা —

চামেলী বলে উঠল, ইহা নিরসামে আপ য্যায়সা কাবিল আদমি কো সাহি কদর হোগা— জলদি প্রমোশন ভি মিলেগা—

রজতের মুখ দিয়ে বিলকুল বাংলা বেরিয়ে এল। চামেলী তো ঠিকই বলছে। তুমি যা ভাল কাজ জান — এখানে থেকে গেলে তাতে তোমার প্রোমোশন হবেই —

কিছু বুঝতে পারল ফৌজদার। কিছু পারল না। সে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ম্যায় তো ইহা মেরামতি কাম পর আয়া — কাম পুরা হো যায়েগা তো ম্যায় ভি চলা যায়েগা বাবুজি।

কথাগুলো রজতের দিকে তাকিয়ে বলেই ফৌজদার চামেলীর মুখে তাকাল। ঘরের ইলেকট্রিক আলোয় জোর কম। বাইরে বৃষ্টি কখনও জোর — কখনও একদম নেই।

চামেলী কোনও কথা বলছে না। ফৌজদার তো ও কথা বলেই চুপ। রজত বুঝল — ঘরের ভেতর এই 'খামোশি' আসলে চামেলীর বুকের ভেতর তোলপাড় তুলেছে। রজত জানে তার

নিজের বয়স হয়েছে। চাকরিতে ঢুকে চামেলী যেন আগের চেয়ে অনেক সহজ — হাসিখুশি হয়ে উঠলেও এ ক'দিনে কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। আর ফৌজদার তার সামনে সবসময় ভদ্র, বিনয়ী — কোনও উচ্ছ্বাস নেই। অথচ ক'দিন আগেও থেকে থেকে কেমন গেয়ে উঠত— হেসে উঠত ফৌজদার।

রজত জানে — একবার ভালবাসার ভেতর পা দিলে মানুষ গম্ভীর হয়ে যায়। রাত বাড়ছিল। কিন্তু কথা আর এগোচ্ছিল না। ফৌজদার যখন নিজের ঘরে গিয়েই তার রুটি খাবে — তখন আর কার জন্যে বসে থাকা। খিদেও পেয়েছে রজতের। সে বুঝল — বিকেলে কোনও নাস্তা না করে থাকলে চামেলীরও জোর খিদে পাওয়ার কথা।

শেষে ফৌজদার নিজেই উঠে দাঁড়াল। কাউকে কোনও কথা না বলেই সে রাগ পায়ে বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকারে গিয়ে পড়ল। সহবত মত চামেলীর গিয়ে দাঁড়ানোর কথা। কিন্তু সে উঠল না।

রজত কোনও কথা বলতে পারছিল না। সে বুঝতে পারছে — ফৌজদারের এই চলে যাওয়া — চামেলীর চুপ করে থাকা ওদের ভেতর কোনও ঝগড়াঝাটির দরুন ঘটল — তা নয়। বরং কোথাও চিন চিন করে ব্যথা গড়িয়ে পড়ছে বলেই এমন হল। আমি এসে পৌঁছবার আগে তো ওরা হাসছিল — কথা বলছিল দিব্যি। তবে কি দু'জনের ভেতর এমন কিছু ঘটল — যাতে ওরা নিজেরাই বুঝতে পেরেছে — ওরা এক উঁচু মত পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও দেওয়ালের সামনে এসে পড়েছে?

খাবার সময় কোনও কথা হল না চামেলীর সঙ্গে। আলাদা করে ওরা দু'জন একসময় ঘুমিয়েও পড়ল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে রজত টের পেল — নিশুতি রাতের বাতাস একা ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে — নিরসা আবার খুলছে — নিরসা আবার খুলছে। দেখিস নিরসা আবার চলবে। নিরসা আবার চলবে। তাই মনে হল রজতের।

পরদিন বিকেলে চামেলী দপ্তর থেকে ফিরলে রজত বলল, চল কাঁহা ঘুম আয়ে —

খুব খুশির গলায় চামেলী বলল কাঁহা বাবুজি?

চল সহি — কাঁহা তো যায়ে — যেদিকে দু'চোখ যায় ঘুরে আসি চল।

খানা কৌন বনায়েগা?

বাহারমে খা লুঙ্গা চলো চলে —

দু'জনে ঘুরতে বেরিয়ে নিরসা ছাড়িয়ে চলে যেতে কোনোই আটকাল না রজত বা চামেলীর। তারপর বড় রাস্তার মোড়ে এসে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের নিজের বুস্টার স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারল না রজত। এখানেই চৌরাস্তা। চারদিকে চারটি রাস্তা চলে গেছে। নিরসার লোকের মুখে যার নাম 'চৌরাহা'।

আজ বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘও নেই। তাই রাস্তাঘাটে অনেক বেশি করে মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে। নিয়ামতপুর বাজার থেকে চার-পাঁচটি ফ্যামিলি একসঙ্গে মাসকাবারি বাজার করে একটা অটোতে মালপত্র নিয়ে ফেরে। সেরকমই একটা অটো মাল নামিয়ে দিয়ে ফিরছে। হাত তুলে রজত থামাল। বেশ ফুর্তি মাখানো হাসি ছড়িয়ে চামেলী অটোতে উঠল। উঠে বলল, কাঁহা যায়েঙ্গে বাবুজি?

সো তো নাহি জানি!

বাঃ! এ ক্যায়সা সফর?

দেখো সহি। কাঁহা লে চলে মেরে চামেলী বিটিয়াকো নিয়ত।

এমন ফুর্তিবাজ অনেকদিন দেখেনি বাবুজিকে। চলন্ত অটোর দুদিক থেকেই সন্ধ্যের বাতাস ঢুকে চামেলীর মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। বাঁ হাতে তার খানিকটা সামলে নিয়ে চামেলী রজতের মুখোমুখি তাকিয়ে বলল, এ কেয়া হুলিয়া কর রাখ্‌খা বাবুজি?

রজত নিজের গায়ের দিকে তাকাল। সাধারণ একটা পাঞ্জাবি। নিচে মালকোপ দিয়ে পরা ধুতি। ডান হাত বুলিয়ে নিজের গালের দাড়ির আন্দাজ নিল একবার। খালি পা। হাত দিয়ে মাথার চুলও একবার ঠিক করে নেবার চেষ্টা করল। কিঁউ? কেয়া হুয়া?

বঙ্গালি কাপড়া মে আপকো সবসে আচ্ছা দেখাতা — লেকিন —

কেয়া?

এ ধোতি — এ কুর্তা — সবকুছ গন্দা হো গিয়া। সাফ করনা চাহিয়ে —

কাল কেচে দিও। সাবুন তো হ্যায়।

কাচলে চোলবে নেহি বাবুজি। পুরা টুটা-ফুটা হো গয়ি!

তাহলে ব্যাগ থেকে বের করে নতুন জামা গায়ে দেব।

মগর জুতা কাঁহা হ্যায় আপকা?

স্যান্ডেল কিনে দিয়েছে চামেলী। তা খাটের নিচেই পড়ে থাকে। একটু অসুবিধেয় পড়ল রজত। সে কিছুই বলতে পারছে না।

নাঙ্গা পায়ের মে চলনা ইধার খতরা হ্যায় বাবুজি। দেখিয়ে — জেন্দাহাসে আকর ম্যায়নে ভি স্যান্ডেল খরিদা —

তোমাকে তো দফতর যেতে হয়। তোমার তো স্যান্ডেল জরুরি। আমি ঘরে বসে থাকি। নয়ত কোয়ার্টারের এধার-ওধার ঘুরি।

ইধার নিয়ামতপুর, সাকতোড়িয়া — শহর আসানসুলকা বরাবর বাবুজি। নাঙ্গা পায়ের মে কঁহি বিমার পাকড় লে সাকতে হয় বাবুজি।

বিমার হলে কী হবে? তুই আমার মেয়ে — আমার সঙ্গে আছিস — বিমার হলে দেখভাল করবি — বলে রজত ডান হাত ছড়িয়ে দিয়ে চামেলীর কাঁধে রাখল। তাকে খানিক কাছেও টানল।

ছোট্ট মেয়েটির মত চামেলী তার পাতানো বাবা রজত পালিতের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসল। রজতের মনে পড়ল ঠিক এইভাবেই ইরা ছেলেবেলায় সাইকেল রিকশায় তার গায়ে নিশ্চিন্তে হেলান দিয়ে বসত। সে কতদিন আগে! যেন বা অন্য পৃথিবীতে। অন্য জন্মে।

সন্ধ্যের আঁধারি ঘোর লেগেছে আলোয়। এমন আদুরি ভঙ্গিতে ঠেসান দিয়ে বসেছে চামেলী — তার মুখে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগেকার আলো। চোখে মুখে খুশি খুশি ভাব। নোকরিওয়ালি আওরত। নিজের কোয়ার্টার। অভাব ছিল একটা বাবার। তাও জুটে গেছে।

হঠাৎ সিধে হয়ে বসল চামেলী। কাঁহা চলে বাবুজি?

য়ুঁহি সফর করছি চামেলী। ভাল লাগছে না?

বহুত! লেকিন যায়েগা কাঁহা?

একটা মোড়ে এসে অটোওয়ালা স্পিড কমিয়ে দিল। কিস তরফ যায়েগা?

সামনে রাস্তাটা তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তার একটাকে দেখিয়ে রজত জানতে চাইল, এ রাস্তা কাঁহা লে যায়েগা?

অটোওয়ালার বয়স হয়েছে। কাঁচা-পাকা মাথা। তবে জোয়ান জোয়ান ভাব। রজতের চেয়ে ছোটও হবে। সে হা হা করে হেসে উঠল। ই রাস্তা তো আপকে সারে দুনিয়ামে লে যায়েগা—

নজদিকিয়া কোই জগ্‌হাকো নাম বোলো।

সাকতোড়িয়া যা সাকতে হ্যায়। নিয়ামতপুর ভি যা সাকতে হ্যায় — চাহে তো আসানসুলভি — আপ চাহিয়ে তো টাঙ্কি ফুল পেট্রল লে লেতা —

তো চল আসানসুল।

রজতদের সঙ্গে সঙ্গে অটোওয়ালাও যেন মজা পেয়ে গেছে। সে এক এক খাদানের পাশ দিয়ে যায় — আর সেই সেই খাদানের নাম বলে। কবে খনি খুলেছিল? এখন চলছে কি না? কবে থেকে বন্ধ — তাও সে অটো চালাতে চালাতে বলে চলেছে।

নিয়ামতপুর বাজার অব্দি অটোওয়ালা প্রায় উড়িয়ে নিয়ে এল। অটো থেকে নেমে রজত চামেলীর হাত ধরল। চল। আজ তোকে হাত ভরে চুড়ি কিনে দেব।

চুড়িয়াঁ? বলে প্রায় লাফিয়ে উঠল চামেলী।

ভর সন্ধ্যেবেলার নিয়ামতপুর। ইউ পি, বিহারের পারমিট পাওয়া ট্রাক যেমন বাজার ফুঁড়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে — তেমনি দূর গাঁ থেকে আসা বুড়োবুড়ি টাঙা থেকে নেমে বড় বটতলার বাঁধানো বেদিতে গিয়ে বসছে। চুড়ি বাছতে — চুড়ি পরতে অনেকটা সময় নিল চামেলী। অটোওয়ালা তাগাদা দিচ্ছে। আসানসুল যায়েগা — ফিন উহাসে নিরসা লওটানা —

রজত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চামেলীর জন্যে একটা রঙিন ছাতা কিনছিল। দফতর থেকে যেতে আসতে বারিস আছে — আছে ধুপ। সে কিনছিল আর ভাবছিল — কেনাকাটা যা কিছু — সবই তো চামেলীর টাকায়। ওর সব টাকাই তো আমার কাছে। অটোওয়ালার কথাটা কানে যেতে রজত তার দিকে ফিরে বলল, কোই হড়বড়াই নেহি হ্যায়। আরামসে সফর করাও। তুমহে দিলখুশ কর দেগা।

আসলে আজ রজত বেরিয়েছে — চামেলীকে খুশি করতে। এই মনমরা মেয়েটার মনে তরতাজা ফৌজদার পাসোয়ান এসে যে ঝড় তুলেছে — তা না বোঝার কথা নয় রজতের। সে ফৌজদারের কিছুই জানে না। মেয়ে হিসেবে চামেলী লোভের জিনিস। চাকরি করে। থাকার জায়গা আছে। কোনও পিছুটান নেই। বয়সও অল্প। শেষে না মেয়েটা কোনও বিপদে পড়ে। সব সময় এই ভয় রজতের।

টেপাকল ছাতা পেয়ে চামেলী তো মহাখুশি। ছাতাটা একবার খোলে — আবার বন্ধ করে। আটকে গেলে রজতের দিকে এগিয়ে দেয় — বাবুজি —

রজত হাতে নিয়ে ছাতা আবার ঠিক করে দেয়। দিয়ে ফের চামেলীর হাতে দেয়। মিথ্যে ধমকও দেয় — ফির কভি অ্যায়সা কি তো — সে ধমকে খিল খিল করে হেসে ওঠে চামেলী। এটাই চাইছিল রজত। প্রাণখুলে হাসুক চামেলী। হাসতে হাসতে ভাবুক — আমার সব আছে। চাকরি। কোয়ার্টার। রজতের মত একজন সঙ্‌দিল বাবাও।

নিয়ামতপুর পেছনে ফেলে আধ ঘণ্টার ভেতর অটো আসানসোলে এসে হাজির হল।

য়ঁহা কেয়া খরিদেগা বাবুজি?

কুছ নেহি?

তব?

য়ঁহা তুমহে খিলাউঙ্গা মেরে বিটিয়া —

কাঁহা?

কোই বড়া শানদার দুকানমে চামেলী।

হালুয়াই? পুরি? কচৌরি? লাড্ডু?

নেহি নেহি চামেলী। আভি এক রেস্তোরাঁ মে যায়েগা —

কাঁহা?

যাঁহা বড়ে বড়ে আদমি যাতা খানেকে লিয়ে। অটোর ভেতরেই চামেলী জড়সড় হয়ে পড়ল। নেহি নেহি বাবুজি। হামারি রেস্তোরাবাজি নেহি চলেগি বাবুজি। ম্যায় তো আনপড় গাঁওওয়ালি এক মামুলি লেড়কি।

উতারো — বলে নিজে নেমে পড়ে চামেলীকে নামাল রজত। তারপর বলল, দেখো চামেলী — খানেকে জগ্‌হা পর হাম সব বরাবর হ্যায়। কৌন গাঁওওয়ালি — কৌন শহরওয়ালি — উ সব হিসাব কিতাব য়াঁহা নেহি চলেগা।

বলা সহজ। কিন্তু মনোমত খাবার জায়গা খুঁজে বের করা কঠিন। আসানসোলে কয়লা। এই পথ দিয়েই ইস্পাত যায়। তাছাড়া ব্রুয়ারি। হরেক ব্যবসার দালাল, ফড়ে তো আছেই। ফলে শানদার খাবারের দোকানের কোনও অভাব নেই। কিন্তু যে জায়গাই পছন্দ হয় রজতের — সেখানে ঢুকতে রাজি হয় না চামেলী। একটা দোকানের সামনে রজত চামেলীকে হাত ধরে জোর করেই ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। সে এক সিন। রাস্তা ভর্তি লোক। দোকানটার কাচের শো-কেসে রোস্ট করা আস্ত মুরগি ঝুলছে। ভেতরে গানের সুরেলা আভাস। সন্ধ্যারাত পেরিয়ে গেছে। চড়া আলো। একখানা গাড়ি এসে থামতে তার ভেতর থেকে চামেলীর বয়সী দুটি মেয়ে নামল। জিনস। ওপরে টপ। সঙ্গে দুটি ছেলে।

চামেলী ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল। ছোড়িয়ে —

'কী হল'? — বলতে গিয়ে লজ্জায় গলা শুকিয়ে গেল রজতের।

উহা ম্যায়নে ক্যায়সে যাঁউ?

কিঁউ? সবকোই যা রহা হ্যায় — বলেও নিজের কানেই নিজের গলা ম্লান লাগল রজতের।

উহা বড়ে বড়ে অফসর লোগ — উনকা জিনানা লোগ — পয়সাওয়ালে যাতে হ্যায় — হামলোগ ভি কমহি কেয়া? তুম ভি বে-রোজগারওয়ালি নেহি —

তবু চামেলী এমন রেস্তোরাঁয় যেতে রাজি হল না। রজত দেখল — চামেলীর শরম — জড়সড় ভাবের দরুন আজকের সবটাই বরবাদ হবার দাখিল।

শেষে ওরা দুজন একটা বড়সড় লাড্ডু কচৌরির দোকানে ঢুকল। স্টেশন এলাকা থেকে যে রাস্তা কুমারডুবি ছুটেছে — তার শুরুয়াতের মুখেই জয়শঙ্কর হালোয়াই। বড় করে হিন্দিতে — বাংলায় ডবল লাইনে লেখা হলুদ সাইনবোর্ড। রাবড়ি, মালাই, হালুয়া — কী নেই! ভেতরে বসে সাদা পাথরের টেবিলে কনুই রেখে চামেলী আর খুশি ধরে রাখতে পারছে না।

বড়ি আপসোস কি বাত বাবুজি —

কীসের আবার আপসোস চামেলী? রাবড়ি খাকে দেখো। মালাই খাও।

ও বাত নেহি বাবুজি। মাজি কভি অ্যায়সান দুকান মে নেহি আয়ি —

রজত ঠিক বুঝে উঠতে পারল না — কার কথা বলছে চামেলী।

চামেলী নিজেই ফের বলল, জেন্দাহামে কাঁহা অ্যায়সান চকাচক দুকান মিলি বাবুজি।

ওঃ। — বলে চুপ করে গেল রজত। শাশুড়ি মোতিয়া দুসাদকে মনে পড়ছে চামেলীর।

মনে পড়ছে দিনভর দুধ জ্বাল দিয়ে দই বানাবার হাড় কালি করা খাটুনির কথা। তারপর তো দই বেচতে বেরত মোতিয়া।

রাবড়ি ভাল লাগল চামেলীর। দোকানের আলোয় রঙিন চুড়ির গোছার ভেতর চামেলীর সুডৌল হাত দু'খানি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। চামেলী বলল, আপ নেহি খায়েগা বাবুজি?রাবড়ি তো আচ্ছা চিজ —

নেহি চামেলী। উসমে শক্কর জাস্তি হ্যায়। ও কেয়া?

খুন মে চিনি হ্যায় — সহজ করেই বলল রজত।

খুন মে চিনি? বলে হো হো করে হেসে উঠল চামেলী। ও ক্যায়সে হো সকতা বাবুজি? খুনমে তো নিমক হোতা।

রজত বুঝল, কখনও হাত কেটে গেলে চামেলী হয়ত চুষে রক্ত বন্ধ করেছে। তখন রক্ত নোনতা লেগে থাকবে মেয়েটার।

রজতকে চুপ করে থাকতে দেখে চামেলী বলল, ম্যায়নে পরখ করকে দেখি — যাঁচ কিয়া — খুনমে তো নিমক লাগি —

নেহি চামেলী। কাচ্চি উমরমে খুনমে নিমক লাগতি —

এ যেন কত বড় হাসির কথা। হাসি হাসি মুখে চামেলী তার কথার পিঠে কথা জুড়ে দিল আউর বুঢ়াপা মে ও নিমক শক্কর বরাবর লাগতি?

হাঁ চামেলী। পাক্কি উমর কি এ বিমারিকা নাম ব্লাড সুগার।

কচুরি এল। কিছুটা হালুয়া। কিন্তু চামেলী কিছুই খাচ্ছে না। সে নাড়েচাড়ে আর পথের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। সামনে যে রজতের মত জলজ্যান্ত একটা মানুষ বসে — সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই চামেলীর। জয়শঙ্কর হালোয়াই দোকান থেকে বেরিয়ে অটোতে বসতে বসতে রজত মনে মনে নিজেকে বলল, এই বয়সের চামেলীর আমি কিছুতেই আগাগোড়া সঙ্গী হতে পারি না। আমি ওকে ভালবাসতে পারি। ওর বাপ বরাবর হয়ে বিপদ আপদ থেকে ওকে আড়াল করে রাখতে পারি — কিন্তু কিছুতেই — শুধু এই স্নেহ দিয়ে ওর সমান সমান জুড়িদার সঙ্গী হতে পারি না।

আসানসোল থেকে অটো বেরিয়ে আসছে। আলো, দোকানপাট, মাইকে ফিল্মি গান, — খাবারের দোকানের সামনে জবরদস্ত সিদ্ধিখোর সব মানুষজনের পানের খিলি হাতে হই-হল্লা, রঙবাজি — সবই অটোর দু'পাশে পিছলে পেছনে পড়ে যাচ্ছে। অটোতে বসে বাপ য্যায়সা রজতের গায়ে আদুরে মেয়ের মতই ঠেসান দিয়ে বসে চামেলীর প্রথম মনে হল — আমি সুখের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। সুখ পড়ে থাকল এই আসানসুলে। এখন নিয়ামতপুরের রাস্তায় বাঁয়ে যেই বাঁক নেবে অটো — অমনি দুঃখ হাজারো চেহারা নিয়ে হাজির হবে।

হঠাৎ চামেলী খুব আস্তে জানতে চাইল, হামলোগ য়ঁহা কিঁউ আয়ি?

এই প্রশ্নে চমকে গেল রজত। তাহলে কি চামেলী একা একা সব কিছুর হিসেব করে মনে মনে?

নিষ্পাপ গলায় রজত বলল, য়ুঁহি — কুছ খাস কাম নেহি থা —

তবভি?

অ্যায়সাহি। দিল ব্যাহলানেকে লিয়ে —

কিসকা দিল বাবুজি?

তেরি বিটিয়ারানী। তেরি —

চামেলী একদম চুপ করে গেল। রাত হয়ে গেছে। বড় রাস্তায় লরির পর লরি। মাঝে একটা ধাবা পড়ল। সেখানে চারপাই জুড়ে লং রুটের ড্রাইভার-খালাসিদের আয়েসি আড্ডা।

তার পরেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দু'পাশে খনির নাবি আর গড়ানে ঢাল। দু'জনে কোনও কথা নেই। আবার কখন টিপটিপ করে বৃষ্টি। অটোর ভেতরে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। অটোটা যেন একদম অচেনা দুনিয়ার ভেতর দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া খনি। সেখানে লোকজন। কোয়ার্টারের আভাস। ধাওড়ার সরু চিলতে রাস্তায় নিভু-নিভু স্ট্রিটলাইট।

এক বাত পুঁছু চামেলী —

কোনও কথা না বলে চামেলী রজতের দিকে ফিরে তাকাল। এখানে মুখ দেখতে পাওয়ার মত আলো নেই।

পুছিয়ে —

ফৌজদার পাসোয়ান ক্যায়সা আদমি?

আচ্ছাই হ্যায়।

কৌন কৌন হ্যায় উসকা ঘরমে?

ইয়ে তো ম্যায়নে কহে নেহি সাকতি। মা তো হ্যায় জরুর। হর মাহিনা মনিঅর্ডার করকে রুপেয়া ভেজতা —

আউর কোই?

ম্যায় তো না জানতি।

তো উসকা সাথ ইয়ে ক্যায়সা দোস্তালি বনাকে রাখ্‌খা। ফৌজদার কেয়া শাদি-সুদা হো?

হাঁ। শাদি তো হুয়া।

তব্‌?

তব কেয়া বার্বুজি?

তুমহে তো ম্যায় পহেলি-ই বোলা থা — দেখো ইয়ে আদমি অচানক নিরসা আয়া — অচানকই চলা যায়েগা।

তো কেয়া? যায়ে গা!

একটু অবাকই হল রজত। মনে মনে বলল, ফৌজদার চলে গেলে তোমার মন খারাপ হবে না? মুখে কিন্তু রজত জানতে চাইল, উসকা বিবি কাঁহা হ্যায়?

আপনে বাপকা পাস। য়ঁহাহি রহতি হ্যায়।

অ্যায়সা কিঁউ?

ফৌজদারকা বিবি পাগল ভি — আউর গুঙ্গি ভি।

উফ্‌! — বলে যেন একটা হাফ ছেড়ে বাঁচল রজত পালিত।

নিরসা চটির চৌরাহায় ভাড়া বুঝে নিয়ে অটো চলে গেল। পকেট থেকে অটোওয়ালাকে দিলখুশি পয়সা দিয়ে রজত চামেলীকে নিয়ে ন'নম্বরের দিকে পা চালাল। তখনও ওরা জানে না — কোয়ার্টারের সামনে একটি অ্যামবাসাডর এসে সন্ধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে।

ন'নম্বরে যেতে হলে পায়ে-চলা পিচ-ঢালা চিলতে পথেরও তিনটে বাঁক পার হতে হয়। গাছপালা, রান্নার ধোঁয়া, বাচ্চা ছেলের বায়না ধরে কেঁদে ওঠা, বিবিধ ভারতীর জয়মালার গান — এইসব মিলিয়েই তো আকাশের নিচে একটা ডাঙা জায়গা বসতি হয়ে ওঠে। তখন খনিতে কাজ করতে আসা বাংলা-বিহারের দেহাতি মানুষের ভাষায় জায়গাটা — বসেরা বন্ গয়া। তার মানে মানুষ এসে দিব্যি বসে গেছে। একটা আশ্রয় গড়ে উঠেছে। যেখানে মানুষ স্বচ্ছন্দে মাথা গুঁজতে পারে। পা চালিয়ে চামেলীকে নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরতে ফিরতে খুবই স্বচ্ছন্দ লাগছে রজতের। যেন এখানেই রজতের মেয়ে চামেলী জন্মেছে। বড় হয়েছে। এটাই তাদের বসেরা।

কোয়ার্টারের সামনে এসে দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সরু চিলতে পথটা জুড়ে একটা অ্যামবাসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভূতের মত। অন্ধকারে। সাদা বলেই ফুটে উঠেছে। স্টিয়ারিংয়ে বসে ড্রাইভার সিগারেট ফুঁকছে। তাই গাড়ির ভেতরকার অন্ধকারে শুধু একটা আগুনের ফুটকি।

কী ব্যাপার? রজতের প্রথমেই মনে হল — জেন্দাহায় মোতিয়ার কিছু হয়নি তো? হলে, এভাবে গাড়ি করে কি চলে আসবে? তা তো হবার নয়। তাহলে?

চামেলী রীতিমত ভয় পেয়ে বলে উঠল, নিয়ামতপুর কোতোয়ালিসে হাবলদার সাব আয়া কেয়া?

কিঁউ আয়েগা হাবলদার? হামনে তো কো-ই গলতি নেহি কিয়া — তব?

একদম কোয়ার্টারের সামনে এসে দু'জনেই চমকে উঠল। দু'জন — দু'রকমভাবে।

ঢাকা বারান্দা এখন প্রায় অন্ধকার। সেখানে বাবুজি যে চারপাইতে রাতে শোয় — দিনে বসে — একটা কম্বল বিছিয়ে — সে কম্বলের ওপর খুবসুরতি এক আওরত বসে। কবজিতে ঘড়ি। হাতে বটুয়া। পায়েরমে জুতি। ডান দিকে এক নওজওয়ান। ও ভি খুবসুরত। উসকা পায়ের মে বুট। দু'জনই চামেলীর বাবুজিকে দেখে পটাং করে উঠে দাঁড়াল। চামেলী মনে মনে বলল, ওঃ! বাবুজির জানপহেচান —

তোমার? কী ব্যাপার?

আমি তোমার মেয়ে ইরা। আমি আসব না? তোমার জামাই কিছুতেই আসতে চায়নি। আমি জোর করে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি —

ইরার এ কথায় চামেলী প্রায় লাফিয়ে উঠল। বাবুজি? আপকা বেটি? আপকা দামাদ?

এ কথায় রজত কোনও জবাব দেবার সুযোগই পেল না। ইরা তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চামেলীর দিকে ফিরেও তাকাল না। আর অভিষেক? সে সামনের অন্ধকার রাতকে একটা ছবি মনে করে সেদিকে তাকিয়ে আছে। যেন ওই অন্ধকারে সে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। চামেলী ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ঘরের — বারান্দার আলো জ্বেলে দিল। তারপর সরাই থেকে দু'গ্লাস জল গড়িয়ে এনে দু'হাতে দু'জনের সামনে ধরল।

অভিষেক গ্লাসটা নিয়ে এক দমে সবটা জল খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিল চামেলীর হাতে। ইরা তার বাবার মুখে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে মাথা নেড়েই চামেলীকে জানিয়ে দিল — এখন সে জল খাবে না।

চামেলী তখন সেই জলের গ্লাসটা নিয়ে গাড়ির কাছে গেল। ড্রাইবর সাব। পিয়াসা লাগে —

চামেলী জানে, ড্রাইবর সাব জরুর আসানসুল স্টেশনকা কিরায়াওয়ালা গাড়িকা ড্রাইবর।

লোকটিরও পিপাসা পেয়েছিল। সে ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিলে চামেলী রসুই নিয়ে পড়ল। রুটি আর অন্তত পক্ষে একটা সবজি বানাতেই হবে। সে আর বাবুজি তো বাইরে খেয়ে ফিরেছে। মগর ইনলোগোকো তো জরুর ভুখ লাগা। কলকাত্তাসে লম্বা সফর করকে ইতনা দূর আয়া। মুঙগ্ দাল বানানা পড়ে গা —

রজত বলল, অভিষেককে সঙ্গে করে এনেছ — সে তুমি ভাল করেছ। এ তো আর কলকাতা নয়। সঙ্গে একজন থাকা ভাল।

যেন স্বাভাবিক কথাবার্তা হচ্ছে। কথার এমনই চাল। সেই চালে গলা মিলিয়ে ইরা বলল, কলকাতাই বা এমনকি সেফ বাবা? এমনভাবেই ইরা কথা বলছে — যা শুনে অভিষেক তো অবাক। যেন তার শ্বশুরমশাই এ ক'মাস উধাও হননি। ইরার সঙ্গে তিনি নিজের ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে যেন কথা বলছেন। কলকাতার অবস্থা নিয়ে।

এ কথার পিঠে আর কোনও কথা বলল না রজত। সে ঘরে ঢুকে গিয়ে দেওয়ালে বসানো পেরেকের মাথায় গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে টানিয়ে দিল। দিয়ে তাল পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে ঠাণ্ডা হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবই দেখতে পাচ্ছে ইরা। উবু হয়ে বসে আটা মাখছে মেয়েটি। এই তাহলে সেই বিখ্যাত চামেলী। যার টানে আমার বাবা এখানে বাবা হয়ে আছে। 'এখন'-এর ফটোগ্রাফার বিশুবাবুর মুখে সবকিছু শুনেছে। ইরা।

চামেলী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের পাখাটা সুইচ টিপে ছেড়ে দিয়ে তার বাবার হাত থেকে তাল পাখাটা কেড়ে নিল। নিয়ে বলল, কিঁউ বেকার পরেশান হোতা হায় বাবুজি? মাথে পর সরকারি বিজলি পংখা তো হ্যায় হি —

ওঃ! বলে চমকে উঠল রজত।

আপকা বেটি — দামাদ আয়ে হ্যায়। আচ্ছে আচ্ছে কো-ই খানে কা চিজ ইন্তেজাম কিজিয়ে বাবুজি —

চামেলী চাপা গলায় কথা বললেও সবই শোনা যাচ্ছে এটুকু জায়গায়।

এখন কোথায় আচ্ছে আচ্ছে খাবার মিলবে? ইতনি রাত হো চুকি।

তো ঘর মে যো কুছ হ্যায় ওহি পাকাতি বাবুজি —

রজত কিছু বলল না। সে হেঁটে বারান্দায় আসছে। চামেলীর সবকিছুই বাড়াবাড়ি লাগছে ইরার। তুই কে রে আমাদের? আমার বাবাকেই বা অত বাবুজি বাবুজি বলে ডাকা কেন? দু'হাত ভর্তি রঙচঙে চুড়ি। আমার বাবার সঙ্গে বাইরে থেকে ঘুরে এসে রঙিন লেডিজ ছাতাটা বারান্দায় এমনভাবেই মেলে দিয়েছে যে হাঁটতে গেলে — নড়তে গেলেই ভিজে ছাতা গায়ে — কাপড়ে চোপড়ে লেগে যাবে। ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে। ভূত কোথাকার।

রজত বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই এবার নিজের বাবাকে সবটা দেখতে পেল ইরা। খালি গা। খালি পা। একগাল কাঁচাপাকা দাড়ি। পরনে মালকোঁচা দেওয়া শত ময়লা একখানি ধুতি গরমের চোটে তার বাবা কোমরে গুঁজে রেখেছে।

এ কী চেহারা করেছ বাবা?

কেন? বেশ তো আছি।

কাঁচাপাকা দাড়িগুলো কাল সকালেই নাপি ডেকে কেটে ফেলবে।

রজত কোনও জবাব দিল না। সে চারপাইয়ের মুখোমুখি সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় বসেছে। ইরা এসে তার পিঠে হাত রাখল। খুব রোগা হয়ে গ্যাছো বাবা —

অভিষেক কোনও কথা বলল না। সে একজন মেয়েকে তার বাবার পিঠে হাত রাখতে দেখল — ঘরের ভেতর থেকে আটা মাখতে মাখতে চামেলী দেখল বাবুজির পিঠে তার মেয়ে হাত রেখেছে। কেন যে এমন হল সে বুঝতে পারছে না। চামেলীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

চামেলী যেখানটায় বসে টুকটাক কাজ করছে — তার সামনাসামনি ঘরের খোলা দরজা বরাবর রজত বসে। সে দেখল, কাজ বন্ধ করে চামেলী তার আর ইরার দিকে তাকিয়ে। ঠোঁট বুঝি কাঁপলো মেয়েটার। এই বুঝি চোখে জল আসে।

তোমরা যে আসবে তা তো জানতাম না। তাই যা হবে তাই খেতে হবে তোমাদের। অসুবিধে হলেও কিছু করার নেই ইরা।

আমারা এখানে খেতে আসিনি বাবা। আমরা এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে —

কোথায়?

কলকাতায়। আমাদের কাছে।

কে নো-ও-ও?

সেখানটাই তো তোমার জায়গা বাবা। কলকাতায় তুমি আমাদের কাছে — আমাদের মধ্যে গিয়ে থাকবে বাবা।

কার কাছে?

আমার কাছে। মায়ের কাছে — মানে তোমার বাড়িতে। সে তো তোমারই জায়গা বাবা। তোমারই সংসার। মা আর তুমি। শঙ্কু আর চিনিকে নিয়ে সেখানে তোমার কাছে মাঝে মাঝে যাব — যেমন যেতাম — গিয়ে থাকবও ক'দিন।

আমি ওখানে গিয়ে না থাকলে কি তোমার অসুবিধে হয়?

খুব। খুব খারাপ লাগে বাবা।

কি অসুবিধে ইরা?

যেন কি নেই — কি নেই মনে হয়।

কেন? তোমার তো অভিষেক আছে। শঙ্কু চিনি আছে। তোমার মা আছে। এতকাল তো এইভাবেই চলে এসেছে তোমার।

তবু তুমি তো নেই বাবা।

কেন? আমি তো নিরসায় এই পৃথিবীতেই আছি। তোমার তো জগৎজননী আছেন। রুক্মিণী মা আছেন।

তখন তখনই কিছু বলতে পারল না ইরা। একটু থমকে গিয়ে বলল, আমাদের ওখানে নেই — মানে কলকাতায় নেই — এটা আমি ভুলতে পারি না কিছুতেই।

রজত ভাল করে নিজের মেয়ের মুখে তাকাল। ইরা এখন স্কুলে পড়া ছেলেমেয়ের মা। ওরা স্কুল থেকে ফিরলে ওদের পছন্দসই টিফিন — এটা ওটা বানিয়ে দেয়। এটাই স্বাভাবিক। যাকে বলা যায় ঘোর সংসারি — মানে নিজের ছেলেমেয়ে — স্বামীকে নিয়ে জড়িয়ে আছে

পুরোদস্তুর।

তোমার বিয়ে হল কতদিন?

অবাক হল ইরা। বলল, তা পনের-ষোল বছর।

তোমার ইচ্ছেতেই এখনকার তুলনায় বেশ কম বয়সেই — তোমার পড়াশোনা শেষ হবার আগেই তুমি আর অভিষেক ভালবেসে বিয়ে করেছিলে।

হ্যাঁ বাবা।

আমি চেয়েছিলাম — তুমি পড়াশোনা শেষ করে তারপর বিয়ে কর।

সেই পুরনো কথা বাবা!

আমারও একটা কথা থাকতে পারে ইরা। তুমি সুখী হয়েছো — তাতেই আমি খুশি। কিন্তু এই এতগুলো বছর হল তুমি বিয়ে হয়ে চলে গ্যাছো। বাবা হিসেবে আমার মেয়েকে আমি কতখানি পেয়েছি?

সুখে — আনন্দে ইরা একগাল হেসে ফেলল। বলল, সেজন্যেই তো তোমাকে নিয়ে যেত এসেছি বাবা।

এ কথায় কান না দিয়ে নিজের কথা বলতে থাকল রজত। আমি দিনের পর দিন তোমার বিয়ের পর ছুটে গেছি তোমাকে দেখতে। তোমার ছেলেবেলায় তোমায় সাইকেল রিকশায় বসিয়ে ঘুরতাম — পাশে নিয়ে। তুমিই ছিলে আমার পৃথিবী। তুমি যা চাইতে কিনে দিতাম। তুমি বিয়ে করতে চাইলে — বিয়ে করলে। বিয়ে করে চলে গেলে! সেটাই নরমাল। কিন্তু ক'বার তুমি আমাকে দেখতে এসেছ? তোমার জন্যে আমার যে টান — সেই টান কি আমার জন্যে তোমার কোনওদিন ছিল?

বাঃ! টান না থাকলে এই ক'মাস সবসময় বাবা তোমার জন্যে ভাবি? এতদূর ছুটে আসি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?

অভিষেক যেন কী বলতে চাইল। পারল না। তার আগেই রজত বলল, তুমি যা কর — করেছ — তা হল বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরা অভ্যেস বশে যা করে তাই। তার বাইরে কিছু নয়।

আমি তোমায় ভালবাসি বাবা।

আমারও ওরকম মনে হত ইরা। এখন তোমরা আমাকে তোমাদের দেখা অভ্যেসের জায়গায় বসিয়ে দিতে চাইছ। তোমার মায়ের পাশে আমি। এইসব তোমরা দেখতে ভালবাস। না দেখলে অস্বস্তি হয়।

এর ভেতর চামেলী গরম গরম রুটি আর ভাজি প্লেটে করে নিয়ে এসে হাজির। খা লিজিয়ে দিদিজি। খাইয়ে জামাইবাবু — তার হাত থেকে ইরা বা অভিষেক কেউই প্লেট নামিয়ে নিচ্ছে না দেখে রজত হাত বাড়িয়ে প্লেট দু'খানি ধরল। রজতকে ধরতে দেখে অভিষেক ইরা দু'জনই হাত বাড়িয়ে প্লেট নিল।

ইরা বলল, তুমি খাবে না বাবা?

না। আমি আর চামেলী আজ বাইরে অনেক খেয়েছি।

ইরা বা অভিষেক কিছু খেল না। তারা দু'জনেই চার পাইয়ের পায়ার কাছে যার যার প্লেট নামিয়ে রাখল। তার বাবার মুখে চামেলীকে নিয়ে বাইরে খাবার খেয়ে আসার কথা শুনে ইরার চোয়াল যেন শক্ত হয়ে উঠল।

কথা বলতে বলতে ইরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে ধপ করে বসে পড়ল। নিজের বাবাকে তার এতদিন পরে ভীষণ কঠিন লাগল। বাবার কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই — যেখান থেকে ইরা জল হয়ে গড়িয়ে ঢুকে পড়তে পারে।

তুমি যাবে না বাবা?

যে অভ্যেস থেকে আমি একবার সরে আসতে পেরেছি — সেখানে আর ফিরে যাব না ইরা।

অভ্যেস থেকে আমি একবার সরে আসতে পেরেছি — সেখানে আর ফিরে যাব না ইরা।

অভ্যেস বলছ কেন বাবা?— ইরার গলায় কান্না এসে হানা দিল। সে তবু নিজের চোখ ভিজতে দিল না।

একা একা ভেবে দ্যাখো তুমি।

ইরা তার বাবাকে চেনে। এ বড় কঠিন ঠাঁই।

কিছু বলতে পারছে না।

চলে যেতেও পারছে না। ভেবেই এসেছে — বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাবে।

ঠিক এই সময় দু'বাটি ডাল এনে ঠক করে মেঝেতে নামিয়ে দিল চামেলী। দিয়ে বলল, দিদিজি। বাঁতো বাঁতোমে খানাহি ভুল গয়ি।

খাব না। বলে উঠে দাঁড়াল ইরা।

চামেলী এগিয়ে এসে ইরার হাত ধরল। এ দিদিজি কিঁউ খাঁফা হোতি? নেহি খাকে মৎ যাইয়ো। এ জমাইবাবু। ইতনি রাত মে কাঁহা যাওগে?

ইরা বা অভিষেক — কেউই চামেলীর দিকে তাকাল না। রজত বুঝল, চামেলী বুঝতেও পারছে না — সে ইরা তো বটেই — অভিষেকের চোখেও কতখানি বিরক্তিকর। অথচ সেই চামেলীই ওদের দু'জনকে খাওয়াতে চাইছে — বসাতে চাইছে — এত রাতে রাগে রাগে বেরিয়ে গিয়ে ওরা দু'জন যাতে কোনও অসুবিধেয় না পড়ে — তাও চাইছে চামেলী।

চামেলীর জন্যে খুব মায়া হল রজতের। কাদের ও হাত ধরে সাধছে? খেতে বলছে? চামেলীর চোখে ওরা বাবুজির মেয়ে জামাই। কোথায় কলকাতা! আর কোথায় নিরসা খনির দফতরে চাকরির সুবাদে এই কোয়ার্টার!

সন্ধ্যেরাত পেরিয়ে গিয়ে চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আওয়াজ আর আলো যা-কিছু — সবই আসছে আশপাশের কোয়ার্টারগুলো থেকে।

রজত ডাকল, চামেলী —

বাবুজি —

কিঁউ বে-ফয়দা পরেশান হোতি —

এ ক্যায়সা বাত বোল রহে আপ? ইতনে দূর আয়া — ভুখ নেহি লাগেগা?

রহনে দেও।

ক্যায়সে বাবুজি? আধিরাতমে দিদিজি কাঁহা যায়েগি?

যেতে তো বলিনি। গাড়ি ছেড়ে দাও ইরা। এই রাতে কোথায় যাবে অভিষেক। থেকে যাও।

আমরা থাকতে আসিনি বাবা। তুমিও চল আমাদের সঙ্গে। আসানসোলে গিয়ে কোনও হোটেলে থাকব রাতটা। কাল সকালের ট্রেনেই কলকাতা — বলে ইরা এসে রজতের ডান হাতখানি ধরল। দু'হাতে।

অভিষেক বলল, তাই চলুন। সেটাই ভাল হবে।

হাত ছাড়িয়ে নিল না রজত। শুধু বলল, তা আর হয় না। তোমরা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও। অনেকটা এসেছ — খুব ধকল গেছে নিশ্চয়।

রজতের সব কথা শুনতে পায়নি চামেলী। সে ঘরে ঢুকেছিল নতুন করে দু'গ্লাস জল গড়িয়ে আনতে। দেবে দিদিজি আর জামাইবাবুকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে রজতের কথার শেষটা চামেলীর কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, বহুত থাকা হুয়া। হাঁ। আরাম কিজিয়ে। খানা খাকে লেট যাইয়ে। ম্যায়নে বিস্তারা বানা দেতি — চামেলীর এ কথায় ইরা ভাবল, মেয়েটাও বুঝি তার বাবার কথাই রিপিট করছে। তার মানে — থেকে যেতে বলছে ইরাদের। যার মানে রজত পালিত আর কলকাতায় ফিরছে না।

ইরার মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠল দপ করে। এই মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। আমার নিজের বাবাকে বাপ ডেকে বশ করে রেখেছে। কথায় কথায় বাবুজি — বাবুজি! ন্যাকা।

ফস করে বলে ইরা, আমার বাবা আমার। তাকে অ্যাতো বাবুজি! বাবুজি! করা কীসের?

কোয়ার্টারে একশ পাওয়ারের ডুম জ্বলে। সেই আলোতে চামেলীর মুখে ইরার কথাগুলো পলকে কালি মেরে দিল।

ফের যদি বাবাকে বাবুজি বলে ডাকো —

চামেলী ছলছল চোখে কোনওমতে বলতে পারল, সো তো সহি বাত দিদিজি — ম্যায় তো উনকা বেটি নেহি — সো তো ম্যায়নে বরাবর জানতি — কভি না ভুলি —

সে কথা তো খেয়ালই থাকে না —

রজত জানে, পূর্ণিয়ায় থাকতে চামেলীর সহেলিরা ছিল বাঙ্গালিন। ভাল না বলতে পারলেও বাংলাটা পুরোই বোঝে।

রজত আর চুপ করে থাকতে পারল না। একদিকে নিজের মেয়ে। আরেকদিকে মেয়ের মত। সে কোনওদিকেই খুব পরিষ্কারভাবে ঝুঁকতে পারছিল না। কথা বলতে বলতে চামেলী মাথা নুইয়ে ফেলেছে। মেয়েটাকে এ ক'মাসে ভাল করেই চেনে রজত। ওর রাগ, আনন্দ, দুঃখ, আহ্লাদ, অপমান কোন্ পথ দিয়ে বয়ে যায় — তা ভাল করেই জানে রজত। সে এগিয়ে গিয়ে চামেলীকে ধরল। চামেলী দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। রজত কাছে এসে পড়াতে আপনাআপনিই তার বুকে মাথা রাখল চামেলী।

নেহি নেহি চামেলী। তুম ভি মেরে বেটি — রো মৎ। রো মৎ বিটিয়ারানী —

এ কথায় ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে ইরা বারান্দা থেকে একদম রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে অভিষেককে ডাকল, চলে এসো। তাড়াতাড়ি আসানসোল পৌঁছতে পারলে হয়ত কলকাতার গাড়ি পেয়ে যেতে পারি। এসো —

অভিষেক ভাবতে পারেনি নাটকটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। সে নিমরাজি গলায় বলল, এখন ট্রেন পেলে সে ট্রেন কিন্তু টিকিটিকি এগবে সব স্টেশনে থামতে থামতে সারা রাত ধরে।

চলই না — না হয় হোটেলেই একটা রাত কাটবে।

সবকিছুর জন্যে নিজেকে বড় দোষী দোষী লাগছে চামেলীর। সে হাত তুলে ডাকতে গেল, দিদিজি। মৎ যাইয়ে —

ড্রাইভার স্টার্ট দিল। রজতকে সরিয়ে দিয়ে চামেলী অন্ধকারে নেমে পড়ল। আপকি আপনা বাবুজিকো তব সঙ্গ সঙ্গ লে যাইয়ে — ইনকো লে কর ম্যায় ক্যা করি দিদিজি? এ তো সির্ফ আপহি কি বাবুজি —

রজত চেঁচিয়ে বলল, ইরা —

গাড়িতে উঠতে গিয়ে ইরা ঘুরে দাঁড়াল।

তোমার রুক্মিণী মা বারণ করলে তুমি এভাবে না খেয়ে এমন অন্ধকার রাতে চলে যেতে পারতে? তার অনুরোধ রাখতে না?

তিনি জগন্মাতা বাবা —

আমি জগৎ-পিতা নই। কিন্তু তোমার বাবা।

ও কথা থাক বাবা। তোমার তো আরও মেয়ে আছে — বলেই ইরা দরজা খুলে গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসে পড়ল।

ভাড়ার গাড়ির ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

তবু শেষবারের মত চামেলী ডাকল, দিদিজি —

ইরা ফিরেও তাকাল না। গাড়ির পেছনের আলো গাড়ি বাঁক নিতেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

সারা বিকেল — সন্ধ্যেজুড়ে এত ঘোরাঘুরি, আনন্দের পর এমন একটা বিপদ যে ওত পেতে ছিল — চামেলী বা রজত কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। অন্ধকার থেকে বারন্দার আলোতে উঠে এল চামেলী। তারই বানানো রোটি, ভাজি, দাল ও গ্লাসভরা জল মেঝেতে পড়ে আছে। তার কয়েক হাত দূরেই উঠোনে বৃষ্টিভেজা ঘাসের সবুজ ডগায় ইলেকট্রিকের আলো। বারন্দা থেকে প্লেটগুলো ঘরে নিয়ে তুলতে তুলতে চামেলী বলল, এ সহি কাম নেহি হুয়া বাবুজি —

কৌন কাম? কিঁউ চামেলী?

সির্ফ মেরি ওয়াস্তে দিদিজি — জমাইবাবু চলা গ্যয়ে —

যানে দোও চামেলী।

ইয়ে ক্যায়সা বাত বাতা রহে বাবুজি? দিদিজি — আপকা আপনা বেটি।

তুম চামেলী মেরা কোই নেহি? কেয়া তুম পরায়া হো?

এবার চামেলী কোনও কথা বলতে পারল না।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল চামেলীর। উঠে দেখে রজত তারও আগে উঠেছে। উঠে চারপাইয়ের ওপর বসে পুরনো কোদালটার বাঁটে কোদালখানা লাগসই করে লাগাবার চেষ্টা করছে।

চামেলীকে দেখে রজত বলল, ভিন্ডিকা দানা নিয়ামতপুরসে মাঙানা পড়েগা। উসকা পহলে মিট্টি বানানা হোগা।

রজতকে আশ্চর্য করে দিয়ে চামেলী বাংলায় বলল, কী হোবে লাগিয়ে?

কেন? ঢ্যাঁড়শের ভাজি বানাবে। রোটির সঙ্গে খাব।

চামেলী কোনও জবাব দিল না। ভোর বেলাতেই নিরসা এখন আগের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। কয়েকদিনের ভেতরেই খনি খুলে যাবে। বারান্দায় বসেই দেখা যায় — খনির নতুন পাক্কি দফতরের দিকে গাড়ি যাচ্ছে ঘন ঘন। ফিরেও আসছে। কোয়ার্টারগুলো আর খালি নেই। সে সব ঘরের বারন্দায় বারন্দায় ভিজে শাড়ি মেলা। কোদাল ঠিক করে নিয়ে রজত জেন্দাহায়

যেমন করেছিল — তেমনি কোয়ার্টারের সামনের মাটি কোপাতে শুরু করে দিল। খানিকক্ষণ কুপিয়ে থেমে পড়ল রজত। দমে কুলোয় না। তাছাড়া সে অবাকও হয়েছে। এ সব কাজে চামেলীর সব সময় খুব উৎসাহ থাকে। সে তো আমাকে কোপাতে দেখে বারন্দায় বেরিয়ে এল না। আরও আশ্চর্য হল রজত — যখন তার সামনে দিয়ে স্যান্ডেল পায়ে বারন্দায় নেমে এল। কোথায় যেন যাবে।

দফতরে যাবে না আজ?

যায়েগি। আভি লওট আয়েঙ্গি।

কোথায় যাচ্ছো?

ঘুরে দাঁড়াল চামেলী। আপ মেরি কৌন হোতা?

চমকে গেল রজত। এ কথা বলছ কেন?

আপকা আপনা বেটি চলে গয়ি। আপ কিঁউ য়ঁহা পড়ে রহে —?

কি বলতে চায় চামেলী রজত তা ধরতে পারছে না।

বাবুজি? আপ তো আসলমে কলকাত্তা রহনেওয়ালা এক বাবু।

তো কেয়া? আমি তো কোনও লুকোছাপা করিনি চামেলী। গোড়া থেকেই তো সব জানো। তুমিও আমার এক মেয়ে।

সো তো জানে। মগর এ তো নেহি জানতি — চামেলী দুসাদ ক্যায়সে এক বঙ্গালিবাবুকা বিটিয়া বনে! কভি বন সাকতে?

রজত ঠিক বুঝতে পারল না — চামেলীর মুখে এ সব কথা রাগ থেকে এল? না, দুঃখ থেকে? সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই চামেলী হন হন করে বেরিয়ে গেল। সেদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল রজত।

সকালবেলাই এমন মেঘলা আকাশের নিচে নিরসা খনি আর তার কোয়ার্টার মহল্লা যা-কিছু দেখতে খারাপ — তা সবই নরম আলোয় মনোহর করে তুলেছে যেন। তের নম্বর ধাওড়ায় ঢুকতেই একটা মরা সজনে গাছের বাজ পড়ে জ্বলে যাওয়া মাথাটা এখন মেঘে ঢাকা রোদ্দুরে বেশ ভালই লাগল চামেলীর চোখে।

ফৌজদার গুঁড়ো সাবান গুলে বালতির জলে তার ফতুয়া, কুর্তা সব ডোবাচ্ছিল। চামেলীকে দেখে তাড়াতাড়ি বালতিটা সরাতে গেল।

চামেলী উঠোনে ঢুকে পড়ে বলল, রহনে দেও। ইসমে কোই হেরাফেরি নেহি হোতি। পেয়ার মহব্বত কেয়া ছুট যায়েগি?

তবুও ফৌজদার সেটা উঠোন থেকে কোয়ার্টারের ছোট্ট মত চানঘরে সরিয়ে ফেলল। ফেলে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, য়ঁহা আকে বৈঠো। পাংখা ছোড় দেতা।

ঘরে হাওয়ার নিচে তক্তপোশে বসতে বসতে চামেলী বলল, রামটহলভি হপ্তা হপ্তা মে বালটি ভরকে আপনা কাপড়াউপড়া কাচতে থে —

ছোড়ো উনকা বাত। যো গ্যয়ে সো গ্যয়ে। — বলতে বলতে নিচু হয়ে ভীষণ জোরে অনেকক্ষণ ধরে চামেলীর ঠোঁটে চুমু খেল।

ছোড়ো। ছোড়ো। — বলতে বলতে ফৌজদারকে সে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। কেয়া ম্যায়নে ইনসান নেহি? ইতনা জোরসে তুম মুঝে পাকড়া —

খুব লজ্জা পেল ফৌজদার। বুঝল, বেশি জোরে সে চামেলীকে চুমু খেয়ে ফেলেছে। তুমহে

দেখ কর সব গড়বড় হো যাতা চামেলী —

অ্যায়সা? কিঁউ? ম্যায় তো বহুত মামুলি সা এক আওরত হুঁ — মুখে এ কথা বললেও মনে মনে বেশ খুশি হয়েছে চামেলী। তার বুকের ভেতরে ফৌজদার পাসোয়ানের চৌদ্দ নম্বর হাম্বর হাতুড়ি পড়ছে। দমাস! দমাস! সেই হাতুড়িটাও ঘরের কোণে দাঁড় করানো আছে — দেখতে পেল চামেলী। ওটা দিয়েই ছিঁড়ে যাওয়া কনভেয়র বেল্টিংয়ে ইস্পাতের পিন বসিয়ে হাম্বর পিটিয়ে ফৌজদার মেরামতি করে। ফৌজদার আমার বুকের ভেতরে এই বয়সেই সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। তুম ডাহিনা হাতমে ইস্পাতি পিন লে কর মেরি সিনাপে সিধা বৈঠা দো — হাম্বরসে মার মারকে মেরামতি করো। সির্ফ তুমহি ইস কাম কি কাবিল হো। সির্ফ তুমহি ফৌজদার। একটা চিনচিনে ব্যথা আনন্দ হয়ে --- আহ্লাদ হয়ে চামেলীর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে মুখটা তুলে ফৌজদারের ভরাট মুখে ঠোঁটের জায়গাটা খুঁজে পেল।

চারদিক দিয়ে লোকজন যায়। সামান্য কয়েকটা উঠোন-শোভা গাছগাছালির আড়াল মাত্র। এ সব সময় ফৌজদারের সে সব কোনও খেয়াল থাকে না। চামেলীই বলল, পাগলপন ছোড়ো ফৌজদার-কেওয়ারি খুলি হ্যায় —

ফৌজদার ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। পটাপট জানলাও বন্ধ করে দিল। খানিকবাদে ওরা যখন কিছুটা ফাঁক ফাঁক হয়ে বসতে পারল — তখন ফৌজদার বলল, চায়ে পিয়োগি?

চায়ে মেরি আতি নেহি। উসরোজ তো তুম দেখা — চায়েকা নাম পর শরবত বনায়ি থি!

নেহি নেহি চামেলী। পিনে মে তো আচ্ছা লাগা।

ঝুট মৎ বোলো ফৌজদার।

তুমহারি সব কুছ মুঝে আচ্ছা লাগতা।

না জানে বাবুজি ক্যায়সে মেরি বনায়ে হুয়ে চায়ে পিতা হ্যায়?

ও দাড়িওয়ালে আউর কব তক তুমহারি পাস ঠ্যায়রে গা?

ছিঃ! উসকি বারে মে ইতনি বুরি বাত বাতানা আচ্ছা নেহি ফৌজদার। বাবুজি এক বহুত আচ্ছা ইনসান। মেরি বাপকা বরাবর —

বরাবর! কামাতা কেয়া?

মেরি ওয়াস্তে সব কুছ ছোড় দিয়া বাবুজি। নোকরি। ঘর। আপনে রিস্তেদারোঁ ভি —

চায়ের জন্যে স্টোভ ধরাতে ধরাতে একটা বিড়িও ধরাল ফৌজদার। বিড়িতে একটান দিয়ে আরামের-তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়ে ফৌজদার জানতে চাইল, উসকো চলতা ক্যায়সে?

ম্যায়নে চালাতি। মুঝে বিটিয়ারানী কহেকে বুলাতা বাবুজি।

ফৌজদার ভাল করে চামেলীর চোখে তাকাল। সেখানে বাবুজির কথা বলতে গিয়ে স্বপ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। এইমাত্র দাড়িওয়ালেকে নিয়ে যা বলেছে ফৌজদার — একদিনে তার চেয়ে বেশি বলতে সাহস হল না তার। চামেলী ইস্টার্ন কোলফিল্ডের নিরসাখনি দপ্তরে নোকরিওয়ালি আওরত। মাস গেলে তংখা পায়। অ্যায়সে জেনানা লাখোমে না মিলি এক। তার ওপর রংদারি, নখরেওয়ালি আওরত চামেলী। ভুলভাল বলে তাকে হারাতে চায় না ফৌজদার।

আনমনা গলায় চামেলী বলল, আজ সবেরে সবেরে কেয়া হো গয়ি মেরি — বাঁতো বাঁতো মে বহুত কঠিনাই বাত আ গয়ি মেরি মু মে —

ফৌজদার পাসোয়ান কোনও কথা না বলে কেটলি নামাল। জল ফুটে গেছে।

২৪

ইদানীং দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে রজত লক্ষ্য করেছে — রাত অব্দি দিব্যি কাজকর্ম করে যেতে পারে। কোনও অসুবিধাই হয় না। অবশ্য কাজ বলতে বিশেষ আর কি! ভোর ভোর হাঁটতে বেরিয়ে ক্যান নিয়ে গিয়ে পওয়া-ভর মোষের দুধ নিয়ে ফেরে রজত। এখানে কয়লার অভাব নেই কোনও। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কিছু রাঁধতে বা গরম করতে হলে অন্তত বোতল দুই কেরোসিন মজুত রাখতে হয় সবসময়। সেটা নজর রাখে রজত। এ দুটো যেন কত বড় কাজ এই সংসারে। মনে মনে এ সব ভেবে একা হেসে ফেলে রজত। নিজেই নিজেকে কারেক্ট করে রজত পালিত। সংসার নয় — জগৎ সংসারে!! এত বড় পৃথিবী। আমার এতখানি বয়স। পর পর দিন আর রাত হয়ে চলেছে। এর ভেতর আমি ভোর ভোর গিয়ে পওয়া-ভর ভৈসাকা দুধ নিয়ে আসি। আর হপ্তায় হপ্তায় বানিয়ার 'দুকান' থেকে মশল্লাপাতি আনার সঙ্গে ব্ল্যাকে দু'বোতল করে কেরোসিন তেল এনে রাখি। এ ছাড়া আমার আর কোনও কাজ নেই?

একা একা হাঁটতে বেরিয়ে দামোদরের এই উপত্যকায় পায়ের নিচে মাটির পাতালে কয়লাকে টের পাওয়া যায় না ঠিকই। কিন্তু আঁকাবাঁকা মাইন রোডের মাথায় দাঁড়িয়ে রজত এক একদিন এখানকার উঁচু নিচু পৃথিবীকে দেখে। আর দেখে দিগন্তকে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায় — দূরে দূরে নানা সাইজের চিমনি। বিকেলের দিকে চামেলী দফতর থেকে ফিরে চায়ে বানায়। কোনওদিন সঙ্গে দেয় এক এক রকমের খাবার। চামেলী যা নতুন দেখে তাই-ই কিনে নিয়ে ফেরে। একদিন তো চায়ের সঙ্গে তাকে কটকটি ভাজা দিল।

রজত বলল, আমি খেতে পারব না। তুমি খাও চামেলী।

কিঁউ বাবুজি? খাকে দেখিয়ে।

না চামেলী। দাঁতে ব্যথা লাগে।

তো কোনসা দাওয়াই লাগে — বোলিয়ে মুঝে বাবুজি। অসপাতালসে লে আয়েগি।

দাঁত দেখিয়ে তবে ওষুধ নিতে হবে।

তো দেখাইয়ে বাবুজি। মেরি নাম পর য়ঁহা আপকা সব কুছ ফ্রি।

কথাটা কিছু ভেবে বলেনি চামেলী। কিন্তু কেন যেন তার ভেতর রজত পালিত আরেকটা অর্থ খুঁজে পেল। রজত বুঝতে পারছে — নোকরি সুবাদে নিজের তো বটেই — চামেলীর ডিপেনডেন্ট হিসেবে রজতেরও সব চিকিৎসা এখানে ফ্রি। ডিপেনডেন্টে, আবার এ কথাও তার মানে হল — আমি চামেলীর হাতে তোলা হয়ে আছি এখানে। রামটহলের সৎকার বাবদে পাওয়া টাকা খরচ খরচার পর তার কাছে যা ছিল — সবটাই সে চামেলীর হাতে তুলে দিয়েছে। নিজের কোনও খরচ নেই রজতের। তবু চামেলী মাঝে মাঝেই তার ফতুয়ার পকেটে দশ বিশ টাকার নোট গুঁজে রেখে দেয়।

রজত বলেছিল, অ্যায়সে মেরা পাকিটমে তুমহারি রুপেয়া কিঁউ রাখতি হো চামেলী?

ইস ঘরকি হর পৈসে আপকা বাবুজি।

রজত কথা বাড়ায়নি। ভেবেছিল, বলবে তোমার কামাই তোমার কাছে রাখ। সেদিন রাতে ইরা আর অভিষেক কলকাতা ফিরে যাওয়ার পরদিন সকালে চামেলী বলেছিল, আপ কিঁউ য়ঁহা পড়ে রহে হ্যায় বাবুজি? সত্যিই তো আমাকে কেউ এখানে থেকে যেতে বলেনি। আমি যেন শুধু চামেলীর চিন্তা করে পড়ে আছি? সেই কথার পর থেকেই রজত যেন নিজের

অজান্তেই একটু একটু করে গম্ভীর হয়ে পড়েছে। এও সে বোঝে — তার এই বদলে যাওয়ার তল খুঁজে বেড়াচ্ছে চামেলী — হন্যে হয়ে — মনে মনে -- আবার খোলাখুলি কাজে কম্মেও। যেমন : পকেটে টাকা রেখে দিচ্ছে। রজতের হাতখরচের জন্যে। চায়ের সঙ্গে এক একদিন এক এক রকমের খাবার আনছে। মেয়েটা তার মনটাকে যেন কিছুতেই ছুঁতে পারছে না। একদিন তো ঘুম থেকে উঠেই চামেলী বলল, গোড় লাগি বাবুজি —

কিঁউ?

উস রোজ গলতিসে উহ বাত আ গেয়ি মু মে —

কোন্ কথা? আমার তো মনে নেই।

দিদিজি — জমাইবাবু লওট গিয়া রাত মে — যব সবেরে হুয়া — ম্যায়নে সোচা কেয়া মেরি বারেমে দিদিজি চলে গয়ি — তো মেরি মন বড়ি দুখাতি থি — তব ম্যায় গলতিসে—

ছোড়ো উহ ফজুল বাত। ম্যায় কব্ ভুল চুকা —

কথাটা বলেই ইরার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল রজতের। একবার এক দোয়াত কালি ঢেলে ফেলে ভয় পেয়ে বলেছিল, ইস! কে ফেলল বাবা!

রজত জানত। তুমি ফেলেছ।

আমি?

হ্যাঁ তুমি। এইমাত্র দেখলাম।

ইস্। তাহলে তো খুব অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। তুমি মাফ করবে তো বাবা? বল। তুমি মাফ করবে?

দূর বোকা! এভাবে বললে কি কেউ তার মেয়ের ওপর রাগ করে থাকতে পারে? কোলে আয় —

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে রজত চোখের সামনে সেদিন ইরার চলে যাওয়া দেখতে পেল। অভিষেককে ডেকে চারপাই থেকে তুলল। নিজে গিয়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ভেতরে বসল। ও কত বড় হয়ে গেল। হাতে ব্যাগ। কবজিতে ঘড়ি। ও কি বাকি জীবনটা এমন জেদে জেদে সুখে ভাল করে কাটিয়ে দিতে পারবে? পারলেই ভাল। যেন কোনও কষ্ট না পায়।

নিরসা আর তার আশেপাশে অফিস — খনি — দুই জায়গাতেই কাজ করে অনেক বাঙালি। বিকেল বিকেল রিটায়ার্ড লোকের মত বেড়িয়ে ফেরার পথে রজত ডাল, আটা, ট্যাঁড়শ, বেগুন, আলু এই সব কিনে ফেরে। কী রাঁধতে হবে তা সে কোনওদিনই বলে না চামেলীকে। চামেলী এক এক পদ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাঁধে। রাঁধতে বসে সন্ধ্যের পর। দফতর থেকে ফিরে। তখন এক একটা কথা পাড়ে। যেমন —

ইধার তো বহুত বঙালিবাবু নোকরি করতা। গপসপ করনেকে লিয়ে আপ তো উন লোগো কা পাস যা সকতা —

আমার অত গল্পসল্প আসে না চামেলী।

এই সব বাঙালির দু' একজনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে রজত। রাস্তাঘাটে। এদের কাছে পৃথিবীটা হল — নিরসা-চটি। তাও নয়। নিরসা-চটির ভেতর নিরসাখনি। এমনকি ওদের কাছে আসানসোল যেন দূর কোনও দেশ। গতায়াত বড় জোর নিয়ামতপুর অব্দি।

বর্ষা চলে গেলেও এক একদিন দু' এক ফোঁটা হয়। আকাশও ঘনিয়ে আসার ভান করে। এরকমই এক দুপুরে দরজায় খটখটি। ঘুম ভেঙে গেল রজতের। চামেলী তার দফতরে। দরজা

খুলে রজত দেখে তার সামনে এক গাল হাসি নিয়ে মোতিয়া দুসাদ দাঁড়িয়ে। পটনামে সবেরেওয়ালে গাড়ি পাকড় লিয়া বাবুজি —

ব্যায়ঠো বলে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা চারপাই বারান্দায় পেতে দিল রজত।

মোতিয়া তাতে না বসে মেঝেতে লেপটে বসল। চারদিক তাকিয়ে বলল, কোয়ার্টার তো সহি হ্যায়।

চিনে বের করলে কি করে?

এ কোই বাত হ্যায় বাবুজি! মেরি তো বরস বরস বীত গযি য়ঁহা। ন'নম্বর, আট নম্বর সব ম্যায়নে জানতি। হাতের গাঁটরিটা ঘরের কোণে রেখে মোতিয়া জানতে চাইল, চামেলী কাঁহা হ্যায়?

ও তো দফতর গয়ি।

তো নোকরিমে ভর্তি হো গয়ি। আচ্ছা হুয়া। জেন্দাহা উনকি জগহা নহি থি।

হাসি এসে গেল রজতের মুখে। পণ্ডত্ দয়ানাথ ক্যায়সা হ্যায়?

সব কোই সহি সলামত হ্যায় বাবুজি। ও পণ্ডত্ বেওকুফি কিয়া। চামেলীকা উপর জবরদস্তি হুকুম চালায়া তো আপকো লেকর জেন্দাহাসে ভাগ আয়ি চামেলী। মেরি ভি ভুল হুয়ি থি।

রজত শোনে আর অবাক হয়। সাধারণ আনপঢ় মেয়েলোক মোতিয়া। কিন্তু কী সহজে নিজের ভুল স্বীকার করে নিল। কত সহজে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। জেদাজেদির জগৎ এরা জানেই না।

মোতিয়া ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে বলল, আপলোগ চলে আয়ে তো ম্যায় ভি পটনামে কইলা ভবন নেহি গয়ি।

কইলা ভবনমে রিপোর্ট নেহি কি?

নহি বাবুজি। আপ চলা আয়া তো ক্যায়সে ম্যায়নে আকেলি আকেলি রপোট লিখাঁউ ভবনমে?

যাগ্নিয়ে! করোনি তো করোনি। কালই এখানে অফিসে গিয়ে সব লিখিয়ে আসবে মোতিয়া।

মোতিয়া কাগজপত্রের ব্যাপারে রজতের মুখ থেকে ভরসা পেয়ে খানিক স্থির হল। নয়ত রিপোর্ট লেখানোর কথায় তার মুখের চেহারা অস্থির হয়ে উঠেছিল।

রজত জানতে চাইল, টাকাগুলো পেয়েছিলে?

সাতশ রুপৈয়া?

হ্যাঁ। তোমার মাথার নিচে চাপা দিয়ে রেখে এসেছিলাম।

সব মিলা বাবুজি। ম্যায়ভি চামেলীকে লিয়ে এক তওফা লে আয়ি।

কিসের তোফা?

চামেলীকো দফতরসে লওটনে দিজিয়ে। তব দেখিয়েগা।

বিকেল হলে মোতিয়া দুসাদ নিজের থেকেই রুটি বানাতে বসল। আটা মাখতে মাখতে বলল, বরসোঁসে ম্যায়নে নিরসামে রহনেওয়ালী। ম্যায়নে ভি জেন্দাহাসে আকেলি রহনে ন সাকি বাবুজি। মেরি বেটা কা বেওয়া চামেলী। উসকি লিয়ে বড়ি বেচ্যায়নি মে থি।

দফতর থেকে ফিরে যে খানা বানানোর কথা ছিল চামেলীর — তা সবটাই বানিয়ে ফেলল মোতিয়া। এক এক করে। রোটি, আলু ভিন্ডির সবজি। আজই এসেছে বলে মোতিয়া বাবুজি আর চামেলীর জন্যে খুব যত্ন করে অড়হড় ডাল বানাল। ফোড়ন দেওয়ার সময় একটু ঘি দিল।

সঙ্গে করে কিছু ঘি নিয়ে এসেছে সে। জেন্দাহার দুধটা ঘন। আর সর পড়ে ভাল। রোজকার সর রোজ তুলে রেখে মোতিয়া নিরসার কথা ভেবে ঘি করেছে। ব্যাপারটা জেনে ভাল লাগল রজতের।

আমরা তো চলে এলাম। তারপর দই বানাতে?

হাঁ বাবুজি। বহুত কম করকে বানাতি থি। আকেলি ক্যায়সে সামাল দেগি। ইসি লিয়ে কম করকে দুধ খরিদ তে থি।

রাত বাড়ছে। কিন্তু চামেলীর দেখা নেই। রাত যখন আটটার মত মনে হল — তখন রজত বলল, তুমি খেয়ে নিও। এতটা পথ এসেছে। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

আপভি খা লিজিয়ে।

চামেলী ফিরলে আমি খেতে বসব। তুমি খেয়ে নাও।

ন বাবুজি। চামেলী আয়েগি তো উসকি সঙ্গ সঙ্গ ম্যায়ভি দো রোটি খায়েগি।

তোমার খিদে পেয়েছে।

রাস্তেমে তো থোড়া কুছ নাস্তা কিয়া।

কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল মোতিয়া। বাইরে অন্ধকারে চামেলীর জন্যে পায়চারি করতে করতে রজতের একসময় মনে হল, আমি আর মোতিয়া — দু'জনই বাড়ির রোজগেরে মানুষের জন্য কিছু না খেয়ে বসে আছি। সে ফিরলে তবে আমরা তার সঙ্গে খেতে বসব।

এত দেরি তো কোনওদিন হয় না চামেলীর। কোথায় গেল? ফৌজদার পাসোয়ানের ওখানে যায়নি তো?

ঘুম চোখে একবার উঠে বসল মোতিয়া। চামেলীর খোঁজ করল। নেহি লওটি? — তারপর একসময় বলল, কাচ্চি উমর। খুন ভি তেজি। ম্যায়নে যো পেনশন কি বারে মে বোলি থি বাবুজি — ওহি আচ্ছা থি। পেনশনকা রুপৈয়া ঘরমে বৈঠকে মিলতি থি। দফতর উফতর কুছভি দরকার নেহি থি।

আরও খানিক পরে মোতিয়া দুসাদ নিজেই নিজের গাঁটরি খুলে মেঝেতে তার বিস্তারা পাতল। তাতে বসে বড় একটা মাটির ঘট শব্দ করে মেঝেতে ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলল।

করছ কি মোতিয়া?

দেখিয়ে বাবুজি। চামেলীকে লিয়ে ম্যায়নে ক্যা তওফা লায়ি।

দেখে অবাক হল রজত। গাদা গুচ্ছের পাকানো পাকানো নোট। দশ টাকা, বিশ টাকা, পঞ্চাশ, একশোর নোট। খুচরো কাঁচা টাকা অনেকগুলো। আধুলি। এ সব কি?

দহি বিকনে কো বাদ যো রুপৈয়া মিলি — ম্যায়নে এক কড়ি ভি খরচা নেহি কি। সব চামেলীকে লিয়ে লে আয়ি। রজত কোনও কথা বলতে পারল না। যার সঙ্গে উঠতে বসতে এত চুলোচুলি — তার জন্যে সব জমিয়ে জমিয়ে এত বড় তোফা?

সেই চামেলীরই ফেরার নাম নেই। দফতর কখন সেই বিকেলবেলায় বন্ধ হয়ে গেছে। চামেলী তো একা একা কখনও নিরসার বাইরে যায় না।

চামেলী যখন ফিরল — তখন অন্ধকার নিরসায় শুধু ঝি ঝি ডাকছে। অনেক — অনেক দূরে কোথাও লরির ইলেকট্রিক হর্ন। চামেলীর মুখ দেখে রজত অবাক হল। সেখানে লজ্জার কোনও চিহ্ন নেই। চাকুরে ছোকরার বেপরোয়া ভাব।

মোতিয়া দুসাদের ভেতর একজন শাশুড়ি চামেলীকে দেখেই ফিরে এল। কাঁহা থি?

তাকে দেখে চামেলী স্বাভাবিক গলায় বলল, ক্যা? জেন্দাহা আচ্ছা নেহি লাগি!

নিজের কথার জবাব না পেয়ে মোতিয়া চামেলীর এই ঠেস দেওয়া কথা গায়েই মাখল না। সে ফের জানতে চাইল, কাঁহা থি ইতনি রাত?

জানলার তাকে টিফিনের স্টিলের কৌটোটা ঠক করে রেখে শব্দ করে কলঘরের দরজা খুলল চামেলী। সেখানে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে বলল, জাহান্নমমে! কলঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জল ছাড়ার শব্দ। জানলার বাইরে অন্ধকার। দরজার বাইরে অন্ধকার। মোতিয়া আর রজত মুখিমুখি তাকিয়ে। কেউ কোনও কথা বলতে পারল না খানিকক্ষণ।

শেষে মোতিয়াই তার দেহাতী খরখরে গলায় বলল, দফতরওয়ালী আওরতকি ঘমণ্ডবাজি মুঝে বরদাস্ত না হোগি।

রজত কোনও কথা বলল না। সে মনে মনে জানে — শাশুড়ি হিসেবে নিরসাখনির এই কোয়ার্টারে মোতিয়া কতখানি নিরুপায়। তার এখানে খাওয়া থাকা — সবটাই চামেলীর মর্জির ওপর। খিদের মুখে খাবার আর মাথার ওপর একটা ছাদের জন্যে সব মানুষই শেষ অব্দি ঠেকে যায়।

কলঘর থেকে বেরিয়ে চামেলী দেওয়ালে ঝোলানো হাত আয়নায় মুখখানা দেখে চিরুনি চালাচ্ছে। মোতিয়া মেঝেতে বসেই ওপরমুখো হয়ে চামেলীর দিকে তাকিয়ে। কত বদলে গেছে চামেলী — নোকরি পাবার পর। দিব্যি সিনথেটিক শাড়ি। মাথায় মোটা করে বিনুনি। কলঘর থেকে বেরিয়ে এল রবারের স্যান্ডেল পায়ে। বাইরে বেরোবার চামড়াকা জুতি দরজার পাশে — ঘরের কোণে।

এবার নিজের দিকে তাকাল মোতিয়া। হেঁটে হেঁটে খালি পায়ের গোড় ফাটা চট। মাথায় তেল পড়েনি কতদিন। পরনের ঘাগরার দিকে এই প্রথম সে আর তাকাতে পারল না।

এত রাতে শাশুড়ি আর বউয়ে ফের না একটা ঝগড়া বেধে যায় — তিনজনের খাওয়া বাকি — তাই রজত বলল, খেতে বসা যাক —। বলেও তার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছেলের বিধবা বউয়ের জন্যে দই বেচা টাকা তোফা হিসেবে এতটা পথ যে শাশুড়ি বয়ে এনেছে — তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না? চামেলী তো কোনওদিন এমন ছিল না। রজতের অস্বস্তিটা আরও বেশি এ জন্যে যে, সে বুঝতে পারছে — চামেলীর ফিরতে এত দেরি হল কেন? এতক্ষণ চামেলী কোথায় ছিল? সব বুঝেও রজত মুখ খুলতে পারছে না। কারণ, চামেলী নাবালিকা নয়। তার ওপর রোজগেরে।

চামেলী একা একা বারান্দায় গিয়ে চারপাইতে বসল। বসে — সেখান থেকেই বলল, ম্যায়নে বাহারসে খাকে আয়ি।

খুব অবাক হল রজত। বাহারসে? — জানতে চেয়েও তার বিশ্বাস হচ্ছে না। এমন তো কখনও হয় না। যেখান থেকেই ফিরুক চামেলী — তার খাবার সময়ে একসঙ্গে বসবে। খাবে।

হাঁ বাবুজি। আপকে লিয়ে খানা তো বানাকে রাখা।

দু'জনের মত রুটি, সবজি, ডাল — সব সময়েই বানিয়ে রাখে চামেলী। রজত বলল, তুমহারি শাশুজিনে আজ বহোত বঢ়িয়া দাল পাকায়া। — তারপর নিজেই মেঝেতে বসে পড়তে পড়তে বলল, খানা লাগাও মোতিয়া —

রাত থাকতে পাটনায় এসে ভোর থেকে দুপুর অব্দি ট্রেনে। তারপর আসানসোল থেকে

বাসে নিরসা। নতুন করে তিনজনের জন্যে খানা বানাবার পর না খেয়ে এতক্ষণ ঠায় বসে থাকা। শেষে এই বে-ইজ্জতি? কথারই জবাব দেয় না চামেলী — দেয় তো ঠেস দেয় — নয়ত লা-পরোয়া ধমকানি। ঘুম চোখে, অপমানে মোতিয়া মাথা নিচু করে থালা এগিয়ে দেয় রজতকে। মোতিয়া ভোলে কি করে — সে একজন শাশুড়ি। রুটি ছিঁড়ে মুখে তোলে মোতিয়া। কিন্তু মুখে যেন হাত পৌঁছচ্ছে না।

মোতিয়ার মুখোমুখি বসে খেতে খেতে হাসি পেল রজতের। আমি এদের কে? কেনই বা এই খনি কোয়ার্টারে বসে — কিছুদিন আগেও যাদের আমি কস্মিনকালেও চিনতাম না — তাদের সঙ্গে রাতে খাবার রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছি? একসঙ্গে একই ছাদের নিচে থাকা মানুষজনের ভেতর এখানে এখনও টান ভালবাসার চাপা সোঁতা বয়ে চলেছে — মরেনি ভেবেই না আমি এখানে থেকে যাই। রামটহলের না-ফেরা — চামেলীর ঘন ঘন জ্ঞান হারানো — দিশেহারা মোতিয়া তার ভেতর আমায় সেদিন টেনেছিল। নয়ত এরা আমার কেউ নয়। আমিও এদের কেউ নই। ঠিক কলকাতার মতই — যেখানে আমি একটা চলতি অভ্যেসের ভেতর আর পাঁচটি ঘুঁটির একটি মাত্র।

ঘরের বাতাস ভারি। মনও ভারি লাগল রজতের। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সবকিছু হাল্কা করতেই রজত চেঁচিয়ে বলল, ঘরে এসে দ্যাখো — তোমার শাশুজি কী তোফা নিয়ে এসেছে তোমার জন্যে।

ঘরে এল না চামেলী। অন্ধকার বারান্দায় চারপাইতে বসে বসেই বলল, তওফা? হামারি লিয়ে? ক্যায়সা তওফা?

ঘরে এসে দ্যাখোই না। মোতিয়া — কাঁহা তুমহারি তোফা? দিখা দো —

অনেক দিন ধরে জমিয়ে জমিয়ে গড়ে তোলা তোফা দেখাবার কোনও ইচ্ছেই হল না মোতিয়ার। তা ছাড়া তার ডান হাতে এখন রোটি। সে এই অল্প কয়েক ঘণ্টায় বদলে যাওয়া জমানার আসলি চেহারা যেন এই মাত্র জানতে পেরেছে। দিখাও।

দিখাও তুমহারি তোফা —

সারাদিন ধরে রাত অব্দি এই পরিসানি, এই বে-ইজ্জতির পরেও বাবুজি কী করে একজন শাশুজিকে বলে — বেটিকা বেওয়াকো তোফা দিখাও। — তোফা দিখলাও!

রজতের কথায় মোতিয়া দুসাদ জ্বলে উঠল। ম্যায় কেয়া চামেলীকি বাপকা নোকরানি? তওফাকে লিয়ে উনকি য়ঁহা আনে পড়েগি।

বাতাস হাল্কা করতে গিয়ে রজত ফ্যাসাদে পড়ল। শেষে চামেলীকে শুনিয়ে বলল, তেরিকি ওয়াস্তে তেরি শাশুজি দহি বিকনে পর সারে পয়সা বচত করকে তেরি লিয়ে লে আয়ি — দেখ্ চামেলী।

অন্ধকার বারান্দায় বসে চামেলী সব শুনল। তারপর ভেবে ভেবে বলল, উহ্ তওফা ম্যায় নেহি চাহাতি —

অবাক হল রজত। কিঁউ? আপনে বিটিয়া সমঝকল মোতিয়ানে তুমহারি লিয়ে ইয়ে তোফা হাজির কি —

উনকি মেহনতিকা কামাই উনকি পাস রহেনা চাহিয়ে বাবুজি।

তোমাকে দিতে চাইছেন তোমার শাশুড়ি। ভালবেসে —

উহ্ তওফা হামারি হজম হোবে না বাবুজি। তওফা লেগি তো মুঝে উনকি বাত পর দফতর

যাকে পিনশনকা কাগজামে দস্তখত করনে পড়েগি —

এতক্ষণ পরে মোতিয়া মুখ খুলল। ও বেসরমিয়া। তুঝে কঁহি জানা নেহি পড়েগি। না তুঝে দস্তখত ভি দেনা পড়েগি। তেরি তওফা লে যা — বলতে বলতে থালি সরিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে উঠে পড়ল মোতিয়া।

শেষে হাত মুছে মেঝেতে পাতা বিছানায় বসে পড়ে নোট, কাঁচা টাকা গুনতে শুরু করে দিল। এই গোনে — আবার ভুলে যায় — ফের গোড়া থেকে গোনে। এই করে করে শেষে চেঁচিয়ে বলল, চারশো একাহত্তর রুপেয়া পচাশ পইসা — লে যা —

জেন্দাহা পর্বে তাবৎ মেহনতির পরেও একটা হেরে যাওয়ার হতাশা যেন ফুটে উঠল মোতিয়ার এই চেঁচানিতে।

তখনও চামেলী অন্ধকার বারান্দায় চারপাইতে বসে। সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে বলল, এক কওড়ি ভি ম্যায় নেহি লেগি। তুমহারি কামাই তুমহারি পাশ রাখখো।

ইসমে তেরি কামাই ভি হায়।

ও ভি তুমহারি পাশ রাখো। ম্যায় তো আভি খুদ কামাতি।

ও তো ম্যায় জানতি। — বলে একটিও আর কথা বাড়ালো না মোতিয়া। যেখানে বসেছিল সেখানেই শুয়ে পড়ল।

রজত ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বারান্দায় চারপাইতে এসে বসল। সে রোজ বারান্দাতেই শোয়। ভেতরে শোয় চামেলী। এখন চামেলী রজতের কয়েক হাত দূরে চারপাইতে বসে।

মেয়েটাকে এতটা বেপরোয়া — কাঠ কাঠ কথা বলতে কোনদিন শোনেনি রজত। একা পেয়ে কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছে হল রজতের। কিন্তু আগেকার মত সেভাবে কোনও কথাই চামেলীকে বলতে পারল না। কোথায় যেন আটকাচ্ছে তার। সেই চামেলী আর এই চামেলী এক নয়। এই চামেলী টিফিনের কৌটো হাতে দপ্তরে যায়। বাইরে বেরবার জুতো আছে তার। আজকাল পাশ দিয়ে চামেলী হেঁটে গেলে দু-একবার বাতাসে সুগন্ধ পেয়েছে রজত। যাকে বলে চামেলী এখন — যাকে বলে আলাদা একজন লোক।

চামেলীরও এক সঙ্গে অনেক কথা রজতকে বলার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না।

রজত ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল, শ্রান্ত, ক্লান্ত মোতিয়া দুসাদ যেমন ছিল তেমন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বিস্তারার ওপর তোফা জমাবার মাটির ঘটের ভাঙা একটি বড় টুকরো। হাত সরালেই হাতে ফুটবে।

তা দেখে রজত নিজের কাছে নিজে বুঝতে পারল, এই ঝগড়া, এই টান ভালবাসার ঝগড়ার ভেতর দিয়ে যেতে পারলে কেউ পুরনো হয় না — বাসি হয়ে যায় না — যে যেখানে আছি সেই অভ্যেসের নিতান্ত একটা ফার্নিচার হয়ে যায় না — বরং বেঁচে থাকার — নতুন কিছু গড়ে — বানিয়ে তোলার ইচ্ছেটা জেগে থাকে। তাতে টিকে থাকার একটা টেস্ট পাওয়া যায় জিভে।

চামেলীকে বলল, যাও, শুয়ে পড়। তোমার শাশুড়ির পাশ থেকে ওই ঘটের টুকরোটা সরিয়ে দিও।

কাঁহা? বলে ঘরে উঁকি দিয়ে চামেলীও দেখতে পেল টুকরোটা। উঠে যাবার সময় সে রজতের মুখে তাকালো। কিন্তু কোনও কথাই বেরলো না চামেলীর মুখ দিয়ে।

শুয়েই ঘুম আসছে না রজতের। এখন এখানে এক একটা দিন বড় কঠিন যায়। দূরে কোথায় ঢোলের সঙ্গে খচরখচর শব্দ তুলে তুমুল গান চলছে। রাতের বাতাসে সে শব্দ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সে ঘুমন্ত মোতিয়ার হাড় বেরনো মুখখানি ভুলতে পারছে না। আজ মোতিয়া দুসাদকে তার বড় সুন্দর লাগল। খরখরে গলা। শির-ওঠা কেঠো হাত। পা যেন দুখানি বাঁশের লাঠি। অথচ এত কাণ্ডের পরেও বিধবা ছেলের বউয়ের জন্যে টাকা-পয়সা জমিয়ে এনেছে। দুধ কিনে দই বসিয়ে একটা পেট মোতিয়া জেন্দাহায় তাদের ভিটে বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু একা একা থাকতে পারেনি। এই ঝগড়া — এই ভালবাসা কাউকে কখনও একা করে দেয় না।

আজ মোতিয়া এসে পৌঁছবার পর থেকেই একটা চিন্তা ভেতরে ভেতরে কুরে খাচ্ছে রজতকে। আজ হোক — কাল হোক নিজের ছেলের বিধবা বউয়ের পরপুরুষের সঙ্গে মাখামাখি তো মোতিয়ার কানে উঠবেই। ফৌজদার পাসোয়ানের কথা চাপা থাকবে না। তখন?

মোতিয়া কি বুঝতে পারে না — তার ছেলে রামটহল আর কোনওদিনই ফিরে আসবে না। তাই চামেলীর সামনে লম্বা যে জীবন পড়ে আছে তা তো চামেলীকেই কাটাতে হবে। চামেলীর মত করে।

চামেলী কি বুঝতে পারে না — ছেলে যখন আর ফিরেই আসবে না মোতিয়া দুসাদের — তখন সারা দুনিয়ায় তার আপনজন বলতে শুধুই মোতিয়া। সেই চামেলী কি তার শাশুড়ির সঙ্গে ছেলের বউকে যেমন মানায় তেমন ব্যবহার করতে পারে না? একটু নরম সরম করে কথা বলতে পারে না মোতিয়াকে? অত কষ্ট করে জমিয়ে আনা মোতিয়ার তোফা কি চামেলী একটু আদর করে নিতে পারত না? বাইরে থেকে যা সহজ করে ভাবা যায় — ভেতরে যারা আছে তারা তা কিছুতেই সহজ করে ভাবতে পারে না। তাই দুনিয়ার সব জায়গায় গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে।

মোতিয়া দুসাদ স্বপ্ন দেখছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। রামটহল চামেলীকে বিয়ে করে ফিরছে। নৌকো করে। গঙ্গার বুকে পাল খাটিয়ে নৌকো ছুটে চলেছে। ফাগুয়া মাহিনাকা দশোয়া তারিখ। আর চার রোজ বাদ হোলি হো হোলি। জেন্দাহার মানুষজনকে খাওয়ানো-দাওয়ানো হোলির আগেই সেরে ফেলতে হবে। কত কাজ মোতিয়ার মাথায়। গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে সারা গাঁয়ের মানুষ। তাদের ভেতর দাঁড়িয়ে মোতিয়াও দেখতে পাচ্ছে নৌকোটা। ওই তো রামটহল দাঁড়িয়ে পাটাতনে। পাশে তার নতুন বউ। এবার নৌকো সামলে-সুমলে ঘাটে ভিড়বে।

জেন্দাহার তো নিজের কোনও ঘাট নেই। ঘাট বলতে ভাঙা পাড়। এবার রামটহল নৌকো থেকে নেমে বউকে কোলে করে অন্তত পঞ্চাশ হাত পাঁক মাটি পেরিয়ে তবে শক্ত ডাঙায় উঠতে পারবে। তার আগে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। কোথাও কোথাও পাঁকের নিচে চোরা ধসে পা পড়লে মানুষজনের কোমর অব্দি গেঁথে যায়। গঙ্গার এদিকটায় নদীর পাড় ওপরেও যেমন সারা দিন-রাত ভাঙছে — তলে তলে নিচেও ভাঙছে — যা কিনা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।

সানাই, ঢ্যাটরার খুশির বাজনার ভেতর নৌকো এসে ভিড়ল। এবার রামটহলকে দূর থেকে হুঁশিয়ার করে দেবে বলে মোতিয়া দুসাদ ছুটল। ঘাট-মত ভাঙা পাড়ে গিয়ে কিছুতেই পৌঁছতে পারছে না মোতিয়া। সারা জেন্দাহা ওইটুকু জায়গায় ভেঙে পড়েছে। ওরে তোরা আমায় পথ দে। আমি রামটহলের মা। আমার সবার আগে ওখানে পৌঁছনো দরকার। ওরে তোরা পথ

দিলি?

ঘুম ভেঙে গেল মোতিয়ার। ঘর অন্ধকার। সাঁই সাঁই পাখা ঘুরছে মাথার ওপর। এ কে? কে পাশে এসে ঘুমোলো। অন্ধকারে ভাল করে দেখল মোতিয়া। চামেলী কখন এসে তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মোতিয়া এবার খুব সাবধানে উঠে আধ লোটা জল খেল। তারপর চামেলীর পাশে শুয়েই ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

এরও ঘণ্টা দেড়েক পরে অন্ধকার যখন বেশ ফিকে হয়ে এসেছে — চারপাইয়ের ওপর উঠে বসল রজত। সে একটু পরে হাঁটতে বেরবে। ঘরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। তক্তপোষে কেউ নেই। উঁকি দিয়েই চমকে উঠল সে। কোথায় গেল চামেলী। কোথায় যেতে পারে?

ফের উঁকি দিল রজত। এবার সে চামেলীকে দেখতে পেল। মোতিয়ার পাশে শুয়ে ঘুমচ্ছে। রজতও ফের শুয়ে পড়ল। আজ সে হাঁটতে যাবে না।

২৫

চামেলী ফৌজদারের ডান হাতখানি সরিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল। আজ সে ঘরে না ফিরে সিধে তের নম্বরে চলে এসেছে। তের নম্বরের এই ঘরেই রামটহল এক একদিন শেষ রাতে ঠিক এইভাবে তাকে জড়িয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ত। ভোর ডিউটি থাকলে রামটহলকে জাগানো কঠিন হয়ে পড়ত চামেলীর।

এখন ভোর রাত নয়। সন্ধ্যে রাত। রামটহলের জায়গায় ফৌজদার শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বুঝতে পারল না চামেলী। চোখ বোজা ফৌজদারের ডান হাতখানি তার গা থেকে নামিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে চামেলী এক পাট ভেজানো জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, নিরসার আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভাল করে দেখার জন্যে সে খাট থেকে নামতে গেল। পারল না।

ফৌজদার তার আঁচল টেনে ধরেছে। ছাড়িয়ে নিতে গেল চামেলী। পারল না। ফের আঁচল ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল চামেলী।

মৎ যাও। তুমহে ছোড়কে ম্যায় রহে নেহি সকতা। —

ছোড়ো।

তবু আঁচল ছাড়ল না ফৌজদার। তুমহে সঙ্গ যানপহেচানিকা পহলে — আওরত ক্যা চিজ — আওরত ক্যায়সা হোতি — ইসকা কোই আন্দাজই নেহি থা চামেলী।

এ কথায় চামেলীর একই সঙ্গে খুব আনন্দ আর ভয় হল। তুম তো শাদিসুদা হো —

ক্যায়সা শাদি? ও আওরত পাগলি হ্যায় — গুঙ্গি ভি হ্যায়।

তো তালাক দো। কিতনে সাল শাদি কিয়া?

সাত সাল হো চুকা।

অবাক হল চামেলী। তালাক কিঁউ নেহি দিয়া—?

তালাক দেগা তো মুঝে মরনে পড়ে গা।

এ কথায় আরও অবাক হল চামেলী। মরনে পড়েগা? কিঁউ?

কথা বলতে বলতে উঠে বসল ফৌজদার পাসোয়ান। খাট থেকে নেমে দরজা জানলা সব খুলে দিল। সন্ধ্যেরাতের চাঁদ যে এই কোয়ার্টারেও যতটুকু পারে জ্যোৎস্না পাঠিয়েছে — তা এবার বারান্দায় চোখ পড়তে বোঝা গেল।

চায়ে পিয়োগি?

নেহি। কিঁউ তুমহেঁ মরনে পড়েগা?

মেরা গুঙ্গি আওরতকি পিতাজি সির্ফ মেরা শ্বশুরজি নেহি — সারে বেগুসরাইকা সবসে বড়া — সবসে ভয়ানক ডাকাইত —

ডাকাইত? তো পুলিস কিঁউ পাকড়তা নেহি?

ক্যায়সে পাকড়েগা চামেলী? উহ্ তো বাগী হ্যায়। ফেরার হ্যায়।

তো ফেরার আদমি তুমহে কেয়া করেগা?

কাঁহা বেগুসরাই — আউর কাঁহা নিরসা! তুম তালাক দো।

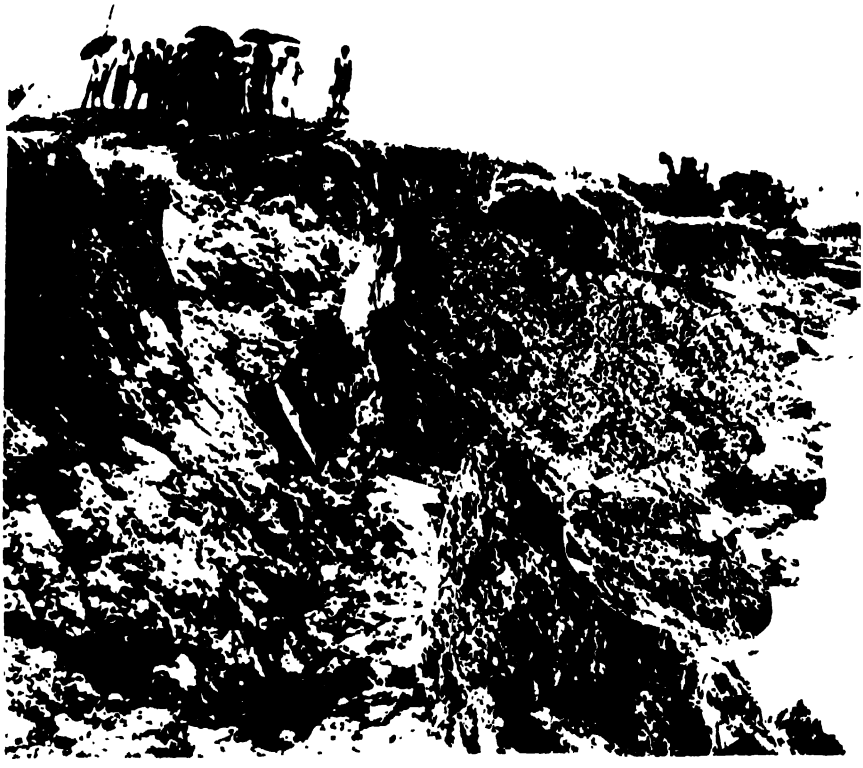

উসকা ডাকাইতিকা গ্যাং হ্যায়। সবকুছ খবর-আন্দাজ হ্যায় উসিকা। তালাক দেনেকা খবর হো জায়গা তো উসনে গাঁওমে মেরা মাকো মারেগা — ঘর জ্বালা দেগা — উসকি হাতসে মেরেভি রেহা নেহি মিল পায়েগা — জমিন জায়দাদভি ছিন্ লেগা।

উহ্ গুঙ্গি কাঁহা রহতি?

মেরা মাইজিকা পাস।

খরচা কৌন দেতা?

মেরা মাইজিকো হর মাহিনে রুপৈয়া ভেজনা পড়তা। মেরা শ্বশুরজি আপনে বিটিয়াকে লিয়ে রুপৈয়া বাগেরা সবকুছ ভেজতা। ও রুপৈয়া খরচা নেহি হোতা। মেরে ভেজে হুয়া রুপৈয়ামে সবকুছ চলতা।

এবার চামেলী খাট থেকে নেমে মাথা আঁচড়াল। ব্লাউজের বোতাম আটকাল। শাড়ি ঠিক করতে করতে আলোর কাছে গিয়ে আয়নায় তাকাল, মুখে কোনও দাগ পড়েনিতো? না। তখন

সে ফের ফৌজদারের মুখে তাকিয়ে বলল, ডারপোক আদমি দোবারা মরতা! — বলেই সে চলে যাচ্ছিল।

ফৌজদার ছুটে গিয়ে চামেলীর সামনে পথ আটকে দাঁড়াল।

কাঁহা যাতি?

মেরি ঘর যায়েগি। রাস্তা ছোড়ো।

নেহি চামেলী। আভি তুমে যানে নেহি দেগা।

ম্যায় কেয়া তুমহারা খরিদা হুয়া আওরত? রাস্তা ছোড়ো।

ছি! ছি! ইতনা গন্দা বাত মাত বোলো চামেলী। মেরা বাত তো শুনো।

কেয়া শুনেগি। তুম তো মুঝে শাদি নেহি করোগে। শাদি করোগে তো তুমহারা ডাকাইত শ্বশুর তুমে মার ডালেগা!

ফৌজদার পাসোয়ান শান্ত গলায় বলল, তুমহারি লিয়ে মেরা চাহাতমে কোই ফাঁকি নেহি। ম্যায় তুমে শাদি করনেকা সঙ্গ সঙ্গ তুমহারি নোকরি ছুট যায়েগা। শাদিসে তুমহারি আজাদি চলি যায়েগি। মেরা যায়েগা জিন্দেগি। তো চামেলী সবকুছ সোচ সমঝকে ম্যায় ঠিক কিয়া —

কেয়া ঠিক কিয়া? — বেশ জোরে বলে উঠলেও চামেলী টের পেল — ফৌজদারের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা এত জটিল — যার সঙ্গে নোকরি চলে যাওয়ার ব্যাপারটাও আছে — তা তো আগে তার মাথায় আসেনি। রামটহলের বিধবা বলেই না সে দফতরের কাজটা পেয়েছে। অন্যের আওরত হলে তো সে কাজ আর থাকবে না।

ম্যায় নিরসামে রহে যায়েগা। ইসি কোয়ার্টারমে তুম মেরি সঙ্গ সঙ্গ রহেগি। বহু বরাবর।

ক্যায়সে? বেগয়র শাদি?

যুঁহি? তুম নোকরিওয়ালি আওরত। কিসিকো বোঝ নেহি। আপনা রায়কা আপহি মালিক। কিসকি পরোয়া?

তব তো ফৌজদার ঘর ঘরমে মেরি বারেমে চর্চা হোগি।

হোনে দো। ইস রাস্তামে তুমহারি নোকরি নেহি ছুট যায়েগি — আউর ম্যায়ভি কিসিকা বন্দুককা নিশানা নেহি বনেগা। — বলতে বলতে ফৌজদার পাসোয়ান দু'হাতে জড়িয়ে ধরল চামেলীকে।

চামেলী লক্ষ্য করে দেখেছে — ফৌজদারের শরীরটা সব সময় গরম। যেন সারাদিন রোদে ফেলে রাখা বিস্তারা। ফৌজদারের বুকের ভেতরে চামেলী মুখ রেখে আস্তে আস্তে জানতে চাইল, অ্যায়সে রহেন সহেনসে যব মেরি বাচ্চা হোগি — উসকা ক্যা পরিচয় দেগি?

ফৌজদার এমনই করে তাকে ধরে, যাতে আস্তে আস্তে চামেলীর কথা বলার ক্ষমতাও ফুরিয়ে যায়।

চামেলীর কথার কোনও জবাব দিল না ফৌজদার।

অনেক কষ্টে নিজেকে তুলে ধরার মত করে চামেলী আবারও বলে উঠল, মেরি লেড়কা বড়া হোকে যব মুঝে পুছে গা — মা তুম অ্যায়সা কিঁউ কিয়া? তব ম্যায় কেয়া জবাব দুঙ্গি।

ফৌজদার এত কথা কানে নিতে পারল না। সে ফের চামেলীকে নিয়ে খাটের দিকে এগোল। শুধু কোনও মতে বলতে পারল, লেড়কাকো বড়া হোনে দো। তব দেখা যায়েগা — বাদকা বাত বাদমে —

তবু চামেলী নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার শেষ চেষ্টা করল। পারল না। তার শরীরও যে ফৌজদারের দিকে। ফৌজদার সব সময়েই চামেলীর সামনে একটা করে স্বপ্ন ঝুলিয়ে দেয়। এখনও সে তাই করল। সে রকমই মনে হল চামেলীর।

হাম দোনোকা রোজগার এক কাঠঠা করকে আসানসুল শহরমে জমিন খরিদেগা। তব উহা এক আলিসান মকান ভি বনায়েগা —

এরপর খানিকক্ষণ দু'জনের কেউই আর কোনও কথা বলতে পারল না। উঠে বসে চামেলী জানলা দিয়ে দেখল, পায়ে চলতি রাস্তায়, গাছগাছালির মাথায় একটু একটু করে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে বাইরে তাকিয়ে দেখেছে — সারা নিরসাকে কুয়াশা যেন তার পায়ের নিচে থেঁতলে পিষে মেরে ফেলতে চায়।

এবার চামেলী অনেক শান্ত গলায় কথা বলে উঠল। ঘরের আলো নেভানো হয়নি। দরজা-জানলা খোলা। তবে উঠোনজুড়ে গাছগাছালির আড়াল সব সময়েই কাজ করে। চামেলী বলল, ম্যায় নোকরি ছোড়নেমে তৈয়ার হুঁ। তুম মুঝে শাদি করো ফৌজদার —

ফৌজদার পাসোয়ান তার ভরাট গলায় বলে উঠল, বুজদিল মৎ বনো চামেলী। নোকরি বহুত মহেঙ্গা চিজ। ছুট যায়েগা তো মিলেগা নেহি।

ম্যায় তো নোকরি ছোড়নে তৈয়ার হুঁ।

নোকরিকা সঙ্গ সঙ্গ তুমহারি রুপৈয়া পয়সাকা আজাদিভি ছুট যায়েগা —

যানে দো। তুম তৈয়ার হো ফৌজদার?

কিসকা বারে?

মুঝে শাদি করনে?

দিওয়ানিপন ছোড়ো চামেলী। ম্যায় শাদি করনেকা সঙ্গ সঙ্গ সব চৌপট হো যায়েগা। শ্বশুরজি দেশমে ডাকা ডালেগা। ইহা ভি গ্যাং ভেজকে ডাকা ডালেগা। ঘর যায়েগা। নোকরি ভি যায়েগা।

মুঝে শাদি করকে দুসরি নোকরি ঢুঁড়ো। দুনিয়া ইতনা বড়া হ্যায়। কঁহি না কঁহি কুছ মিলহি যায়েগা। তুম জওয়ান হো। হাট্টা কাট্টা ভি হো। ইতনা ডরপোক কিঁউ?

আঁতে ঘা লাগল ফৌজদারের। সে চেঁচিয়ে বলল, ম্যায় ডরপোক নেহি। সবকুছ সোচ সমঝকে চলনা চাহিয়ে চামেলী। ম্যায় নয়াসা কোই নোকরি ভি ঢুঁড লে সাকতা। মগর মেরা মাই-কো কৌন দেখেগা?

ম্যায় দেখুঙ্গি শাশুজিকো। হাম দোনোকো পাস মাজি রহেগি।

ও রাজি নেহি হোগি।

কিঁউ?

আপনা ঘর গেরস্থি ছোড় কর নয়া জাগ্‌হামে ইস উমরমে মাজি যানে নেহি চাহেগি।

তো উহা উনকো রহনে দো ফৌজদার।

ক্যায়সে রহেগি? আপনা বেটিকি ওরসে বদলা লেগা শ্বশুরজি। ডাকা ডালকে শ্বশুরজি মেরা মাজিকো বে-সাহারা কর দেগা। ম্যায় শ্বশুরজিসে ছিপছিপকে জিন্দেগি বিতানা সাকতে। মগর মেরা মাইজি —

তব ছোড় দো মুঝে ফৌজদার। ছুপা হুয়া জিন্দেগি মেরি বেপসন্দ। মেরি বরবাদিসে তুমহারা জুদাই ভি আচ্ছা হ্যায় মেরি লিয়ে — বলেই চামেলী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায়

পড়ল।

ফৌজদার চেঁচিয়ে উঠল, তুমহে বিন্ ম্যায় রহে নেহি সাকতা চামেলী —

এত বড় আকাশের নিচে নিরসার ওই ছোট্ট কোয়ার্টারে কে এক ফৌজদার পাসোয়ান চামেলী নামে একজন আওরতের আচমকা চলে যাওয়ায় কী বলে চেঁচিয়ে উঠল — তাতে এই কুয়াশা মাখা চাঁদনি রাত বা দূরের হাইওয়ের কিছুই যায় আসে না। পৃথিবী সব সময় নিজের মত করেই চলে। নিজের চালে তের নম্বর ধাওড়ার এই কোয়ার্টার রামটহল বেঁচে থাকতে চামেলীদেরই ছিল। এখানকার বারান্দা, ছাদ, গাছপালা, পায়ে চলতি পথ — সবকিছুর সঙ্গে চামেলী জড়িয়ে আছে। সেই চেনা দুনিয়া থেকে সে যেন যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারে — এমনভাবেই আলুথালু হয়ে ছুটে চলেছে।

খনি এলাকার ধাওড়ায় জীবন যেন সব সময় কোন্ এক নাগরদোলায় বসে পাক খাচ্ছে। কারও কোয়ার্টারে তাবৎ মশলা বেটে আলু ভিণ্ডি চাপানো হয়েছে। কারও ঘরের জানলার তাকে বিবিধি ভারতীর গানের কোনও থামা নেই — বিজ্ঞাপনের জিঙ্গল আওয়াজ সমেত। তার ভেতরেই কেউ বা দরদাম করে কিস্তিতে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বিছানার ডবল বেডের চাদর কিনছে।

এ সবের ভেতর দিয়ে একটা দমকা হাওয়ার মতই চামেলী ন'নম্বর ধাওড়ায় তাদের কোয়ার্টারের বারান্দায় এসে চারপাইতে ধপ করে বসে পড়ল।

বাড়ি পৌঁছেই চামেলী বুঝল, বাবুজি ঘুরতে বেরিয়ে এখনও ফেরেনি। ঘরের ভেতর থেকে বিড়ির ধোঁয়া গোল্লা পাকিয়ে পাকিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তার মানে রামটহলের মা — তার শাশুজি ঘরে আছে। ঘরে বসে একা একা মোতিয়া দুসাদ প্রাণের সুখে বিড়ি ফুঁকছে।

ঠিক এই সময় ভেতর থেকে খরখরে গলা ভেসে এল বারান্দায়। কৌন আয়া রে?

চামেলী কোনও জবাব দিল না।

মোতিয়া উঠে এল বারান্দায়। আভি আভি লওটি?

এবারও কোনও জবাব দিল না চামেলী।

মোতিয়া তার কাছে নেমে এসে বলল, দফতরমে ছুট্টি হো গয়ে তিনঘণ্টা হো গয়া। কাঁহা থি ইতনি রাত তক?

এবার চামেলী প্রায় ফিস ফিস করে বলল, ইধার উধার ঘুমতি থি।

ঘরমে আচ্ছা নেহি লাগতি!

চামেলী কোনও জবাব দিল না। মোতিয়া হাতের বিড়িতে একটা সুখ টান দিয়ে বলল, দেখ্ চামেলী। তু মেরি রামটহলকা বেওয়া। রামটহল মর গিয়া তো বদলিমে তুঝে নোকরি মিলি। ইয়ে নোকরি মেরি বেটাকা বদলি নোকরি। ইয়াদ রাখনা —

বড় চোখ করে মোতিয়ার মুখে তাকাল চামেলী। তো কেয়া?

নোকরিকা রুপৈয়াসে মজা মারেগি — আউর ফৌজদার পাসোয়ানকা সঙ্গ ফুর্তি ভি চলেগি — ইয়ে দোনো কাম এক সঙ্গ মুঝে বরদাস্ত নেহি হোগি চামেলী।

কেয়া করেগি?

ম্যায় ইউনিয়নকো বতাউঙ্গি। দফতরমে কাগজা পর দস্তখত করকে সবকুছ পেশ করুঙ্গি। এক বদচলন আওরতকি পুরি বানাওয়াট ম্যায় ফোঁড় দুঙ্গি।

কোনও কথা এল না চামেলীর মুখে।

মোতিয়া বলল, রাত করকে লওটনা — আপনে খুশি পর কিমতি কিমতি শাড়িয়াঁ, জুতা, জামা খরিদকে রুপেয়া উড়ানা — সবকুছ দেখ রহি হ্যায় ম্যায়। বাবুজিকা তরহ চুপচাপ রহনেওয়ালি নেহি ম্যায়।

তো কেয়া করনা চাহাতা?

এবার মোতিয়া দুসাদ যা বলল, তার জন্যে একদম তৈরি ছিল না চামেলী। মোতিয়া চারপাইতে একদম তার পাশে এসে বসল। গলার স্বর একদম পাল্টে গেল মোতিয়ার। এমনকি তার পিঠে হাতও রাখল শাশুজি।

চামেলী তো অবাক। সে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল।

বৈঠ যা চামেলী। বৈঠ।

চামেলী বসল।

তেরি সহেলি তিতলিনে মুঝে সবকুছ বোলি।

কিসকি বারে?

তেরি বারে — ফৌজদারকো বারে। ইস্ কাচচি উমরমে তেরি আকেলিপন মেরি ভি সহে না যায়।

চামেলী কোনও কথা বলল না। সে তার এত দিনকার শাশুড়িকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

মোতিয়া বলল, আকেলি আকেলি নোকরি কিতনি দিন করেগি? একরোজ ম্যায় নেহি রহেগি। বাবুজি মুসাফিরকা তরহা আয়া — এক রোজ মুসাফিরকা তরহা চলা ভি যায়েগা। তব তুঝকো কৌন দেখেগা?

কেয়া কহেনা হ্যায় —?

তু ফৌজদারকো শাদি কর। আপনা ঘর বসা — মেরি রামটহল কভি নেহি লওটেগা। ম্যায়নে এক মা হো কর ক্যায়সে তেরি বরবাদি চাহেগি? তু ফৌজদারকো চাহাতি। ফৌজদারভি তুঝে চাহাতে — ম্যায়নে কিঁউ ইসমে দিওয়ার বনকে রহেগি —

নিজের শাশুড়ির এমন বদলে যাওয়া চামেলীর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। এই খানিক আগে শাশুজি বলছিল — ফৌজদারের সঙ্গে ফুর্তি করা তার বেপসন্দ। আবার এই বলছে — ফৌজদারকো শাদি কর।

মোতিয়া আবার চামেলীকে হাত ধরে টেনে চারপাইতে তার পাশে বসাল। তেরি শাশুজি তেরি জিন্দগি আবাদ হোনা দেখনে চাহাতি। বরবাদি নেহি বেটি —

এবার চামেলী আর মোতিয়ার মুখোমুখি বসে থাকতে পারল না। সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে যেন টাল সামলাতে পারল না। পড়েই যাচ্ছিল। ঢাকা বারান্দার পিলারটা ধরে ফেলল দু'হাতে।

তখন চামেলীর শাশুজি বলে চলেছে — কিতনি দিন ম্যায় য্যায়সি বেওয়া রহেগি? মুঝে দেখ চামেলী। মেরি তো বেটা রামটহলিয়া থা। তেরি কৌন হ্যায়? না এক বেটা — না এক বেটি। ফৌজদারকো শাদি করনাহি তেরি লিয়ে সবসে আচ্ছা হোগি।

চামেলী কি বলবে? সে কোনও কথাই বলতে পারছে না। আজই খানিক আগে ফৌজদার পাসোয়ান তাকে যা বলেছে —

তা হল, বেগুসরাইয়ের মস্ত ডাকাত তার শ্বশুর। তার মেয়েকে তালাক দিলে ফৌজদারের জমিন, জায়দাদ, জিন্দগি — সব কিছু হারাতে হবে। তার চেয়ে এই ভাল — সে নিরসাতেই

থেকে যাবে পাকাপাকি। চামেলী এসে তার সঙ্গে থাকবে। সে নোকরিওয়ালি আওরত। কারও বোঝা নয়। এই মেশামেশির জন্যে কাউকে কৈফিয়ত দেবার নেই। তারও উমর হয়েছে। আর ফৌজদারকে বিয়ে করলে চাকরিটি যাবে। কেননা, রামটহলের বেওয়া বলেই সে কাজ পেয়েছে। কাজ গেলে রুপৈয়া-পয়সার আজাদিও চলে যাবে। বিয়ে না করে একসঙ্গে তো থাকাই যাচ্ছে। ডাকাত শ্বশুর ডাকা ডালতে আসছে না। চামেলীরও নোকরিটা থাকছে। দু'জনের রোজগার এককাট্টা করে আসানসুলে জমি কেনা হবে। চাই কি সেখানে বাড়িও তোলা যাবে একদিন।

চামেলী তার শাশুড়ির দিক থেকে মুখ লুকিয়ে পেছন ফিরে কাঁদছিল। বারান্দার পিলারটা ধরে। তার মুখের সামনে চাঁদ উঠেছে বড় করে। রানীগঞ্জের দিক থেকে।

তার মস্ত ভয় ছিল — ফৌজদারের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা — বিয়ে শাদির কথা কী করে শাশুজির সামনে পাড়বে। একদিন তো পাড়তেই হবে। যার ছেলের বউ হয়ে চামেলী এসেছিল — তার কাছে অন্য কারও সঙ্গে নিজের বিয়ের কথা পাড়া যায়? সেই দ্বিধা তার শাশুজিই নিজে কাটিয়ে দিল।

কিন্তু এখন?

এখন সে শাশুজিকে কি করে বলে — ফৌজদার পাসোয়ানই তাকে — বিয়ে করতে পারবে না। কিংবা বিয়েই করতে চায় না। বিয়ের পথে মস্ত বাধা তার ডাকাত শ্বশুর। বিয়ের পথে মস্ত বাধা চামেলীর নিজের নোকরি — যে নোকরি তাকে দিয়েছে — আরাম আউর আজাদি।

ঠিক এই সময় কতকগুলো ধুঁধুল হাতে রজত ফিরল। আজ হাঁটতে হাঁটতে রজত অনেক দূর চলে গিয়েছিল। নিয়ামতপুর যাবার রাস্তার ধারে ধারে উঁচু-নিচু ডাঙা আর গলির পেছনে জায়গায় জায়গায় অনেক লোকের বসতি — গাঁ গ্রাম। সেখান থেকে অনেকেই যার যা ফলে — তাই নিয়ে রাস্তার ধারে এসে বসে। কাঁচাকলা, ঝিঙে, ধুঁধুল।

আজ রজত ধুধুল পেয়ে কিনে ফেলেছে। সে ধুঁধুল দিয়ে মোতিয়াদের অড়হড় ডাল খেতে ভালবাসে। উঠোনে পড়েই রজত চেঁচিয়ে বলল, ধুঁধুল মিলা। কাল ধুঁধুলসে ডাল পাকানা পড়েগি--

রাস্তা থেকেই রজত দু'জনকে বারান্দায় দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তার এ কথায় কেউই কিছু না বলায় সে অবাক হল। তাকে দেখে চামেলী ঘরের ভেতরে চলে গেল। আজ চামেলী কাজ থেকে ফিরে আসার আগেই রজত বেরিয়ে পড়েছিল। বেরোনো আর এমনকি তার পক্ষে। খালি পা। গায়ে একটা ফতুয়া গলিয়ে নেওয়া শুধু। এক গাল দাড়ি। কাঁচা পাকা মাথা। এ তল্লাটের অনেকেই এখন চেনে এই বাবুজিকে। চামেলীকা বাপ বরাবর। হাতে ঘড়ি নেই। মুখে সিগারেট নেই। চোখে চশমা নেই। আজব কিসমকা এক বঙ্গালিবাবু।

বসে থাকা মোতিয়াও কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে রজতের সন্দেহ হল — চামেলীর সঙ্গে কিছু হয়েছে। তারপর খেয়াল হল — মেয়েটা যে ঘরে ঢুকল — তারও পরনে তো দফতর যাওয়ার শাড়ি। তাহলে এই কি ফিরল চামেলী? এত দেরিতে? নিশ্চয় ফৌজদারের ঘর হয়ে ফিরেছে। নিশ্চয় তাই নিয়েই মোতিয়ার সঙ্গে চামেলীর মন কষাকষি।

রোজ রোজ এ ভাল লাগে না মোতিয়া — বলতে বলতে রজত ধুঁধুলগুলো প্রায় ছুঁড়েই ঘরের ভেতরে সবজির ঝুড়িতে ফেলল। তোমরা বউঝিতে ঝগড়া করবে — আর আমি

সামলাব — এ আমার কাজ নয়। কাল ভোর হলেই যেদিকে দু'চোখ যায় — সেদিকে বেরিয়ে পড়ব। মোতিয়া দুসাদ বাবুজির বাংলাও এখন বোঝে অনেকটা। সে শান্ত গলায় বলল, কোনও ঝগড়া নেহি কি বাবুজি। বৈঠিয়ে আপ। চায় বনাকে দেতি—

অবাক হল রজত। এ কোন্ গলায় কথা বলছে মোতিয়া। এ তো খরখরে গলা নয়। তবে কেন চামেলী তাকে দেখেই ঘরের ভেতরে চলে গেল? কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না রজত। মুখে বলল, তুম বৈঠো মোতিয়া। ঘরমে চামেলী হ্যায়। য়ো চায় বানায়েগি—

ঘরের ভেতর থেকে চামেলী গলা তুলে বলল, বনাতি হুঁ বাবুজি—

চামেলীর গলাও খুব সহজ লাগল রজতের কানে। এ তো ঝগড়াঝাঁটির গলা নয়। তাহলে অন্ধকার বারান্দায় শাশুড়ি বউতে মিলে কী কথা হচ্ছিল! তাকে দেখতে পেয়ে চামেলীই বা কেন পলকে ঘরে ঢুকে গেল! দফতর যাবার শাড়ি পরে কতক্ষণ হল চামেলী বাইরে থেকে ফিরেছে?

রজতের জন্যে বালতি ভর্তি করে জল বারান্দায় রেখে দেয় চামেলী। সেই জলে উঠোনের বাঁধানো চাতালে দাঁড়িয়ে রজত পা ধুলো রগড়ে রগড়ে। চোখে মুখে জল দিয়ে চারপাইতে বসলে মোতিয়া মুখ খুলল, যো সাচ হ্যায় ও মান লেনা আচ্ছা হ্যায়।

কোনদিকে মোতিয়া কী বলবে তা আগাম আন্দাজ করা কঠিন। এই মানুষটি যতখানি দেহাতি — ঠিক ততখানিই শহুরে। জেন্দাহাতে মিশে যেতে পারে মোতিয়া — আবার নিরসাতেও সে স্বচ্ছন্দ।

কি বলবে বল। চামেলী খায়নি। তুমিও তো না খেয়ে আছ। আমার জন্যে আবার চা করছে চামেলী।

ভুখ নেহি লাগি বাবুজি। ম্যায়নে চামেলীকা জিন্দগি কি বারে মে বোলতি হু।

ঘাবড়ে গেল রজত। আজ কি হয়েছে ন'নম্বর ধাওড়ায় এই কোয়ার্টারে? মোতিয়া দুসাদ চামেলীকে গালমন্দ না করে — কিংবা চামেলীর জন্যে দই বেচা টাকায় তোফা না মেলে ধরে — একদম তার জীবন নিয়ে কথা পাড়ছে।

মোতিয়া বলল, চামেলী মেরি বৌকা বেওয়া।

যা বলার তাড়াতাড়ি বল।

উসকি সামনে লম্বা উমর পড়ি রহি—

ঠিক এই সময় চামেলী এক কাপ ধোঁয়া ওড়ানো চা এনে রজতের সামনে ধরল।

মোতিয়া বলল বালবাচ্চা ভি নেহি হ্যায় চামেলীকি।

খাস বাত কেয়া হ্যায়?

ক্যায়সে চামেলীকি জিন্দেগি বিতেগি?

কিঁউ? তুম য্যায়সে শাশুজি হ্যায় যিসকি — উসকি কেয়া চিন্তা?

হেসে ফেলল মোতিয়া। ম্যায়নে তো বুঢটি হো গয়ি।

তবভি হাট্টাকাট্টা হো তুম। নোকরি ভি হ্যায় চামেলীকি।

সির্ফ নোকরি কোই সাহারা নেহি হো সকতি বাবুজি। ইস কাচচি উমরসে চামেলীকি ফির শাদি হোনা চাহিয়ে—

চমকে উঠল রজত। এ কী কথা বলছে মোতিয়া! এ রকম কথা তো আরও বেশ উঁচুতলায় যারা উচিত কথা বলে থাকে তাদের মুখেই শোনা যায়। জেন্দাহা আর নিরসায় যার জীবন

কেটেছে— সে কী করে নিজের ছেলের বিধবা বউয়ের ফের বিয়ের কথা পাড়ে?

সো তো সহি বাত হ্যায় মোতিয়া। লেকিন বেওয়া কো কৌন শাদি করে গা?

ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে সবই শুনছে চামেলী। অথচ সে কিছুই বলতে পারছে না। তার সামনে শাশুজি কোনও বাধাই নয় আর। বরং মোতিয়া দুসাদ নিজেই এগিয়ে এসেছে। কিন্তু ফৌজদার নিজেই যে বিয়ের কথা ফিরিয়ে দিয়েছে আজই।

লেড়কা মওজুদ হ্যায়।

তুম তো ফৌজদারকা বারে মে বোলতি হো। মগর ও তো শাদিশুদা আদমি।

শাদি কিয়া থা ফৌজদার। ম্যায়নে খবর কি। তিতলিনে বোলি, উসকা আওরত পাগলি ভি— আউর গুঙ্গি ভি। বালবাচ্চা কুছ নেহি হুয়া।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না মোতিয়া। ম্যায় ভি ইয়ে বাত কাহি শুনা হোগা। লেকিন শাদিকে পহলে সবসে আগে উসি আওরতসে ফৌজদার কো তালাক লেনা পড়ে গা।

গুঙ্গি আউর পাগল ক্যায়সে তালাক দেগি বাবুজি! তালাক কা কেয়া জরুরত?

তালাক লেনা জরুরি হ্যায় মোতিয়া। তব তো আদালতমে দরখাস্ত করনা পড়ে গা। বেগয়র তালাক দুশরি শাদি না মুমকিন।

ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা চামেলীর কানে এ কথা যেতেই তার মনটা নেচে উঠল। তা হলে তালাকের জন্যে আদালতে দরখাস্ত করলেই হবে? সঙ্গে সঙ্গে তার মন বলল, আদালত থেকে তালাক নিলেও তো ফৌজদারের শ্বশুর সব জানবে। সঙ্গে সঙ্গে চামেলীর মনটা মিইয়ে গেল। সে নিজেকে বোঝাল — আমিই বোকা! যেদিক থেকেই তালাক পাক ফৌজদার — তার শ্বশুর তো সব জানতে পারবেই।

২৬

এই সাত সকালে ঠাণ্ডা লাগবে তো মোতিয়া। কি করছো?

কুছ নেহি বাবুজি। দরফতর যাবে — সাফসুতরা হোনা চাহিয়ে—

সকালের দিকে এখন বেশ শীত লাগে। বারান্দার পাশেই কলঘরে দরজা খোলা। চামেলী চুল ছেড়ে দিয়ে বসেছে। আর মোতিয়া তার মাথা ভাল করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করছে।

এমনিতেই এখানকার বাতাসে গুঁড়ো কয়লার মিহি ধুলো সব সময় উড়ছে। তার ওপর খনি অফিসের কাছাকাছি তো কথাই নেই। পিট সাইড থেকে লোহার ডুলি চড়ে খনি পাতালে অনেকদিন ধরে জমে থাকা ধুলো ময়লা বের করা হচ্ছে রোজই। খনি চালু হবার আগে সবই ছবির মত করে তোলার আয়োজন। আর চামেলী দফতর থেকে ফেরে সেই ধুলো ময়লার অনেকটাই মাথায় আর শাড়ি ব্লাউজে মেখে। রজতের মাথা, দাড়ি — দুইই কয়লা গুঁড়োয় কিচ কিচ করে।

চামেলী আজ অফিসে বেরোবার সময় রজতের চোখে চোখ পড়তেই মাথা নামিয়ে নিল। সে রজতের চোখে হাসি আর প্রশংসার ছায়া দেখেই বুঝতে পারল — অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

হাতের বটুয়ায় টিফিনের কৌটো। বড়ে ঘরকে বিটিয়াদের মতই পায়ে জুতা। পিঠের ওপর মোটা করে বিনুনি বাঁধা বেণীটা চামেলীকে বেঁধে দিয়েছে তারই শাশুজি — মোতিয়া দুসাদ। রজত দেখলো — শীতের পরিষ্কার রোদে চামেলীকে আজ অন্যদিনের চেয়ে অনেক চকচকে লাগছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রজত এবার ঘরের দিকে ফিরতেই দেখতে পেল — মোতিয়াও চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। সে হাসি হাসি মুখে রামটহলিয়ার বেওয়াকে দফতরে যেতে দেখছে।

সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটায় রজতের মন আনন্দে ভরে গেল। তাহলে পৃথিবীটা ঠিকই চলছে। যত খারাপ ভাবি এই দুনিয়া আসলে তত খারাপ নয়। কিছু মানুষ খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। হয়তো বেশিরভাগ মানুষই বেশিরভাগ সময় ভাল।

বর্ষার মাঝামাঝি বসানো বোলিয়াতোড়ের ধানিলঙ্কার চারাগুলো বেশ মাথা তুলে উঠেছে। তার ছোট ছোট পাতার মাঝামাঝি ফিকে সাদা ফুল। এরাও ক'দিন বাদে লঙ্কা দেবে।

লঙ্কার কথা মনে আসতেই নিজের জিভে খাবার ইচ্ছে টের পেল রজত। ভোর ভোর হেঁটে ফিরলে রজতকে চা এগিয়ে দিয়ে থাকে চামেলী। আজই সকালে চামেলীর বদলে মোতিয়া চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে রজত তো অবাক, তুমি?

কিঁউ? চামেলী বেগয়র চায় ম্যায়নে নেহি দে সকতি?

না না তা কেন? চামেলী ওঠেনি?

নিদ যা রহি। দফতরসে বহুত পরেশান হোকে আতি। ম্যায় সমঝি কেয়া — আজ ম্যায়নেহি চায় বনায়েগি। উস্‌কি থোড়া বহুত আরাম চাহিয়ে। বহুত থকা যাতি।

আজ সকাল থেকেই নিরসার পৃথিবী একদম পালটে গেছে। ভোরের চা মোতিয়া। চামেলীর মাথা ঘষা — তাও মোতিয়া। খিদে খিদে ভাব আসায় লজ্জার মাথা খেয়ে রজত বলল, হালকাসা কুছ খানা হোগা —

খা লিজিয়ে।

কেয়া বনায়ি চামেলীনে?

খানা তো ম্যায়নে বনায়ি। রোটি কা সাথ বেইগন ভর্তা খায়েগা?

তুমি খানাও বানিয়েছো?

হাঁ। কিঁউ? ম্যায় নেহি বনা সকতি?

কিঁউ নেহি! তো দো ক্যায়সা বনায়ি দেখা যায়।

খেতে খেতে মুখের ভেতর রুটি, বেগুন ভর্তা রজতের যেন অমৃত লাগল। শীতের রোদে নিরসাকে একদম নতুন লাগছে। এতদিন আমি মোতিয়াকে মাঝেসাঝে খারাপ — গোলমেলে ভেবে কী অন্যায়ই না করেছি।

খাবার পর এক লোটা জলের সবটা খেয়ে নিজেকে রজতের বেশ চাঙ্গা অথচ হাল্কা লাগল। চারপাইয়ের তলা থেকে অনেকদিন পরে স্যান্ডেলটা বের করে পায়ে দিল। তারপর ফতুয়াটা পালটে একটা কাচা পাঞ্জাবি গায়ে চড়াল।

বেরতে যাবে রজত — এমন সময় ঘর থেকে মোতিয়া জানতে চাইল, কাঁহা যায়েগা বাবুজি?

য়ুঁহি আশপাশ ঘুমনে যা রহা হ্যায়। — বলেও রজত মনে মনে ঠিক করল — একবার দফতরে যাবে — সেখানে গিয়েই জানবে — ঠিক কবে খনি খুলছে।

ঘর থেকেই মোতিয়া বলল, ধোতি বদল কিজিয়ে। বহুত ময়লি সি লাগতি।

রজত তাকিয়ে দেখল — কাচা পাঞ্জাবির সঙ্গে ধুতিটা মেলেনি। ময়লা হয়ে গেছে খুব।

মোতিয়া ফের বলল, ও ধোতি ছোড়িয়ে। ম্যায়নে সাফা করকে রাখুঙ্গি।

ধুতি বদলাতে বদলাতে রজত ধমকে উঠল, তুমি কাচবে কেন? আমার জামাকাপড় আমিই কেচে থাকি।

অনেকদিন স্যান্ডেল পায়ে দেওয়ার অভ্যেস নেই রজতের। কয়লার গুঁড়ো ফেলা রাস্তায় মচর মচর করতে করতে রজত চলল নিরসা খনির দফতরে। যতই এগোয় ততই তার সেদিনের কথা মনে পড়তে লাগল। প্রায় বছর খানেক আগে শীতের ভেতর এখানে ছুটে আসি। খনি পাতালে তখন আগুন। পিটসাইড দিয়ে তখন খাঁচা ভর্তি মুনিয়া পাখি নিয়ে রেসকিউয়ের দল লোহার ডুলি চেপে পাতালে নামছে। আটকে পড়া মানুষের খোঁজে। কার্বন মনোক্সাইডের আন্দাজ পেতে।

আর এখন?

প্রায় একবছর একটা বিশাল পোড়ো বাড়ির মতই পড়ে থেকে থেকে নিরসা খনি আবার নতুন সাজে সেজে উঠেছে। এখন সারাদিন রাত মানুষজন, গাড়ির যাতায়াত। একটা সাজো সাজো রব পড়ে গেছে যেন।

দফতর বলতে টানা বারান্দা। তার গায়ে বড় বড় ঘর। রজত ইচ্ছে করেই নতুন বানানো পাক্কি দফতরে গেল না। সেখানে চামেলীর ডিউটি। রজতকে দেখলে জড়োসড়ো হয়ে পড়বে।

কেউই রজতকে বলতে পারলো না — ঠিক কবে খনি খুলে যাচ্ছে। শেষে একজন বলল, ইউনিয়ন অফিসমে পুছিয়ে —

ইউনিয়নের অফিসটা চেনে না রজত। এদিককার সব খনিতেই একই দলের ইউনিয়ন। তা সে জানে। কিন্তু ঠিক কোথায় যে সেই অফিস তা সে জানে না। কিন্তু রজতকে সেই অফিস নিজে থেকেই খুঁজে বের করল।

রজত যাচ্ছিল — সেফটি অফিসারের ঘরের দিকে। একজন নীল হাফশার্ট গায়ে লোক এগিয়ে এসে বলল, দত্তাবাবু আপকো সেলাম দিয়া —

কে দত্তাবাবু?

এবার নীল শার্ট গায়ে লোকটিকে ভাল করে দেখল রজত। হাফ শার্টের নিচে হাফপ্যান্ট। বোঝাই যায় লোকটি খনি পাতালে কাজ করে থাকে। এখানে অনেকেই সারাজীবন হাফপ্যান্ট পরে কাটিয়ে দেয়। বিশেষ করে খনির ভেতরে যাদের নিত্যদিন নামতে হয়।

লোকটি বলল, ইউনিয়নকা লিডর লোক। ভাইস-প্রিসিডেন।

দত্তা কারও নাম হয়? কোনদিন শোনেনি রজত। সে জানতে চাইল, কাঁহা?

ইউনিয়ন অফিসমে।

লোকটি হাত দিয়ে অফিস দেখালো। খানিক দূরে হাইওয়েতে ওঠার বদলি রাস্তার শুরুতে একটা দোতলা বাড়ির একতলায় রজত দেখলো, সাইনবোর্ড লটকানো। ওটাই হবে নিশ্চয় — মনে মনে বলেও রজত বুঝে উঠতে পারল না — কেন তাকে ডাকা হচ্ছে। কেনই বা এই দত্তাবাবু তাকে সেলাম দিল। — মানে, ডেকে পাঠালো। তাকে কি চেনে? বাড়িটার কাছাকাছি এসে রজত দেখতে পেল — বছর সাঁইত্রিশ আটত্রিশের বাঙালি চেহারার এক ভদ্রলোক — খাদির মোটা পাঞ্জাবি — পাজামার ওপর খাদির রঙিন চাদর গায়ে তার দিকে

তাকিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

আরও এগোলে ভদ্রলোক একগাল হেসে বাংলায় বললেন. আসুন। আসুন। আপনি তো আমাদের ইউনিয়ন অফিসে কোনওদিন আসেননি।

না। আপনি আমাকে চেনেন?

চিনি বৈকি। খুব চিনি। চিনবো না কেন? আমি অসিত দত্ত। — বলে ভদ্রলোক তাঁর মাথার ওপর লটকানো ইউনিয়নের সাইনবোর্ডটি দেখালেন, আমি এখানে আছি ষোল বছর। রামটহলের বাবাও আমাদের অ্যাকটিভ মেমবার ছিল। এসব শুনেও খুব পরিষ্কার হল না ব্যাপারটা রজতের কাছে। আমাকে চেনে? খুব চেনে। কিন্তু আমাকে ডাকা কেন? চুপ করেই থাকল রজত। একটা চাদর নিয়ে বেরনো উচিত ছিল। ভাল করে রোদ উঠেছে অনেকক্ষণ — তবু বাতাসে শীতের ধার। একটু শীত শীত করছে।

মোতিয়া দুসাদকে আমরা জানি অনেকদিন। রামটহলকেও চিনতাম। আর নিরসাতে রিপোর্ট করতে এসে ওদের সঙ্গে আপনার এই থেকে যাওয়ার কথাও তো 'এখন' কাগজে পড়েছিলাম — কয়েকমাস আগে।

বেরিয়েছে নাকি? — বলে রজত বুঝলো, তাহলে বিশু ওরা ফিরে গিয়ে লিখেছে।

হ্যাঁ। দেখেননি?

আমি অনেকদিন কাগজ দেখিনা।

ঠিক এই সময় একজন লোক কেটলি হাতে এসে দু'টি খুরি নামিয়ে দিয়ে তাতে ধোঁয়া ওড়ানো চা ঢেলে দিল।

নিন। গরম চা খেতে এখন ভাল লাগে। — বলে অসিত দত্ত নিজের খুরিটি কাছে টেনে নিল। রজত এবার বুঝলো — দত্ত পদবীটা হিন্দি উচ্চারণে দত্তা হয়ে গিয়েছিল। অসিতের মাথায় সিঁথির কাছটায় পাক ধরা শুরু হয়েছে। অনেকদিন ধরে এখানে থেকে এখানকার লোকজনের সঙ্গে ওঠা বসা করতে করতে লোকটির বাংলায় বিহারি টান এসে গেছে।

চা শেষ হলে অসিত দত্ত বলল, আপনাকে যেতে আসতে দেখি।

কোথায়?

এখানকার রাস্তাঘাটে।

ওঃ! তা খনি খুলছে কবে বলতে পারেন —

এই শিগগিরিই খুলে যাবে। আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আমরা —

রজত আমরা কথাটা শুনেই মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করল — এই আমরা আসলে কারা? আর আমি বাইরের একজন উটকো লোক।

আমার সঙ্গে আবার কী কথা থাকতে পারে? আমি তো নিরসা খনিতে কাজ করি না।

রজত সাবধান হবার চেষ্টা করল। এই পৃথিবীতে কিছু না করেও সাবধানে থাকতে হয় — চারদিকে চোখ রাখতে হয়। মুখে সে শুধু বলল, বলুন —

রামটহলের বেওয়া চামেলীর আপনি বাবার মত।

একথা জানলেন কি করে?

চামেলী দফতরে ঢুকেছে। সে আপনাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

একথাই বা জানলেন কি করে?

সবাই জানে। নিরসা তো খুব বড় জায়গা নয়। এখানে সবাই সবার খোঁজখবর রাখে। আমরা

ইউনিয়ন করি — আমরা জানব না? তাছাড়া মোতিয়া দুসাদকে আমরা চিনি বহুকাল। সেও আপনাকে খুব মানে। মোতিয়া তো একসময় ইউনিয়নের সঙ্গেও ছিল। অনেক আগে। কি বলছিলেন —

ও হ্যাঁ — বলে একটু থামলো অসিত দত্ত। আমরা বলছি — অল্পবয়সে বিধবা চামেলী। সামনে লম্বা জীবন —

রজত বুঝলো, এসব কথা কোন ইউনিয়ন লিডারের মুখে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। চামেলী এখানে থাকলে বলে উঠত — পরায়া মামলামে দখল দেনেওয়ালা কৌন হোতা হ্যায় আপ?

রজত কোন কথা বলল না। ইউনিয়ন অফিসের বারান্দার লাগোয়া অফিসঘরের ভেতর দু'জন লোক লম্বা খাতা খুলে এক ধারসে রবার স্ট্যাম্প মেরে চলেছে। বাড়িটার সামনের রাস্তা থেকে একটা জিপ ঢালে নেমে গিয়ে খনিতে যাবার শর্টকাট রুট নিল। সারা জায়গাটাকে দেখে রজতের এক একসময় মনে হয় — এ বুঝি সাপলুডোর বিরাট কোনও কোর্ট।

চামেলী অবশ্য রামটহলের বদলি দফতরে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এই বয়সের একটা মেয়ের যদি কাউকে —

আপনি কি বলতে চাইছেন?

আমি যা বলতে চাই রজতবাবু তা আপনার অজানা নয়। ওর ভালই হবে ফৌজদারের সঙ্গে বিয়ে হলে। ফৌজদার চামেলীকে বিয়ে করে ওর আগেকার খনিতে ফিরে যাক। সেখানকার পার্মানেন্ট স্টাফ ও। চামেলীর জন্যে এখানে পড়ে থাকলে ফৌজদার তার সিনিয়ারিটি হারাবে। মাইনেও কম পাবে।

আমি এখানে কি করতে পারি অসিতবাবু?

আপনি বলুন। আপনার কথা খুব শোনে চামেলী।

সেকথা জানলেন কি করে?

মোতিয়া দুসাদ এসেছিল। সে বলছিল। অন্য সোর্সেও একথা কানে এসেছে আমাদের।

মোতিয়ার নামটা কানে আসতেই রজতের মাথার ভেতরে পটাং করে কি ছিঁড়ে গেল। সে খুবই শান্ত গলায় বলল, চামেলী সাবালিকা। এখানে আমার কি বলার আছে? উঠি — বলেই উঠে পড়ল রজত পালিত। একবারও সে আর অসিত দত্তের মুখে তাকালো না।

সে হন হন করে হাঁটছে। পেছন থেকে অসিত দত্তর গলা শুনতে পেল। অসিত দত্ত তখন গলা তুলে বলছে — বিয়ে করলে চামেলীরও সব দিক থেকে একটা হিল্লে হয়ে যায় — আর বুড়ি বয়সে মোতিয়া দুসাদও পেনশনটা পায় — ওদের হোল ফ্যামিলিটাই আমাদের ইউনিয়নের পুরনো মেমবার।

খানিকটা এসে পড়েও ঘুরে দাঁড়াল রজত। কি বললেন?

ইউনিয়ন ঘরের হাতায় বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এসে অসিত দত্ত বলল. আমরা ইউনিয়ন থেকে সব সময়েই সবার জন্যে টোটাল রিহ্যাবিলিটেশনের কথাই ভেবে থাকি। আপনি বুঝবেন নিশ্চয়।

রজত আর দাঁড়াল না। সে এখুনি মোতিয়ার মুখোমুখি হতে চায়।

ন'নম্বর ধাওড়ায় ফিরে আসতে বেশি সময় লাগলো না রজতের। কোয়ার্টারের সামনে এসে দেখল, মোতিয়া খুব মন দিয়ে চামেলীর বেরোবার একখানি ছাপা শাড়ি ইস্ত্রি করার চেষ্টা

করছে। শাড়িটা মাড় দিয়ে শুকনো। খুব টান টান করে খাটের ওপর রেখেছে। বারান্দায় এসে সব দেখতে পেল রজত। শাড়ির ওপর পুরনো কাগজ পেতে কোণে কোণে ইট চাপানো। গরম জল ভর্তি ঘটি খুব সাবধানে শাড়ির ওপর ঘষছে।

রজত কোনও কথা না বলে চুপ করে চারপাইতে বসল। আজই সকাল থেকে তার মনে হচ্ছিল — এই পৃথিবীকে আমরা যত খারাপ ভাবি তার চেয়ে পৃথিবী অনেক ভাল। বেশির ভাগ মানুষই ভাল। খুব অল্পলোক খুবই অল্প সময়ের জন্যে খারাপ হয়ে যায়। পরে তারাও আবার ভাল হয়ে যায়।

মোতিয়া তাহলে শুধু শুধু চামেলীর ওপর সদয় হয়নি। নিজের থেকেই যখন ফৌজদারের সঙ্গে চামেলীর বিয়ের কথাটা পাড়ল মোতিয়া — তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। পেটে পেটে এত বুদ্ধি? নিজের থেকে চামেলীর মাথা ঘষে দেওয়া! মোটা করে চামেলীর বিনুনি বেঁধে দেওয়া!! তার হয়ে চা করে রজতকে কাপ এগিয়ে দেওয়া!! শেষে চামেলীকে ছুটি করে নিজের থেকে মোতিয়ার খানা বানানো? এমকি আমার ছাড়া ধুতি অবধি কাচতে চাওয়া?

আমি কি কোনও দিনই সাবধানী হব না? এই পৃথিবীতে চারদিকে চোখ খুলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। মোতিয়া শেষ অবধি ইউনিয়ন অফিসেও গেছে? আশ্চর্য! এরপর সে কতদূর যাবে তা বোঝা কঠিন। পেনশনের লোভ বড় লোভ। পায়ের ওপর পা তুলে বিনা মেহনতে টাকা পেতে সবারই ভাল লাগে।

গরম জল ভর্তি ঘটিটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল মোতিয়া। সে রজতকে ফিরতে দেখেছে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, বাবুজি, মুঝে এক ইস্ত্রি লা দিজিয়ে —

মোতিয়ার চোখে তাকাতে পারল না রজত। সে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, ইস্ত্রি দিয়ে কি করবে?

গরম জল ভর্তি ঘটিটা দেখিয়ে মোতিয়া বলল, লোটাসে কভি শাড়ি ইস্ত্রি হোতি? চামেলীকা বাহার যানে কা শাড়ি তো বরবাদ হো যায়েগি।

উসকি নসিব — উসকি জিন্দগি বরবাদ হো রহি হ্যায় — তো শাড়ি ক্যায়সে আবাদ রাখোগি।

জিন্দগি বরবাদ? চামেলীকি? ও ক্যায়সি?

তুম চাহতি ফৌজদারকো সঙ্গ উসকি শাদি।

সো তো উসিকি আবাদি কে লিয়ে বাবুজি।

ইউনিয়নকো লিডার লোকভি উসিকি অ্যায়সাহি আবাদি চাহতে হ্যায় —

অবাক হয়ে মোতিয়া বলল, ইউনিয়ন?

হাঁ মোতিয়া। তুম ভি ইউনিয়নসে চামেলীকি অ্যায়সি আবাদি মাঙি।

ম্যায়নে?

হাঁ মোতিয়া। আভি আভি ইউনিয়নকা দত্তাবাবুসে মেরা ভেট হুয়া।

এরপর মোতিয়া আর কথা বলতে পারল না। সে কোয়ার্টারের মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল।

রজত চুপ করে থাকতে পারল না। সে স্পষ্টই বলল, দ্যাখো মোতিয়া — তুম কি মেয়েটাকে একটু স্বস্তিতে টিকতে দেবে না?

মোতিয়া বাংলা সব বোঝে না। যা বোঝে তা হল কথার মোদ্দা ভাবটা। সে বাবুজির মুখে

চোখ তুলে তাকালো।

রজত বলল, দপ্তরে ভর্তি হয়েছে। নিজের কোয়ার্টার হয়েছে। এখন তার কাছে তুমি শান্তিতে তোমার বুঢ়াপা কাটাবে। তা নয় —

রজত শেষ করতে পারল না। মোতিয়া হিস হিস করে উঠল।

সে গলা তুলে বলল, এ নোকরি — এ কোয়ার্টার মেরি রামটহলিয়াকা ওয়াস্তে। উসকো বেওয়া হো কর চামেলী দুসরা মরদকো সঙ্গ পেয়ার মহব্বত করেগি — আউর ম্যায় বৈঠকে সব দেখুঙ্গি?

ইসি লিয়ে তো তুমনে চায় বনায়ি! খানা বনায়ি। চামেলীকি মাথে পর সাবুন ডালি!

নেহি নেহি বাবুজি। মেরি সাচ্চি চাহাতসে ম্যায়নে চায় বনায়ি। চামেলীকি মাথে পর সাবুন ডালি। নোকরিয়ালি আওরতকি থোড়ি বানোয়াট — সাজোয়াড়ি চাহিয়ে বাবুজি।

ঝুট। বিলকুল ঝুট মোতিয়া। ম্যায় তো কহুঙ্গা — জেন্দাহাসে ও যো রুপৈয়াকা তওফা লায়িথি — ও ভি এক জাল সাজিস থা। তুমহারি বানোয়াটি!

নেহি নেহি বাবুজি — বলে কেঁদেই ফেলল মোতিয়া। ম্যায়নে সাচ্চি দিলসে ও তওফা লায়িথি বাবুজি। একিন কিজিয়ে বাবুজি।

শীতের বেলা একটু একটু করে ঘোর দুপুর হয়ে উঠছে। চকচকে রোদের নিচেও কেমন ময়লা ময়লা লাগে কোয়ার্টারের গাছ-গাছালির পাতা। রজত বলে উঠল, মেয়েটা যতই ডুবছে — বিপন্ন হচ্ছে — ততই তোমার সুবিধা হচ্ছে মোতিয়া।

মোতিয়া নিজেই বুঝতে পারছে — সে চামেলীর অত ক্ষতি করতে কখনওই চায়নি — চায়ও না। কিন্তু মোতিয়া যা কিছু করে চামেলীর জন্যে — তাতে চামেলীরই ক্ষতি হয়ে যায়। অথচ মোতিয়া জানে — তাকে যত খারাপ ভাবছে বাবুজি — সে একদমই ততটা খারাপ নয়। সত্যিই সে ভাল মনে দই বেচা টাকা জমিয়ে জমিয়ে চামেলীর জন্যে নিয়ে এসেছিল।

সবচেয়ে বড় গণ্ডগোলে তাকে ফেলেছে রামটহল — মরে গিয়ে। একদিকে নোকরি। আরেকদিকে পিনশন। মাঝখানে চামেলী। এই চামেলীই যখন বউ হয়ে এসে ঘরে ওঠে তখন মোতিয়া তাকে কী ভালবাসাই না বেসেছিল। গঙ্গার পাড় থেকে নিজে চামেলীকে কোলে করে ডাঙায় উঠেছিল।

হঠাৎ বারান্দার মেঝেতে বসে পড়ে পা ছড়িয়ে মোতিয়া দুসাদ কেঁদে উঠল। রামটহলিয়া—

কাঁদছো কেন শুধু শুধু?

বিরক্ত বাবুজির মুখে তাকিয়ে মোতিয়া আরেক দফা ডুকরে কেঁদে উঠল, রামটহলিয়ারে—

মোতিয়া আশা করেছিল, এবার বাবুজি তাকে নরম করে বলবে, কেঁদো না। কেঁদো না মোতিয়া —

তার বদলে রজত উঠে দাঁড়িয়ে তিতিবিরক্ত গলায় বলল, আমার কি এখানে একটু স্বস্তিতে জিরোবার ঠাঁই হবে না?

কান্না শুকিয়ে গেল মোতিয়ার। সে দু'হাতে চোখ ডলতে ডলতে দেখল, বাবুজি ঘুরতে বেরিয়ে যেমন ফিরে এসেছিল — এখন ঠিক তেমনি হন হন করে তার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে সে আর খনির দিকে গেল না। বরং উল্টো মুখো এলেবেলে সব ডাঙা দেখে হাঁটতে লাগল রজত। এখানে পৃথিবীর পিঠ কখনও যেন রোদ পোহাতে বেঁকে ঠেলে

উঠেছে। আবার কখনও খোঁদল মত হয়ে নাবিতে ডাঙা জায়গার ছায়া ধরে আছে।

রজত জানে না — সে কোথায় যাবে। তার সামনে এখন কোনও দিক নেই। উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম — সবই তার কাছে এখন সমান। নিজেকে সে এখন দেখতে পাচ্ছে না। গায়ে পাটভাঙা জামা কাপড়। আজই খানিক আগে বের করে গায়ে দিয়েছিল রজত। কাঁচাপাকা একগাল দাড়ি। কেন সে হেঁটে চলেছে তা জানে না।

পেছনে দূরে নিরসা খনির পিটসাইডের ঠিক মাথায় আকাশের ভেতর বিশাল এক ইস্পাতের চাকা যেন ঝুলে আছে। খনি চালু হলে এই চাকা দিয়ে কনভেয়র বেল্ট ঘুরতে থাকে।

মাঠের নাবি দিয়ে মেরামতের পর কনভেয়র বেল্টের সাদা ফিতে ঝুলতে ঝুলতে অনেক দূর চলে গেছে। শীতের পড়তি দুপুরে প্রান্তরের ভেতর দিয়ে সাদা একজোড়া কনভেয়র বেল্ট রজতের মন উদাস করে দিল। কতদূর থেকে কতদূরে চলে গেছে। আর মাথার ওপর দিয়ে রোপওয়েতে চালু করার আগে লোহার টাবগুলো এদিক ওদিক চালিয়ে দেখা হচ্ছে। এই রোপওয়ে — নিচের কনভেয়র বেল্ট — সবই কেমন নিস্পৃহ। যেন এই খনির সঙ্গে ওদের কোনও যোগ নেই। অথচ কী ভয়ঙ্কর যোগ রয়েছে ভেতরে ভেতরে। একদম খনি পাতালের ভেতর অবধি। যেখানে পৃথিবীর বুকের ভেতরে থাক কেটে কেটে আর ক'দিন পরেই কয়লা কাটাই শুরু হয়ে যাবে।

আজ মোতিয়ার বানানো বেইগনভর্তা আর রুটি খেয়ে মুখের ভেতর অমৃত লেগেছিল রজতের। এখন সেখানটা তেতো বোধ হচ্ছে। বিধবা ছেলের বউ যদি ফের বিয়ে করে তাহলে পেনশন পাবার রাস্তা খুলে যায়। এই রাস্তা খুলতে মোতিয়া নিজেই চামেলীকে মাথা ঘষে দিয়ে দেখনসই করে তুলছে। ফৌজদারের যাতে আরও ভাল করে মনে ধরে — সেজন্যে চামেলীকে আগুনের আঁচে বসে রাঁধতেও দিচ্ছে না মোতিয়া। নিজেই খানা পাকাচ্ছে। নিজেই চা করছে। চামেলী শুধু পটের বিবিটি হয়ে দপ্তর যাতায়াত করুক। তাহলেই মোতিয়ার পেনশনের রাস্তা খুলে যাবে। রজত এখন বুঝতে পারছে — বাইরে থেকে যে রাস্তায় মনে হচ্ছে মোতিয়া তার ছেলের বউকে বড় ভালবাসে — সেই পথেই ভেতরে ভেতরে মোতিয়ার পেনশনের রাস্তা খুলে যাবে।

বিকেল পড়ে আসার আগেই রজত ঘরে ফিরে এল। এসে দেখল কাঠি কাঠি পা ছড়িয়ে মোতিয়া দুসাদ ঘুমোচ্ছে। ঘরে। খাটের ওপরে নয়। মেঝেতে। মাদুর পেতে।

যাকে আজ সারাটা দিন মতলবি আওরত বলে মনে হয়েছে রজতের — এখন তাকে দেখে বড় মায়া হল তার। একা। বিধবা। ছেলে আর নেই। দই বেচা টাকাগুলো হয়ত সত্যিই সাচ্চি দিল নিয়ে চামেলীর জন্যে মাটির ঘটে জমিয়ে জমিয়ে তোফা করে এনেছিল। চামেলী নেয়নি। সেই টাকাগুলো ফুরলে মোতিয়া দুসাদকে চামেলীর হাতে তোলা হয়ে থাকতে হবে পুরোপুরি। সেই ভাবনায় সে যদি চামেলীকে ভালবাসার ভান করে নিজের রাস্তা করে নেয় — তো কতটাই বা দোষ দেওয়া যায়।

সন্ধ্যের মুখে ঘুম থেকে উঠে মোতিয়া খুব দ্বিধাভরে জানতে চাইল, চায় পিয়োগে বাবুজি?

বনাও। খাই এক কাপ। কিন্তু তুমি তো চা খাও না।

আজ হামি পিবে —

খনি খুলবে খুলবে বলে রাস্তার সব আলো আজ ক'দিন হল সন্ধ্যে হলেই জ্বালিয়ে দিয়ে দেখা হয় — মেরামতি ঠিক হয়েছে কিনা। খানিক বাদেই দেখা গেল, খোলা আকাশের নিচে

সেই সব নিঃসঙ্গ আলোর ডুম দেখতে দেখতে দুজনে চা খাচ্ছে। আজ দুপুরের ঝগড়ার পর দু'জনের কেউই মুখ খুলে বলতে পারছে না — সন্ধ্যে হয়ে গেল — চামেলী ফিরছে না কেন?

শীতের কুয়াশা দলা পাকিয়ে ন'নম্বর ধাওড়ায় ঝুলে পড়ল। আশপাশের নাবি জায়গার অন্ধকার থেকে নানান জাতের পোকা আওয়াজ শুরু করে দিল। বসে থাকতে থাকতে মোতিয়া ঘুমে ঢলে পড়তে লাগল। তারপর এক সময় চামেলী ফিরল।

ফিরতেই বারান্দার মুখে রাস্তা আটকে দাঁড়াল রজত।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

তেরা নম্বরমে।

কোনও দ্বিধা নেই চামেলীর গলায়। কোনও লজ্জাও নেই। রজত মনে মনে বোঝে — এ পথে চামেলী সুখী হবে না — যতক্ষণ না ফৌজদার আদালতে তালাকের আর্জি জানিয়ে তার আগের বউয়ের হাত থেকে ছাড়া পায়। চামেলী একথাও জানে না — তার শাশুজি তার এই পেয়ার মহব্বতে তার ওপর এতটা সদয় কেন?

রজতের পাশ কাটিয়ে চামেলী ঘরে ঢুকে গেল। ঘর থেকেই সে চাপা গলায় বলল, মুঝে কিঁউ জবাব দেনা পড়েগি? মেরি ক্যা কসুর?

বারান্দা থেকে রজত বলল, তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে চামেলী — এখনও হুঁশিয়ার হও।

মেরি জিন্দেগি মেরিহি বাবুজি। ম্যায় খুদহি সামহাল লুঙ্গি।

মোতিয়া সবই শুনছে। কিন্তু আজ সে কোনও কথাতেই যাচ্ছে না। দেখে রাগ হলো রজতের। সে ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, বহুত বে-ইজ্জতি হোগি চামেলী। তব নেহি বাঁচ পাওগি।

হোনে দিজিয়ে বাবুজি। ম্যায়নে কেয়া না-লায়েক বাচ্চি?

বেগয়র শাদি পেয়ার মহব্বত তুম য্যায়সি আওরতকো কো-ই মঞ্জিলপে না পহুঁচা দেগি চামেলী।

এবার চামেলী সঙ্গে সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারল না। সে খাটে বসে। তারও যে অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারছে না। খাটের লাগোয়া দেওয়ালে মাথাটি ঠেকিয়ে সে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

২৭

সকাল থেকেই চমৎকার হিমেল হাওয়া। বেলা ন'টা-দশটার ভেতর পরিষ্কার রোদ সেই হাওয়ার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েও হাওয়ার কিছু করতে পারল না। কয়লামন্ত্রী এলেন ঠিক এগারটায় দুধ সাদা গাড়ি। স্টেনগান উঁচিয়ে ব্ল্যাক ক্যাট। আজ নিরসা খনি চালু হওয়ার দিন।

মাইক, শামিয়ানা, নার্সারি থেকে ভাড়া করে আনা বাহারি গাছপালা — ফুলের ভেতরে ভেতরে রঙিন কাগজের মালা। বিশাল শামিয়ানার নিচে ডেকরেটরের চেয়ারে সবাই বসে।

রজত শামিয়ানার একদম পেছনে দাঁড়িয়ে। সে দূর থেকে কয়লামন্ত্রীর মুখখানি দেখছিল। বাইশ বছর আগে ইনি ছিলেন তরুণ এম এল এ। এখন আগের চেয়ে মুখখানি অনেক ভারি। মন্ত্রীর পাশে বসে কোল ইন্ডিয়ার হোমরাচোমরারা। বিহারের একজন মন্ত্রীও এসেছেন। বহু বছর আগে রজত এ সব স্টোরি কভার করতে এসে কাগজের লোক হিসেবে সামনের দিকে বসত। তখন সেও ছিল তরুণ রিপোর্টার।

ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল খানিক আগে পাশাপাশি বসলেও মোতিয়া আর চামেলী এখন দূরে দূরে সরে গেছে। মোতিয়া কয়েক সারি এগিয়ে। চামেলী পেছনে। তার পাশে গা ঘেঁষে বসে ফৌজদার।

একসময় মাইকে ঘোষণা হল — যারা খনিতে মারা গিয়েছিল — তাদের সম্মান জানাতে সবাই একমিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে এবার।

বাংলায়-হিন্দিতে বার বার ঘোষণা করেও এই বিরাট ভিড়কে একদম চুপ করানো গেল না। সবাই সবার সঙ্গে কথা বলছে। আজ খনি ফের চালু হতে চলেছে বলে কথা! অনেকের অনেক আশা, আহ্লাদ, স্বপ্ন খনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনেকদিন খনি বন্ধ থাকায় অনেকের অনেক কথাও জমে আছে।

শেষে কয়লামন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে দাঁড়াতে বললেন। কেন দাঁড়াতে হবে অনেকেই তা বুঝতে না পেরে তখনও বসে। রজত তাকিয়ে দেখল — দপ্তরের বারান্দায় টাল দিয়ে খাবারের প্যাকেট। ঘচ্ করে তার মনে পড়ল — গত বছর রেসকিউ টিম, খনি এক্সপার্ট, দুর্ঘটনা বলে যারা ছুটে আসে তারা, খবরের কাগজের লোকজনকে খাওয়াবার জন্য ঠিক এইভাবেই খাবারের প্যাকেট রাখা হয়েছিল। ঠিক ওই একই জায়গায়। আজ যারা খাবার সাপ্লাই দিল হয়ত তারাই সেবারেও দিয়েছিল।

ইউনিয়নের লোকজনের চেষ্টায় অনেককে দাঁড় করানো গেল। কিন্তু সবাই দাঁড়াল না। কথাবার্তাও বন্ধ করা গেল না। রজত বুঝতে পারছিল — ওরা ঠিক ধরতে পারেনি কী হতে চলেছে। আজ স্বাধীনতা দিবস নয় যে জন গণ মন গেয়ে উঠলে দাঁড়াতেই হবে। গান নেই অথচ দাঁড়ানো?

ভিড়ের ভেতর রজত মোতিয়ার মাথাটি দেখতে পেল। বেশ এগিয়ে গিয়ে সে বসেছে। চারদিক তাকাচ্ছে। তাই গালের একপাশ দেখে চেনা গেল। মোতিয়া দাঁড়ায়নি। ফৌজদার আর চামেলী প্রায় হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে।

এক মিনিটের জন্যে চুপ করে দাঁড়ানোও একসময় শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ মাইকে নাম ডাকা শুরু হল।

বিনোদ কালাই?

একজন বুড়ো মত লোক উঠে দাঁড়ালে তাকে স্টেজের কাছে নিয়ে গেল দুজন লোক। বয়স হয়েছে বিনোদের। সে মন্ত্রীর হাত থেকে মোটা কম্বল আর নগদ দু'শ টাকা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল।

বোঝা গেল — যারা খনি পাতালে মারা গিয়েছিল তাদের রিস্তেদারের হাতে উপহার, টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে। কোল ইন্ডিয়ার তরফে।

এইভাবে রাম অবতার দুসাদ, ফটিক বাঘ, শনিচর পাসোয়ান, হনুমন্তী কালাই — রিস্তেদারদের নানান নাম মাইকে ছড়িয়ে পড়ছে নিরসার বাতাসে।

একসময় শোনা গেল — চামেলী দুসাদ —

নিজের নাম শুনতে পেয়ে চামেলী ফৌজদারের মুখে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ফৌজদার কী যেন বলল। চামেলী আবারও মাথা নাড়ল। খানিক পেছনে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে রজত ওদের দেখতে পাচ্ছে।

মাইক আবারও বলল, চামেলী দুসাদ? রামটহল দুসাদকা বেওয়া — চামেলী দুসাদ?

এবারও কোনও সাড়া দিল না চামেলী। সে চেয়ারে বসে। মাথা নামিয়ে নিয়েছে। যেন চেয়ারের পায়ের কাছে কী খুঁজছে। দূরে স্টেজে দেখা গেল — মাইকে যে অ্যানাউন্স করছে তার কানের কাছে আরেকজন মুখ নিয়ে গেল। তার পরেই মাইক গাঁক গাঁক করে উঠল — মোতিয়া দুসাদ। রামটহলকা মা-ই মোতিয়া দুসাদ —

অমনি মোতিয়া উঠে দাঁড়াল। দুজন এগিয়ে এল তাকে স্টেজে নিয়ে যেতে। মোতিয়ার কাউকেই দরকার হল না। পেছন থেকে যা দেখতে পেল রজত — মোতিয়া দিব্যি গটগটিয়ে স্টেজের দিকে চলেছে।

আজকাল বিকেল পড়তে না পড়তে ঝপ করে শীত নেমে আসে। নিরসার ধাওড়ায় ধাওড়ায় আজকের মিটিংয়ের শান আউর সৌকত নিয়ে ঘরে ঘরে জোর তর্ক — তারিফ আর নিন্দা।

কড়কড়ে দু'খানা একশ টাকার নোট খুব আস্তে আস্তে মোতিয়া তার দুই চোখে ঠেকাল। তারপর ঠেকাল ঠোঁটে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাবুজি ফেরেনি। ফেরেনি চামেলীও। আজ দপ্তরে কোনও কাজ নেই। চামেলী নিশ্চয় ফুর্তিতে ডুবে আছে ফৌজদারের সঙ্গে। কথাটা মনে হতেই ফের নোটের জলছাপের জায়গায় চুমু খেল মোতিয়া দুসাদ। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — রামটহলিয়ারে —

আর কিছু বলতে পারল না মোতিয়া। তার দুই চোখ দিয়ে শুধুই জল পড়তে লাগল। তা মুছে ফেলার কোনও চেষ্টা করল না মোতিয়া। সে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ল। উপহার পাওয়া কোলের কম্বলের ওপর খুব আলতো করে হাত বোলাতে লাগল। এক বছর হতে চলল — রামটহলিয়া আর নেই। সে আর কোনওদিন আসবে না। ও কথা মনে পড়তেই মোতিয়ার ভীষণ ভয় করতে লাগল। এখানে এখন সে একদম একা। খোলা দরজার বাইরে পৃথিবীটা একদম অন্ধকার। এমনকি ঘাসের ডগাগুলোও অন্ধকার। এটা চামেলীর কোয়ার্টার। সেই চামেলীই এখানে শুধু খেতে — ঘুমতে আসে। তাও আসে অনেক দেরিতে। রাত করে। বারান্দায় পড়ে থাকা আলোর ভেতর থেকে একটা বড় মত পোকা অন্ধকার উঠোনে নেমে গেল। সব জেনে শুনে মোতিয়া কী করে আর চামেলীকে রামটহলের বউ বলে ভাবে। কি করেই বা ভাবে — চামেলী এখনও রামটহলের বিধবা। তা হলে কোন্ সুবাদে আমি এখানে আছি? এ যে একেবারেই আমার জায়গা নয়। ভাবতেই ঘরের ভেতর বিজলি আলোয় বসে খোলা দরজার কোণে বাইরের অন্ধকারের যেটুকু দেখা যায় — তেমনই অন্ধকার লাগল নিজের নসিবকে। সামনে কোনও আশা নেই। নেই কোনও হাসি। কোলের ওপর পড়ে থাকা দামি, নরম কম্বলখানি মোতিয়া মেঝেতে পাতল। বেশ গরম — আর দুজনের গায়ে দেওয়ার মতই। তার ওপর শুয়ে পড়ে বাকিটা নিজের গায়ে টেনে নিল।

কে যেন খুব দূর থেকে তাকে ডাকছে। মোতিয়া — মোতিয়া —

প্রায় শোনা যায় না। মোতিয়ার ফিকে ঘুমের ওপর দিয়ে কে যেন একটা সুতলি দড়ি আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শিরশির করে উঠল সারাটা শরীর। কৌন?

উঠে বসে মোতিয়া দেখল, কেউ নেই। সারা মহল্লায় কোনও শব্দও নেই। কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছে তা বুঝতে পারল না মোতিয়া। ভয়ে কেঁপে উঠল। তবু সাহস করে খোলা দরজার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কৌন? কৌন রে —?

আমি আমি।

ওঃ। বাবুজি —

বারান্দায় চারপাইতে বসা রজত বলল, দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছ? সব চুরি হয়ে যাবে একদিন।

লেনে দিজিয়ে বাবুজি। কেয়া লেগা! কেয়া হ্যায়!

আজ তো খুব খাতির পেলে।

সবকুছ রামটহলকে ওয়াস্তে। দেখিয়ে কিতনি আচ্ছি কম্বল দিয়া।

ভালই দিয়েছে। সেই কম্বল পেতে ঘুমিয়ে পড়লে! রাত ক'টা জানো এখন?

কিতনে বাজে বাবুজি?

করিবন রাত এগার বাজ গিয়া হোগা।

এগার?

হাঁ মোতিয়া। সারে মহল্লা নিদ যা রহে হ্যায় —

তো চামেলী তো নেহি লওটি।

আজ পুরে ছুট্টি। আ যায়েগি।

খানা খা লিজিয়ে বাবুজি।

ভুখ নেহি।

কিঁউ?

প্যাকট মে কচৌরি, রসগুল্লা, সন্দেশ অউর চপ দিয়া থা। খা লিয়া পুরে —

ম্যায় ভি খা লিয়া বাবুজি। মুঝে ভি ভুখ নেহি। তো রাম নাম শুনাই বাবুজি?

শুনাও। হো যায় এক চৌকা তুলসীদাসজি কা চৌপাই —

বলেও মনের ভেতর খচ খচ করতে লাগল রজতের। নিশ্চয় ফৌজদারের সঙ্গে গেছে চামেলী। শেষে না কোনও বড় বিপদে পড়ে যায়। তখন সামলাতে পারবে না। বাইরের দুনিয়াটা ভীষণ হিংস্র। তার কোনও আন্দাজই নেই কাঁচা বয়সের চামেলীর। নিজের দুশ্চিন্তা চাপা দিতে রজত মোতিয়াকে বলেছে — রাত এগারটা বেজে গেছে। আসলে এখন রাত একটাও হতে পারে। সে বিকেল থেকেই এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছে — কী করলে চামেলী সুখে থাকতে পারে। হাঁটতে হাঁটতে নিয়ামতপুরের রাস্তা ধরে অনেকটা চলে গিয়েছিল রজত। শেষে এক ধাবায় চারপাইতে বসে লম্বা চাও খেয়েছে সে। খেতে খেতে শুনেছে দেশের দশা। কয়লার দাম। চোরাগোপ্তা চালান। কত কি। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। তখনও নিরসার কয়লার ঘেঁষে ঢাকা রাস্তায় রাস্তায় লোক। মন্ত্রীকে পাহারা দিতে আসা পুলিসের দল বড় লরি চেপে আসানসোল ফিরে গেল। ন'নম্বরে সে ফিরেছে অনেকক্ষণ। এসে দেখে দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে মোতিয়া অঘোরে ঘুমচ্ছে। আজ তার একটা সুখের দিন গেল। সে রামটহলের রিস্তেদার! সবচেয়ে বড় রিস্তেদার। মা। সেই সুবাদে সে কইলা মন্ত্রীর কাছ থেকে ডাক পেয়ে স্টেজ অবধি গট গট করে হেঁটে গেছে। দু'পাশের মানুষজন তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। এর চেয়ে বড় কিছু আর কি আছে জীবনে। বিশেষ করে যে জীবনে — ছেলে নেই। স্বামী নেই। ছেলের বউ থেকেও নেই। নেই টাকা। যেটুকু আছে তা ফুরল বলে।

তাই গোড়ায় মোতিয়াকে ঘুম থেকে ডাকতে চায়নি রজত। ঘুমোক। যতটা পারে ঘুমিয়ে নিক। সেই ঘুমে আজকের সুখ — সম্মান — সব স্বপ্ন হয়ে আসুক। এই সব ভেবে রজত

অনেকক্ষণ বারান্দায় চারপাইতে বসে ছিল।

শেষে নাম ধরে কয়েকবার ডাকতে তবে মোতিয়া উঠে বসে। এখন সেই মোতিয়া দু'হাতে তালি দিয়ে তুলসীদাসজির মনচাহে চৌপাই গাইছে। চামেলীর দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচার জন্যেই রজত এখন মোতিয়ার খরখরে গলায় গাওয়া তুলসীদাসজিতে ডুবে থাকতে চাইল।

ছেলের সুবাদে পাওয়া কম্বলে বসে মোতিয়া চোখ বুজে ফেলেছে। হাত দু'খানি তালে তালে তালি দিতে তৈরি। সে জানতে চাইল, আইওধ্যা কাণ্ড চলেগা বাবুজি?

অযোধ্যাকাণ্ড? খুব চলবে।

নিশুতি রাতে নিরসার বাতাসে তুলসীদাসজি ছড়িয়ে পড়লেন —

সিয়ারাম — সিয়ারাম — সিয়ারাম —

চোখ বুজে দুলে দুলে গাইছে মোতিয়া দুসাদ। খরখরে গলায়। চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। রজত বুঝতে পারছে — আজ এই নিশুতি রাতে মোতিয়ার কাছে সীতাপতি রামের সঙ্গে রামটহল দুসাদ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সামান্য খোলা জানলার বাইরে শীত আর অন্ধকার জড়াজড়ি করে ওত পেতে আছে। বেরলেই কামড়াবে। রামটহল ঘরের দরজাটা একটু আবজে দিতে বাঁ হাত পাঠিয়ে পাল্লাটা ধরতে গেল।

অমনি মোতিয়ার চোখ খুলে গেল। আপ শুনতি নেহি বাবুজি —

না না। খুব শুনছি। গাও —

নেহি বাবুজি। আভি তুলসীদাসজি আতা নেহি। ম্যায় ভি বেচায়েন হু —। ইতনি রাত — চামেলী নেহি লওটি।

সঙ্গে সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারল না রজত। দেরি করে ফেরা নিয়ে লজ্জা অনেকদিনই কেটে গেছে চামেলীর। এই প্রথম এত রাতেও সে কোয়ার্টারে ফেরেনি।

অনেকক্ষণ পরে রজত যেন নিজেকে শুনিয়েই বলে উঠল, শেষে চামেলী রাখনি হয়ে যাচ্ছে—

মোতিয়া তার মুখে তাকিয়ে বলল, হোনে দিজিয়ে। হরজা কেয়া?

এ কথায় এই শুনশান শীতের রাতে রজতের মাথায় আগুন চড়ে গেল। সে খিঁচিয়ে উঠল। তা তো বটেই!

গুস্‌সা মৎ কিজিয়ে বাবুজি। আওরত কি নসিব আওরত খুদহি বনাতি। আপ নেহি বদল সাকোগে —

সবার ভাগ্যই তাই মোতিয়া। আমিও কি জানতাম — আমি একদিন ন'নম্বর ধাওড়ায় এসে ডেরা ফেলব? যা করেছি নিজে — আমার নসিবও সেই পথ ধরেছে।

চামেলী আপনা নসিবকা ড্রাইভার বাবুজি। রাখনি হো যা রহি হ্যায় তো হোনে দিজিয়ে—

ইসসে তুমহারি সবসে জায়দা সুবিস্তা হোগি। কেয়া? — বলতে বলতে রেগে উঠে দাঁড়াল রজত। দেওয়ালে ঝোলানো শত ময়লা র‍্যাপারখানা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বলল, যাও — ইউনিয়নকো বোলো — বলেই দরজা খুলে একদম হন হন করে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল রজত।

মোতিয়া ছুটে এসে দরজা ধরে দাঁড়াল, কাঁহা যা রহে বাবুজি —

ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে রজত। আশপাশের কোয়ার্টারগুলো অন্ধকারে নিঝুম।

আজ সারাটি দিন ছুটি ছিল নিরসায়। পানি, বিজলি, বয়লার ঘর আর খনি পাতালের

কয়েকটা জায়গা বাদে সব বন্ধ। যারা আজ ঘরে তাদের সবারই সবেতন ছুটি। সারা দিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যেরাতে চামেলীকে নিয়ে ফৌজদার কোয়ার্টারে ফিরেছে।

কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে দুজনে এ গল্প — সে গপ্পে রাত দশটা বাজিয়ে ফেলে শেষে ফৌজদার খিদের কথা বলায় চামেলী খিচড়ি চাপিয়েছিল। গপ্পে গপ্পে — হাসাহাসিতে সেই খিচড়ির তলা ধরে যাওয়ায় তাই নিয়েও কম হাসাহাসি করেনি দুজনে। এখন তারা দোর দিয়ে বিছানায় বসে গল্প করছিল। গল্প আর ফুরোয় না। অনেকদিন দপ্তর যাওয়া থেকে এমন ছুটি পায়নি চামেলী। কথায় কথায় রাত যে কত টের পায়নি চামেলী। একবার বলেছিল, বহুত রাত হো চুকি। ঘর যানে পড়েগি।

ফৌজদারের সেই এক কথা। মানো এ ভি তুমহারি ঘর।

বাবুজি বৈঠে রহেগা।

রহনে দো। দাড়িওয়ালা কো কেয়া কাম হ্যায়? সির্ফ তুমহারি উপর খবরদারি।

অ্যায়সে মৎ বোলা কর। শাশুজি ভি বৈঠে রহেগি।

কিসকি শাশুজি?

এবার আর ততটা জোর দিয়ে আপত্তি করতে পারল না চামেলী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ছবিটা মনে পড়ে গেল। জেন্দাহার গঙ্গার ঘাটে নৌকো ভিড়েছে। পাঁক মাটির ভেতর কাঠি কাঠি দুই পা প্রায় গেঁথে গেছে মোতিয়া দুসাদের। নতুন বউ চামেলীকে সে পাঁজাকোলে নিয়ে খুব সাবধানে শক্ত জায়গা খুঁজছে — যেখানে পা রাখতে পারে। বাজনদাররা তখন নৌকোর পাটাতনে বসে সানাই বাজাচ্ছে। সঙ্গে ঢোলে কাঠি পড়ছে।

একসময় চামেলী বলল, মুঝে পঁওছা দো —

ইতনি রাতমে ক্যায়সে যায়েগি?

পায়দল! মুঝে পঁহুছা দো।

কাঁহা যায়েগি। বলে ফৌজদার জড়িয়ে ধরল।

ছোড়ো। মুঝে যানাহি হোগি। নেহি তো কাল সবেরমে মেরি বারে চর্চা হোগি।

হোনে দো।

ঠিক এই সময় দরজায় খটখটি।

ফৌজদার লাফিয়ে তক্তপোশ থেকে নেমে দাঁড়াল। কৌন?

ম্যায় চামেলীকি বাবুজি।

রজতের গলা পেয়ে চামেলী লজ্জায় মরে গেল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, বাবুজি —

ফৌজদারের ইচ্ছে ছিল না — এখন দরজা খোলে। চেঁচিয়ে বলত, কাল সবেরে আইয়ে। আভি বহুত থকা হুয়া। — এভাবে বললে চামেলী যে এখানে তার ঘরে এখন — তা আর খুলে বলার দরকার পড়ে না — দায়ও থাকে না কোনও।

কিন্তু দরজা খোলার জন্যে চামেলী ছুটে যাচ্ছিল। ফৌজদার চেঁচিয়ে বলল, রুখ যাও। — তারপর নিজে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

ফৌজদারের পেছন থেকে বাবুজিকে যেটুকু দেখতে পেল চামেলী — তা হল, বারান্দায় খালি পায়ে শীতে মানুষটা কুঁকড়ে গেছে।

রজতকে বারান্দা থেকে বিদায় দিতে চায় ফৌজদার। সেই মত সে দরজা জুড়েও দাঁড়িয়েছে। আজব কিসিমকা এই বঙ্গালিবাবুকে চামেলীর সঙ্গে তার পেয়ার মহব্বতের

মাঝখানে রীতিমত একটি উটকো ঝামেলা মনে হয় ফৌজদারের। এ চামেলীর কোনও রিস্তেদারও নয়। তবে?

হঠাৎ চামেলী ফৌজদারকে পাশ কাটিয়ে বারান্দায় নেমে এল। এসে রজতের হাত ধরে বলল, যুঁহি রুখ দিয়া ফৌজদার মুঝে। আইয়ে — অন্দর আইয়ে —

অগত্যা —

ফৌজদার সরে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকেই রজত যেভাবে তক্তাপোষে গিয়ে বসল — তা দেখে ফৌজদারের মনে হল — এই এক ব্যাগড়া, রাত দুপুরে ঘরে ঢুকে তক্তপোষেই যেন বসতে এসেছে।

বসেই রজত বলল, এভাবে চলতে পারে না ফৌজদার —

ফৌজদার রীতিমত রোখা গলায় জানতে চাইল, কেয়া? বোলিয়ে —

কিসিকা বেওয়া অ্যায়সাহি তুমহারা সঙ্গ সঙ্গ নেহি রহে সাকতি। চামেলী কেয়া তুমহারা রাখনি বনকে রহেগি? এ মেরা নামঞ্জুর।

ফৌজদারের মুখে এসে গিয়েছিল — পরায়া মামলামে তুম কৌন হো দখলদেনেওয়ালা?

কিন্তু সে কিছু বলে ওঠার আগেই নিঝুম তের নম্বর ধাওড়ায় বুক চিরে চামেলী কেঁদে উঠল। ফৌজদার ঘাবড়ে গেল। তার ঘর থেকে দুপুর রাতে মেয়েলি গলায় কান্নাকাটি শুনে আশপাশের কোয়ার্টারের দরজা জানলা না খুলে যায়।

কাঁদতে কাঁদতেই চামেলী কোনওরকমে বলতে পারল, ম্যায় কেয়া করুঁ? কোই রাস্তা নেহি দিখাই দেতি বাবুজি —

ফৌজদারকো শাদি কর লো। মামলা সিধা!

ফৌজদার তড়বড় করে উঠল, শাদি ক্যায়সে হোগা? শাদি করলে নোকরি ছুটে যাবে চামেলীকি —

যানে দো। জিন্দেগিকে লিয়ে শাদি জরুরি। চামেলীকি নোকরি ছুট যায়েগা তো যানে দো। তুম কিস লিয়ে মওজুদ হো?

ম্যায় শাদি নেহি করুঙ্গা —

রজত ফিরে দেখল, চামেলী কোনও শব্দ না করে কেঁদে চলেছে।

শাদি নেহি করোগে তো চামেলী অ্যায়সিহি রাখনি বনকে রহেগি?

কিঁউ, ইতনি গন্দা বাত বোল রহে বাবুজি। রাখনি কিঁউ। চামেলী মেরি ঘরওয়ালি। চামেলীকো ম্যায়নে বহুত চাহাতে —

তো শাদি কর লো।

এবার চামেলী মুখ খুলল, উসকা শ্বশুর বেগুসরাইকা বড়ে ডাকাইত। মুঝে শাদি করেগা তো উস ডাকাইত নে ডাকা ডালে গা — ইধার ভি — আউর দেশমে ভি — জমিন,জায়দাদ সব ছিন লেগা — ঘর জ্বালা দেগা বাবুজি।

ডাকা ডালনে দো। সবসে পহেলে ফৌজদারকো আদালতমে তালাককা দরখাস্ত করনে পড়েগা। দেখো ফৌজদার — তুম মরদ হো — জওয়ান ভি হো। তুমহারি জিন্দেগিকা ওয়াস্তে তুমহে বোঝ্ লেনাহি পড়েগা —

মেরা মা আকেলি দেশমে রহেতি। উনকো ভি মার ডালেগা ও ডাকাইত।

তো মাতাজিকো ইহা লে আও। শাদি করো। ঘর বসাও।

কোয়ার্টারের বাইরে নিরসা নিশ্চুপ। তিনজনের কেউই কোনও কথা বলছে না। আচমকাই উঠে দাঁড়াল রজত, তারপর চামেলীর হাত ধরে বলল, চল। কাল সকালেই দপ্তর আছে।

আজই দুপুরে কয়লামন্ত্রীর মিটিংয়ে সেজেগুজে গিয়েছিল চামেলী। সেই সাজ এখন কিছু এলোমেলো। পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে নিল।

ফৌজদার এগিয়ে এসে বলল, রাত বহুত গহেরি হো চুকি বাবুজি। ম্যায় আপ দোনোকো পঁহুছা দেতে —

যাবে? চল।

তের নম্বর থেকে ন'নম্বরে। সবকিছু ঠিকমত চললে ন'নম্বর থেকে চামেলীকে আবার তের নম্বরেই পাকাপাকি ফিরে আসতে হবে। কোয়ার্টারের কোথাও কোথাও ফুলের গাছ থেকে আচমকাই সুবাস। হাঁটতে হাঁটতে রজত বলল, আগে তোমার মাকে এখানে আনার বন্দোবস্ত কর। তারপর আসানসোল কোর্টে গিয়ে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ কর।

নেহি বাবুজি — বলে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে পড়ল ফৌজদার। চামেলীর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। রজতও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ফৌজদার বলল, সবসে পহেলে উস ডাকাইতকো পাশ উসকা বেটিকো ভেজনা পড়ে গা — উসকি ক্যা কসুর। শাদি কেয়া চিজ ও নেহি সমঝতি।

চামেলী অন্ধকারের ভেতর এবার আন্দাজেই পা ফেলতে পারল। এতক্ষণ সরু চিলতে মত বাঁধানো রাস্তার বাইরে নিচু মাটিতে পড়ে যাবার ভয় পাচ্ছিল। একবার পড়লে পা মুচকেও যেতে পারে।

রজত জানতে চাইল, অ্যায়সা শাদি কিঁউ কিয়াথা?

ম্যায় তব বেকার থা। উস ডাকাইতকা জবরদস্তি মুঝে মাননা পড়া —

এসে গেছি। এবার তুমি ফিরে যাও ফৌজদার।

তবু ফৌজদার দাঁড়িয়ে রইল।

চামেলীর কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে। আলোর ভেতর মেঝেতে কম্বল পেতে মোতিয়া বসে।

মোতিয়ার একদিকে রামটহলের সুবাদে পেনশন। আরেকদিকে চামেলীর নোকরি। ঠিক এর মাঝখানে মোতিয়া দুসাদ ছেলে হারিয়ে একা ঝুলে আছে। বড় মায়া হল মোতিয়ার জন্যে। বারান্দায় পা দিয়েই রজত বলল, এবার সবাই শুয়ে পড়। রাত আর বেশি নেই —

তবু মোতিয়া বসে রইল। রজত আর কিছু বলল না তাকে। সে বুঝতে পারছে — এখানে সে আর কারও নয়। মোতিয়া বা চামেলীও তার আর কেউ নয়।

বাবুজি। বাহারমে বহুত জাড়া। সর্দিসে বুখার আয়েগা —

রাত হো চুকা। শো যাও —

চামেলী তবু গেল না। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে ছন্নে পাওয়া মানুষের মতই মোতিয়া বসে আছে তো আছেই। চোখ দুটো ঝুলে পড়েছে যেন। রজত র‍্যাপারটা দিয়ে ভাল করে মাথা মুড়ে নিয়ে পাশ ফিরল। ফিরে চেঁচিয়ে বলল, বাত্তি বুতা দো।

তবু চামেলী গেল না। বাবুজি আপ ঘরমে যাকে খাটপর লেট যাইয়ে। হাম দোনো নিচমে—

কথা শেষ করতে পারল না চামেলী। রজত চারপাইয়ের ওপর উঠে বসল। র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তব ব্যায়ঠো উঁহা —

এত রাতে বসতে বলছে বাবুজি? কিছু অবাকই হল চামেলী। তবু বসল। তার পেছনেই বসে আছে মোতিয়া।

রাত ফিকা হোনে লাগা। বলে রজত ঘরের ভেতরটা দেখল।

ঘরের ভেতর থেকে মোতিয়া বলল, আজ খনিভি পুরা চালু হো যায়েগা।

রজতের আশ্চর্য লাগল মোতিয়ার কথা। রামটহল নেই। রামটহলের বউ বিয়ে করে চলে যাবে ফৌজদারের কাছে। তখন এই কোয়ার্টার খালি করে দিতে হবে। নিজের কোনও নোকরি নেই। সেই মোতিয়ার কাছেও খনি খুলে যাওয়া — ফের চালু হওয়া জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার আজও। খনি একদিন পুরোদস্তুর প্রোডাকশনেও এসে যাবে। তখন হয়ত মোতিয়া দুসাদ পেনশন নিয়ে জেন্দাহায় ফিরে যাবে।

দেখো চামেলী — ফির শাদি করকে তুমহারি নই জিন্দেগিকি শুরুয়াত হোনেওয়ালা হ্যায়—

কথাগুলো ঘরের ভেতরে মোতিয়ার কানে যেতে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে চেঁচিয়ে উঠল, চামেলীকি কেয়া শাদি হো রহি হ্যায়?

হাঁ মোতিয়া। ম্যায় ফৌজদারকো কবুল কর লিয়া।

সো তো বড়ি আচ্ছি বাত বাবুজি। বলে খুশিতে মোতিয়া চামেলীর মুখে তাকাল।

চামেলী তখন মাথা নামিয়ে নিল।

আউরভি এক বাত হ্যায় মেরা। তুম দোনো কান খুলকে শুন লো।

দুজনই একইসঙ্গে মুখ তুলে রজতের দিকে তাকাল। আকাশের অন্ধকার এখন প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে।

সকাল হলেই ভোর ভোর আমি চলে যাব।

কাঁহা বাবুজি? — একইসঙ্গে বলে উঠল দুজনে।

আসানসুল —

ওঃ! বলে যেন অজানা ভয় থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছাড়ল চামেলী।

মোতিয়া জানতে চাইল, লণ্ডটেগা কিতনে বাজে?

আমি আর ফিরে আসব না মোতিয়া।

কিঁউ? — বলে উঠে দাঁড়াল চামেলী।

কেনো বাবুজি? কাঁহা যায়েগা?

জানি না। কলকাতার ট্রেনও ধরতে পারি।

এবার মোতিয়া বা চামেলী কেউই কোনও কথা বলতে পারল না। খনি এলাকার পাখিরা সবে বেরতে শুরু করেছে। তারা শীতের ধারালো বাতাসে ডানা কেটে ট্রায়াল দিয়ে দেখছে — সত্যিই ভোর হয়ে এল কি না।